জৈবসার ও কৃষিবিজ্ঞানে জীবাণুর অবদান

শ্যামল বণিক



পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

বিজ্ঞান পুস্তিকা

জৈবসার ও কৃষিবিজ্ঞানে জীবাণুর অবদান

ডঃ শ্যামল বণিক
এম. এস্‌সি. (এজি) ; পিএইচ. ডি

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

JAIBASAR O KRISHIBIJNANE JIBANUR ABADAN
[Organic Manure and Contribution of Microbiology to Agriculture]

Dr. Shyamal Banik

প্রকাশকাল : ডিসেম্বর, ১৯৮৫

প্রকাশক :
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা)
আর্য ম্যানসন (নবম তল)
৬ এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার
কলিকাতা-৭০০ ০১৩

মুদ্রক :
শ্রীদুর্গাপ্রসাদ মিত্র,
এলম্ প্রেস
৬৩, বিডন স্ট্রীট, কলিকাতা–৭০০ ০০৬

প্রচ্ছদ : বিমল দাস

মূল্য : বারো টাকা

Published by Dr. Ladlimohan Roy Chowdhury Chief Executive Officer, West Bengal State Book Board under the Centrally Sponsored Scheme of production of books and literature in regional languages at the University level by the Government of India in the Ministry of Education and Social Welfare (Department of Culture), New Delhi.

লেখকের নিবেদন

"জৈবসার ও কৃষিবিজ্ঞানে জীবাণুর অবদান" পুস্তিকায় মোট চোদ্দটি অধ্যায়ে বর্তমান পর্য্যায়ে কৃষি গবেষণার জীবাণু বিজ্ঞান বিষয়ক সম্ভাবনার দিকগুলির প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে। জীবাণুসার এখনও জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌছাতে পারে নি, এর কারণ নির্দেশ করা এই পুস্তিকার উদ্দেশ্য নয়। তবে এটা ঠিক যে জীবাণুসার এককভাবে সাফল্য লাভ করতে পারে না। এরজন্য প্রয়োজন জমিতে উপকারী জীবাণু ক্রিয়ার উপযুক্ত পরিবেশ রচনা করা এবং জমিতে জৈবসার প্রয়োগ করা। বলা বাহুল্য, আজকের এই শক্তি সংকটের দিনে জৈবসার সহযোগে জীবাণুসার প্রয়োগের ফলে কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহৃত কৃত্রিম শক্তির চাহিদা অনেকটা মিটবে। জীবাণুর ক্রিয়া ভাল না হলে জমি সবসময়ই অনুর্বর হয়ে থাকেবে, এই পুস্তিকাতে তা বোঝাতে চাওয়া হয়েছে। মাটিতে, জীবাণুঘটিত বিভিন্ন মৌলের যে বিবর্তন চক্র অবিরত চলেছে তাকে গুরুত্ব দিলেও এই পুস্তিকাতে কেবলমাত্র নাইট্রোজেন ও ফসফরাস ভিন্ন অন্য মৌলগুলির আলোচনা সম্ভব হয়নি। পরবর্তী পর্যায়ে এদের সম্বন্ধে আলোচনার ইচ্ছা রইল। সবশেষে দুটি ভিন্নমুখী আলোচনা রাখা হয়েছে, যাদের বহুল প্রচলন এখনও বিশ্বব্যাপী হয়ে উঠে নি। এদের সার্থক রূপায়ণ যেদিন সম্ভব হবে সেদিন কৃষিবিজ্ঞান আরো বেশী করে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে এটা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

পরিশেষে আমি সকলের সহানুভূতি কামনা করে শেষ করছি। এই পুস্তিকাটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নিরীক্ষণ করে কিছু মূল্যবান পরিভাষা সংযোজন এবং প্রয়োজনানুগ আধুনিকীকরণের জন্য উপদেশ দিয়ে বর্তমান বিধানচন্দ্র কৃষি বিদ্যালয়ের জীবাণু বিজ্ঞানের অধ্যাপক ডঃ বিমলকৃষ্ণ দে মহাশয় প্রভূত উপকার করেছেন। আশা করা যায় পুস্তিকাটি স্নাতক স্তর পর্যন্ত কৃষিবিজ্ঞানের ছাত্র এবং সাধারণ কৃষিজীবি মহলে কিছু নূতন তথ্য সংযোজন করতে সমর্থ হবে। পুস্তিকাটি সাধারণ কৃষিজীবি ও ছাত্রমহলে সমাদৃত হলে নিজেকে ধন্য মনে করব।

শুভেচ্ছা সহ—

১৪ই নভেম্বর, ১৯৮৫

শ্যামল বণিক

সূচীপত্র

সূচনা ১

এই পৃথিবীতে **সকল শক্তি উৎস সূর্য**, এটা সুবিদিত হলেও এর কিছুটা বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে। সৃষ্টির পর অনাদিকাল ধরে সূর্য যে আলো এবং তাপ বিকিরণ করে চলেছে তার মাত্র দু'শ কোটি ভাগের একভাগ পৃথিবীর ভাগ্যে জুটছে। আবার তারও এক বড় অংশ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বিকিরিত হয়ে। তবে পৃথিবীতে কিছুটা স্থায়ীভাবে এই শক্তিকে ধরে রাখার ক্ষমতা আছে সবুজ উদ্ভিদের। এবং সেটা প্রধানতঃ গাছের পাতার সবুজ রঞ্জক অংশের, যার নাম হল **ক্লোরোফিল**। বলা বাহুল্য, এই ক্লোরোফিলের দৌলতেই পৃথিবীতে সবুজের সমারোহ, যা প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ ভাবে দেয় খাদ্যের যোগান, আর তার জন্যই সম্ভব প্রাণী এবং মানুষের জীবনধারণ।

ক্লোরোফিলের কাজ কি? অল্প কথায় বলা যায়, এর কাজ হল শুধুমাত্র সৌরশক্তি শোষণ (আলোক পর্যায়ের), এবং যথাস্থানে তার বণ্টন। অর্থাৎ সৌরশক্তিই অনবরতঃ উদ্ভিদ এবং প্রাণী জগতে শক্তির যোগান দিয়ে চলেছে।

বর্তমানে বড় সমস্যা-শক্তি সঙ্কট। আমরা আজ যেভাবে বিদ্যুতের অপ্রাচুর্যে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছি, তাতে ভাবাই যায় না আগামী ৫০ বা ৭৫ বৎসর পরে পৃথিবীতে সঞ্চিত জীবাশ্ম জ্বালানী (fossil fuel) শেষ হয়ে গেলে আমাদের কি অবস্থা হবে। হিসাবে দেখা গেছে, আগামী ৭৫ বৎসরের মধ্যে পৃথিবীতে সঞ্চিত জীবাশ্ম জ্বালানী শক্তির উৎস কয়লা, খনিজ তেল এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের শেষ কণাটুকুও নিঃশেষ হয়ে যাবে। তখন শক্তির ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য থাকবে শেষ সম্বল কিছু তেজঃস্ক্রিয় মৌল। কিন্তু এ-রসদও একশত বৎসর পরে আর অবশিষ্ট থাকবে না। **এরপর কি হবে?** সে চিন্তাটা এখন শুধু পদার্থ বিজ্ঞানীদের কাঁধে ছেড়ে বসে থাকা যাবে না। এজন্য আমাকে আপনাকে সকলকেই ভাবতে হবে। সেদিনের জন্য আমাদের যে পথসংকেত বিজ্ঞানীরা দিচ্ছেন তা হল নিউক্লিয় সংশ্লেষণ চুল্লি থেকে শক্তির যোগান, যার জ্বালানীর অসীম ভাণ্ডার হল

সমুদ্রে সঞ্চিত ভারী জল [$_1H^2{}_2O$] কিন্তু সে রহস্যের চাবিকাঠি এখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি।

তাই সময় থাকতেই আমাদের সবাইকে আরো সচেতন হতে হবে, আমাদেরই উত্তরপুরুষদের কথা ভেবে। সৌর চুল্লির সাহায্যে শক্তি আহরণ সত্যি প্রশংসনীয়, কিন্তু এতেই আত্মতুষ্টির কোন অবকাশ নেই। তাই নূতন নূতন শক্তি সংগ্রহের অভিযানে প্রকৃতি বিজ্ঞানীদের সঙ্গে আমাদেরও সামিল হতে হবে। আমাদের জনসাধারণকে বোঝাতে হবে সঙ্কটটা সমগ্র মানব জাতির। তাই যে পথে শক্তির সাশ্রয় করা যায় সেই পথই আমাদের অবলম্বন করতে হবে। সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শক্তির চাহিদা ক্রমেই বেড়ে চলেছে, কিন্তু বলা বাহুল্য শক্তির যোগান বাড়ার পথ নেই।

প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে কাজের কথায় আসা যাক। **সমস্যার সমাধানের পথ কি?** বেঁচে থাকার জন্য প্রথমেই চিন্তা করতে হয় অন্ন এবং বস্ত্র সংস্থানের কথা। জীব দিয়েছেন যিনি আহার দেবেন তিনি এই ভেবে বসে থাকলে মানবজাতিকে অনাহারে মরতে হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কারণ দিন দিন জনসংখ্যার বাড়তি বোঝা পৃথিবীকে প্রতিনিয়তই যে হুমকি দিচ্ছে, তার মোকাবিলার জন্য আমাদের তৈরি থাকতেই হবে। তাই প্রথমেই গুরুত্ব দিতে হবে কৃষিপদ্ধতি উন্নয়নের উপর। কৃষি উন্নয়নের হার ত্বরান্বিত হলে তবেই আমরা জনসংখ্যার এই ক্রমবর্ধমান হারের সঙ্গে কিছুটা যুঝতে পারব। তার সঙ্গে শক্তি সঙ্কটের কথা চিন্তা করে উন্নত কৃষিপদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় কৃত্রিম শক্তির ব্যবহার কিভাবে কমানো যায় সেদিকে নজর দিতে হবে। উদ্ভিদ হল পার্থিব শক্তি বিবর্তনের প্রধান মাধ্যম। তাই স্পষ্টই বোঝা যায় শক্তি অপচয় রোধের সঙ্গে কৃষি প্রণালীর যোগ কতটুকু। জমি কর্ষণ, জলসেচ, কৃত্রিম রাসায়নিক সার প্রয়োগ, কীটনাশক ঔষধাদি প্রয়োগ পর্যন্ত সবই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃত্রিম শক্তির উপর নির্ভরশীল। জমিতে জল সেচ দেওয়ার ব্যাপারে সৌরশক্তি চালিত পাম্পের ব্যবহার ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। কিন্তু উন্নতমানের উচ্চ ফলনশীল প্রজাতির শস্যের বাড়তি ফলন পাওয়ার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন হয় প্রচুর পরিমাণে সার প্রয়োগের। সবারই জানা আছে যে রাসায়নিক সারের উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন হয় বিপুল পরিমাণ বিদ্যুৎ শক্তির। অপ্রাসঙ্গিক হলেও বিদ্যুৎ কিভাবে প্রয়োজন হয় সে সম্বন্ধে একটা উদাহরণ দেওয়া যাক।

অ্যামোনিয়াম সালফেট [$(NH_4)_2SO_4$] বা ইউরিয়া [$CO(NH_2)_2$] জাতীয় নাইট্রোজেন ঘটিত রাসায়নিক সার উৎপাদনের জন্য প্রথমে তৈরী করতে হয় অ্যামোনিয়া (NH_3), যা অনেক দেশে আজকাল সরাসরি তরল অবস্থায় কৃষি-জমিতে প্রয়োগ করা হচ্ছে। হেবারের নির্দেশিত শিল্প পদ্ধতিতে অ্যামোনিয়া উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন হয় প্রায় ২০০ গুণ বায়ুমণ্ডলীয় চাপ এবং ৫৫০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতা সৃষ্টির। এ ছাড়া জটিল কলাকৌশলের কথা বাদই দিলাম। অর্থাৎ সহজেই অনুমান করা যায় যে এই সার উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় বিপুল পরিমাণ শক্তি সংগ্রহের জন্য আমাদের কয়লা বা খনিজ তেলের উপরই নির্ভর করতে হয়।

আসল প্রশ্নটা হল এই সমস্যার সমাধান হবে কিসে ? আমরা যদি শুধুমাত্র সারের কথাটা চিন্তা করি তবে তার অনেকটা সমাধান হবে নিঃসন্দেহে **জৈবসার**। এ ছাড়া আছে অন্য শক্তিশালী হাতিয়ার **জীবাণুসার**। এখন দেখা যাক **জৈবসার এবং জীবাণুসার বলতে কি বোঝায় ?**

জৈবসারকে আমরা প্রধান দুইভাগে ভাগ করব। প্রথমতঃ **সবুজসার** এবং দ্বিতীয়তঃ **ভালোভাবে পচানো** (well decomposed)। **জৈবসার**। জৈব সারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল-খামারজাত সার (Farm Yard manure)। এবং শহরের বর্জ্যপদার্থজাত সার (Town compost manure)। এছাড়া আছে মানুষের মলের সার (Night soil) বিশেষ শ্রেণীর সবুজ উদ্ভিদকে জমিতে পচিয়ে যে সার উৎপন্ন করা হয় তাকে বলে সবুজসার (Green manure)।

আমাদের প্রতিদিনের অব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি যেখানে সেখানে পড়ে অবাঞ্ছিত পচনের ফলে দুর্গন্ধ উৎপাদন করে এবং রোগ জীবাণুর জন্ম দিয়ে আর এক চূড়ান্ত বিপদ সংকেত বহন করে। কিন্তু এইসব অব্যবহৃত আবর্জনাকেই কল্যাণমূলক কাজে লাগানো যায় উপযুক্ত নির্বাচিত জীবাণু দ্বারা জারণ ঘটিয়ে। এইসব আবর্জনার মধ্যে সঞ্চিত শক্তিই আবর্জনার বিবর্তন ঘটিয়ে তাকে পরিণত করবে জমিতে প্রয়োগের উপযোগী কৃষিসার হিসাবে। যে বিপুল পরিমাণ গোময়াদি পশুবর্জ্য পদার্থ স্থানে অস্থানে পড়ে নষ্ট হয় বা সস্তা জ্বালানী হিসাবে ব্যয় হয় তার অন্ততঃ একাংশও কৃষিসারের অনেকটা চাহিদা মিটাতে সক্ষম। এইসব অপদ্রব্যের মধ্যে কার্বনজাত পদার্থটুকু জীবাণুর দেহগঠন ও শক্তি

উৎপাদনের খাতে ব্যয় হয়, বিনিময়ে মুক্ত হয় অজৈব নাইট্রোজেন জাত দ্রব্যাদি যা রাসায়নিক সারের মতই কৃষিজমির উর্বরতা বৃদ্ধি করে থাকে।

একশ্রেণীর মৃত্তিকা জীবাণুর নাইট্রোজেন বন্ধন ক্ষমতা থাকায় এরা কৃষি-জীবাণুবিদদের মনে এক পরম আশার সঞ্চার করেছে। এই জীবাণুদের ক্রিয়া সাধারণতঃ সীমিত মানের হলেও এ পদ্ধতি প্রাকৃতিক বলে, প্রয়োগ খুব সহজ এবং সর্বোপরি প্রয়োগের খরচও অতি সামান্য। এদের যোগ্যতার মান বৃদ্ধি করা খুব কঠিন নয়। এ নিয়ে সারা বিশ্বে চলেছে প্রচুর গবেষণা। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে কৃষিক্ষেত্রে শক্তি সাশ্রয়ের জন্য নাইট্রোজেন বন্ধনকারী জীবাণুর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এছাড়া দ্বিতীয় মুখ্য ভূমিকা হল ফসফেট জীবাণুর। এই শ্রেণী-ভুক্ত জীবাণু পাথুরে ফসফেটের মত প্রাকৃতিক অদ্রবণীয় ফসফেট ঘটিত লবণ থেকে উদ্ভিদ গ্রহনোপোযোগী দ্রবণীয় ফসফেট মুক্ত করতে পারে। ফসফেট সার হিসাবে যে সুপার ফসফেট উৎপাদন করা হয় তার জন্যও প্রয়োজন হয় বিপুল পরিমাণ বিদ্যুৎ শক্তির। বলা বাহুল্য উৎপাদনের অপ্রতুলতার জন্য আমাদের সুপারফসফেট আমদানী করতে হয় কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে।

কৃষিক্ষেত্রে জীবাণু শুধুমাত্র সারের সাশ্রয়ই করে না, সুষ্ঠু নির্বাচিত জীবাণু অপকারী কীটনাশক হিসাবেও কাজ করতে পারে। এছাড়া কিছু শ্রেণীর জীবাণুর রয়েছে উদ্ভিদবৃদ্ধি উদ্দীপক হর্মোন জাতীয় পদার্থ উৎপাদনের ক্ষমতা। বলা বাহুল্য, সুষ্ঠু এবং নির্বাচিত জীবাণুসার প্রয়োগের ফলে কৃষি জমি হয়ে উঠবে আরো সবুজ আরো শ্রীময়ী। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে আমরা এদের পর্যায়-ক্রমিক আলোচনা করব।

রাসায়নিক সার বনাম জৈবসার ২

সার বলতে কি বোঝায় ? রাসায়নিক সার এবং জৈবসারের মূল পার্থক্যই বা কি ? **রাসায়নিক সারের বিকল্প কি জৈবসার ?** এইসব প্রশ্নের জবাব পেতে হলে প্রথমে আমাদের জানতে হবে সার কি বস্তু ? তার প্রয়োজনই বা হয় কেন ?

সার বলে যেসব রাসায়নিক বস্তুগুলোকে আমরা জমিতে প্রয়োগ করি, সেগুলোর মূল উপাদান হচ্ছে আসলে উদ্ভিদ পোষক (**Plant nutrient**), গাছ সালোকসংশ্লেষের মাধ্যমে তার শক্তি উৎপাদনের রসদ সংগ্রহ করে থাকে একথা সর্বজনবিদিত। এর জন্য প্রয়োজনীয় জল, কার্বনডাইঅক্সাইড এবং আলো সরবরাহের দায়িত্ব প্রকৃতির। এছাড়াও সালোকসংশ্লেষের জন্য প্রয়োজন হয় কিছু অত্যাবশ্যকীয় মৌলের, যার অভাবে গাছের দেহগঠন হতে পারে না। এইসব মৌলের যোগান আসে মাটি থেকে, কোন কারণে ঐসব অত্যাবশ্যকীয় মৌলের অভাব ঘটলেই প্রয়োজন হয় তাদের মাটিতে প্রয়োগ করবার। **এই হল সার।** অর্থাৎ যে সমস্ত পদার্থের প্রয়োগ উদ্ভিদের পুষ্টি, বৃদ্ধি ও ফলনে সহায়তা করে—তাদের বলে সার। তাহলে এখন আমরা বুঝতে পারছি প্রয়োজনে পরিমিত পরিমাণে সারের যোগান দিলে গাছের গঠন ভালো হবে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়বে এবং সর্বোপরি বাড়বে ফলন।

এখন দেখা যাক উদ্ভিদের প্রকৃত প্রয়োজনীয় মৌলগুলো কি কি ?

উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন হয় প্রায় ২০টা বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের। তার মধ্যে প্রধান হল কার্বন, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, লোহা, তামা, দস্তা, বোরন, মলিবডেনাম ইত্যাদি। এদের মধ্যে কার্বন, অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের চাহিদা বেশী হলেও তা জল এবং কার্বনডাইঅক্সাইড থেকে সংগৃহীত হয় বলে এরা সার বলে গণ্য হয়

না। ক্রমিক চাহিদার ভিত্তিতে জমিতে প্রয়োগ করা হয় প্রধানতঃ নাইট্রোজেন, ফসফরাস এবং পটাসিয়ামকে যা কৃষিরসায়নবিদদের কাছে "এন পি কে" (N. P. K.) নামে পরিচিত। এছাড়া সার হিসাবে এদের প্রয়োগই ব্যাপক বলে, এরা মুখ্য পোষক বা **মেজর নিউট্রিয়েণ্ট** (Major nutrient) বা **ম্যাক্রোনিউট্রিয়েণ্ট** (Macronutrient) নামেও পরিচিত।

যখন এই মৌলগুলো সরবরাহের জন্য সরল অজৈব পদার্থ প্রয়োগ করা হয় তখন তাকে আমরা বলি **রাসায়নিক সার**। এদের মধ্যে অন্যতম হল, অ্যামোনিয়াম সালফেট, ক্যালসিয়াম অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট, ইউরিয়া ইত্যাদি (নাইট্রোজেন ঘটিত); সিঙ্গল সুপার ফসফেট, ও ট্রিপল সুপার ফসফেট (ফসফরাস ঘটিত) এবং মিউরেট অব পটাস ও পটাসিয়াম সালফেট (পটাসিয়াম ঘটিত)। কিন্তু এইসব উদ্ভিদ পোষক আহরণের জন্য অপরিহার্য খনিজ লবণ যদি জটিল জৈব পদার্থের থেকে সংগৃহীত হয় তবে তাকে বলে **জৈবসার**। সাধারণতঃ অব্যবহার্য খামারজাত পদার্থ, পশুমলমূত্রাদি, শহর এবং গ্রামের পচানো আবর্জনাদি জমিতে প্রয়োগ করলে, রাসায়নিক সার অপেক্ষা অল্প পুষ্টিমূল্য হলেও তা ভালোভাবে গাছের প্রয়োজন মিটাতে সক্ষম হয়। এই আবর্জনার মধ্যে জৈব পদার্থের প্রাচুর্য থাকায় তা জৈবসার হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে।

এছাড়া পটাসিয়ামের পরবর্তী তালিকাভুক্ত মৌলগুলোর চাহিদা আনুপাতিক হারে কম বলে, এদের **স্বল্পপ্রয়োজনীয় মৌল** বা **মাইক্রোনিউট্রিয়েণ্ট** (Micronutrient) বলা হয়। এই মৌলগুলির চাহিদা গাছের কাছে অতি অল্প পরিমাণে হওয়ার দরুন সাধারণতঃ জমিতে এদের সরাসরি প্রয়োগ করার প্রয়োজন প্রায়ই হয় না। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে গাছ তার চাহিদার স্বল্পপ্রয়োজনীয় মৌলের যোগান মাটি থেকেই পেয়ে যায়। তবে কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে স্বল্পপ্রয়োজনীয় মৌলের চাহিদাও প্রকট হয়ে উঠতে পারে যা গাছের নানাবিধ লক্ষণে (অস্বাভাবিকতায়) স্পষ্ট হয়। সেই পরিস্থিতিতে পরিমিত পরিমাণে ঐ স্বল্প চাহিদার মৌলগুলিকে প্রয়োগ করলে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার হাত থেকে গাছকে রক্ষা করা যায়। কৃষি পণ্যগুলির মধ্যে অধিক ফলনশীল প্রজাতিগুলির কৃত্রিম সারের চাহিদা যথেষ্ট বেশী।

এরপর আসা যাক মাটির অবস্থা সম্পর্কে। মাটিতে সার প্রয়োগ করা হলে

তার কি কি বিবর্তন ঘটতে পারে এবং প্রযুক্ত সারের সবটাই গাছ পায় কি না দেখা যাক। গাছের কোন সমস্যা সমাধানের জন্য কৃষিবিজ্ঞানীকে নজর রাখতে হয় গাছ, মাটি এবং সেই মাটিতে অবস্থানকারী জীবাণুর প্রকৃতির উপর ; এক কথায় উদ্ভিদ, মাটি এবং জীবাণুর গতিশীল সাম্যের উপর। এটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে কোন পুষ্টিকর পদার্থ মাটিতে এলেই প্রথমে তা চলে যায় মাটির জীবাণুর ভোগে এবং কেবলমাত্র তাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত অংশটুকুই উদ্ভিদের প্রয়োজন মিটাতে ব্যবহৃত হয়। তার প্রধান কারণ হল মৃত্তিকা জীবাণুর সংখ্যা বিপুল (প্রতি গ্রাম মাটিতে প্রায় $১০^{৮}$—$১০^{৯}$ সংখ্যক পর্যন্ত) এবং তাদের খাদ্য শোষণের ক্ষমতাও অপরিসীম। গাছ কেবলমাত্র মূলের সাহায্যে জল এবং খনিজ লবণ সংগ্রহ করে থাকে মাটি থেকে, কিন্তু জীবাণু খাদ্য শোষণের জন্য (অভিস্রবণ প্রক্রিয়া দ্বারা) তার দেহের সমস্ত অংশকেই ব্যবহার করে থাকে। অন্য দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলা যায় জীবাণুর বংশবৃদ্ধির হারও অস্বাভাবিক দ্রুত। একটা সাধারণ ব্যাক্টিরিয়া গড়ে প্রায় ২০ মিনিট সময়ের মধ্যেই দ্বিধাবিভক্ত হয়ে বংশ বিস্তার করে, অবশ্য পরিবেশ অনুকূল হলে তবেই। সুতরাং দেখা যাচ্ছে এ দুটি অস্বাভাবিক ক্ষমতার দরুন জীবাণু মাটি থেকে খাদ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে গাছের প্রবল প্রতিযোগী। এত গেল শেষোক্ত প্রশ্নের জবাব। এখন দেখা যাক প্রথম প্রশ্নের সমাধান কি? এ প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাবে জৈবসারের বিবর্তনের ভিত্তিতে। জৈবসারের মূল উপাদান হল **কার্বন**। এই কার্বন কিন্তু গাছের প্রত্যক্ষ কাজে লাগে না। কারণ গাছ কার্বন সংগ্রহ করে বায়ুমণ্ডলীয় কার্বনডাইঅক্সাইড থেকে একথা আগেই বলা হয়েছে। আসলে জৈবসারের কার্বনজাত উপাদানগুলো ব্যবহৃত হয় প্রধানতঃ জীবাণুর শক্তি উৎপাদনে। এর ফলে কার্বনডাইঅক্সাইড মুক্ত হতে থাকে এবং তাতে কার্বনের পরিমাণ কমতে থাকে। জৈবপদার্থে যে নাইট্রোজেন থাকে তার ব্যবহার তুলনায় কম হওয়ায় প্রকৃতপক্ষে এই প্রক্রিয়ায় কার্বন নাইট্রোজেনের অনুপাতও ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হতে থাকে। এই অনুপাত একটা নির্দিষ্টমানে এসে পৌঁছালে কার্বন ও নাইট্রোজেনের অজৈবকরণ সমানতালে হতে থাকে। এই নাইট্রোজেন গ্রহণীয় (available) পর্যায়ে আসতে থাকে যা অজৈব লবণের মত গাছ সহজেই গ্রহণ করতে পারে। জৈবসারের এই বিবর্তনকে বলা হয় অজৈব-

করণ প্রক্রিয়া (Nitrogen mineralisation)। এই প্রক্রিয়ায় নাইট্রোজেন সমৃদ্ধ যৌগের শেষ পর্যায় অ্যামাইনো এসিডে পরিণত হয়। এরপর তা রূপান্তরিত হয় অ্যামোনিয়াম লবণে। এই অ্যামোনিয়াম লবণ পরবর্তী পর্যায়-ক্রমিক জারণের ফলে নাইট্রাইট ও শেষে নাইট্রেট লবণে পরিণত হয়। বলা বাহুল্য মাটিতে এইসব জীবরাসায়নিক বিক্রিয়ার মূল হোতা বিভিন্ন শ্রেণীর মৃত্তিকা জীবাণু। সবুজ সার আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা এই প্রক্রিয়া সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করব। কেবলমাত্র সারের দিক থেকে চিন্তা করলে সাধারণ জৈবপদার্থ থেকে তেমন কিছু উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ফসফরাস বা পটাসিয়াম পাওয়া যায় না, যা গাছের প্রয়োজন মিটাতে পারে। মাটিতে নাইট্রোজেন জাত পদার্থের বিবর্তন প্রসঙ্গে নাইট্রোজেন চক্র নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করব।

মাটিতে জৈবসার প্রয়োগের উপযোগিতা কি? এ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে হলে জানা দরকার মাটির নিজস্ব জৈব পদার্থ বা হিউমাসের (Humus) কথা। হিউমাস হচ্ছে মাটির কৃষ্ণ বা গাঢ় বাদামী বর্ণের বিবর্তিত জৈব পদার্থ যা মাটিতে আগত উদ্ভিদ বা প্রাণীজ দেহাবশেষ থেকে জীবাণুর ক্রিয়া বা অন্য উপায়ে জাত (Humified)। জল কার্বনডাইঅক্সাইড, অ্যামোনিয়া এবং খনিজ লবণ অপসারিত হবার পর যে বিশেষ আকৃতিবিহীন জটিল জৈবপদার্থ মাটিতে পড়ে থাকে তাই হল হিউমাস। এই জৈবপদার্থ উষ্ণ ক্ষারে দ্রবীভূত হয় এবং এতে জীবিত বা মৃত জীবাণুর সন্ধান পাওয়া যায়। এছাড়া সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হল এই ঘন বাদামী বা কৃষ্ণবর্ণের পদার্থের কার্বন নাইট্রোজেনের অনুপাত (প্রায় ১০ : ১) নির্দিষ্ট হয়ে থাকে। জৈবসার প্রয়োগের ফলে জমিতে হিউমাসের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। তার দরুন মাটির সছিদ্রতা, জলধারণ ক্ষমতা এবং আয়ন (ion) বিনিময় ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এছাড়া হিউমাসের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে মাটির উপকারী জীবাণুরা টিকে থাকার কিছুটা রসদ পেয়ে যায়। এটা নিশ্চিত করে বল যায় যে, **যে জমিতে বেশী উপকারী জীবাণু থাকে তার উর্বরতা তত বেশী।**

জৈবসারের গুরুত্ব আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই সার্থক মূল্যায়ন করতে হবে সেইসব জীবাণুর, যারা তাদের ক্রিয়া অব্যাহত রেখেছে অনাদিকাল থেকে। প্রকৃতির এই সীমিত রসদ সম্বল করে আজও যে প্রাণী এবং উদ্ভিদকুল সগৌরবে বেঁচে আছে এবং থাকবেও তার প্রতিশ্রুতি এসেছে জীবাণুর কাছ

থেকে। প্রকৃতিতে প্রতিটি মৌলিক পদার্থই আবর্তনচক্রে কোন না কোন বিশেষ প্রজাতির জীবাণুর সঙ্গে একসূত্রে বাঁধা। জৈবসার বিবর্তিত হয়ে অজৈব সারেই পরিণত হচ্ছে। তাই জৈব সারের সঙ্গে অজৈব সারের দ্বন্দ্বের প্রশ্নই উঠে না। আসলে তফাৎটা হচ্ছে পরিমাণ ও প্রয়োগ কৌশলের। তাই বলা চলে জৈবসার রাসায়নিক সারের পরিপূরক।

উপর্যুপরি জমিতে কয়েক বৎসর জৈবসার ব্যবহার না করে কেবলমাত্র রাসায়নিক সার প্রয়োগ করে গেলে, জমি তার স্বাভাবিক জলধারণ ক্ষমতা এবং আয়ন বিনিময়ের নিয়ন্ত্রণ হারায়। হিউমাসের পরিমাণ ক্রমে কমতে থাকে যার ফলে উপকারী জীবাণুর সংখ্যা দ্রুত নির্মূল হয়ে শেষে জমি অনুর্বর পাথুরে জমিতে পরিণত হয়। তাই এ-সব অবস্থার মোকাবিলার জন্য প্রতি বৎসরই পরিমিত পরিমাণে জৈবসার প্রয়োগ করে গেলে জমির ভৌত অবস্থার অবনতি ঘটে না। যার ফলে জমির ফলন ক্ষমতাও হ্রাস পায় না। পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে আমরা অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর পর্যালোচনা করব।

আবর্জনা ঘটিত সার ৩

রাসায়নিক সার ও জৈবসার আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা জেনেছি জৈব-সার কাকে বলে এবং জৈবসার প্রয়োগের উপযোগিতা কি? পরবর্তী প্রশ্ন হল **জৈবসার তৈরীর উৎস কি এবং তার প্রয়োগ কৌশলই বা কি?** এই দুটি মূল প্রশ্নের জবাব আমরা এক এক করে আলোচনা করব।

সাধারণতঃ খামারজাত আবর্জনা ও অন্য বর্জ্য পদার্থসহ গোবর সার (Farm yard manure), গ্রাম ও শহরের আবর্জনাদি থেকে উৎপন্ন সার (Compost), মানুষের মলজাত সার (Night soil) শহরের পয়ঃপ্রণালীর নোংরা জল (Sewage water) থেকে উৎপন্ন সার এবং সবুজ সারের নামই আমাদের প্রথমে মনে পড়ে। এছাড়া প্রকৃতিজাত কিছু পণ্য বা শিল্পে ব্যবহৃত বর্জ্যপণ্যাদিতেও উদ্ভিদের পোষক (Plant nutrient) অল্প পরিমাণে সঞ্চিত থাকে বলে এদের সরাসরি জমিতে নিম্নমানের সস্তা সার হিসাবে প্রয়োগের রীতি প্রচলিত আছে। এই তালিকায় আছে পাথুরে ফসফেট (Rock phosphate), অস্থিচূর্ণ (Bone meal), লৌহশিল্পজাত বর্জ্যপণ্য (Basic slag), চিনি শিল্পজাত বর্জ্যপণ্য (Press mud) ইত্যাদি। এছাড়াও জমিতে প্রয়োজনে চুন, জিপসাম ($CaSO_4$, $2H_2O$) বা গন্ধক প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। চুন এবং জিপসাম বা গন্ধক অবশ্য জমিতে যথাক্রমে অম্লত্ব এবং ক্ষারত্ব মোচনেই ব্যবহার করা হয়ে থাকে। পূর্ব উল্লেখিত জৈবসারগুলির মধ্যে সবুজসার সম্বন্ধে আমরা পৃথক আলোচনা করব। চিনি শিল্পজাত বর্জ্যপণ্য ছাড়া পরবর্তী পর্য্যায়ে উল্লিখিত সারগুলিকে জৈবসারের পর্যায়ে ফেলা যায় না, কারণ এদের মধ্যে জৈবকার্বন থাকে না বললেই চলে। এরা প্রধানতঃ অদ্রবণীয় ফসফরাসের উৎস এবং এদের উপর জীবাণু ঘটিত ক্রিয়াকে নির্ভর করে এদের সার হিসাবে প্রয়োগ করা হয়। জৈবসারই হোক বা প্রাকৃতিক কিম্বা কৃত্রিম উৎস জাত পরিত্যক্ত দ্রব্যাদিই সার হিসাবে ব্যবহৃত হোক সকলেরই সার হিসাবে সাফল্য মাটিতে জীবাণুর ক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল। তাই এই সারকে সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করতে গেলে যে কলা কৌশল প্রয়োগ করা হয়, তাতে জীবাণু বিজ্ঞান সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞানের প্রয়োজন হয়। অন্যথায় সামান্য

ভুলে জৈবসারই রোগের উৎসে পরিণত হতে পারে। এইসব সার রাসায়নিক সারের তুলনায় তত শক্তিশালী নয় বলে আমরা এদের উপসার (Manure) হিসাবে চিহ্নিত করব। তবে এটা অবশ্যই স্মরণে রাখতে হবে এইসব উপসারের ব্যবহার অপরিহার্য্য। উপর্যুপরি কয়েক বৎসর জমিতে কেবলমাত্র রাসায়নিক সার প্রয়োগের ফলে জমি দীর্ঘকালের জন্য তার উর্বরতা শক্তি হারিয়ে ফেলতে পারে। তাই এইসব উপসার ব্যবহারের উপযোগিতাকে আমরা কোন মতেই ক্ষুণ্ণ করব না।

প্রথমে দেখা যাক জমির কি কি গুণ থাকলে তাকে আমরা উর্বর জমি বলব? দোঁআশ মাটিতে সাধারণ ফসলের ফলন ভাল হয় একথা সবাই জানেন যদিও দোঁআশ মাটি সবরকম চাষের পক্ষে মোটেই উপযোগী নয়। অর্থাৎ ফসল বিশেষে মাটির গঠন (structure) এবং বুননের (texture) তার-তম্যের উপর ফলন নির্ভর করে। ঠাস বুননের মাটি অর্থাৎ কাদামাটির জলধারণ ক্ষমতা খুব বেশী, মাঝারি বুননের মাটি অর্থাৎ দোঁআশ মাটিতে জলধারণ ক্ষমতা হল মাঝামাঝি এবং স্লথ বুননের মাটি অর্থাৎ বেলেমাটির জলধারণ ক্ষমতা ন্যূনতম।

মাটির বুননের উপর কি কি নির্ভর করে? মাটির প্রধান তিনটি অজৈব উপাদান হল কাদা (clay), পলি (silt) এবং বালি (sand)। এছাড়া মাটিতে থাকে জৈব পদার্থ (humus), প্রতিস্থাপনযোগ্য অজৈব লবণ, মাটির জল (soil water), মাটির বাতাস (soil air) এবং জীবাণু। কাদার উপর মাটির দৃঢ়তা (rigidity), আয়ন বিনিময় ক্ষমতা, হিউমাসের স্থিতি এবং জল-ধারণ ক্ষমতা নির্ভর করে। কোন জমিতে তাই বালির ভাগ বেশী থাকলে সে জমিতে জল মাটির স্তর ভেদ করে গাছের শিকড়ের সীমা ছাড়িয়ে চলে যায়। ফলে সেইসব জমিতে সেচ দেওয়া একটা প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। দ্বিতীয় সমস্যা হল, মাটির আয়ন বিনিময় ক্ষমতাও কাদার উপর নির্ভর করে। কাদা অণুর কেলাসের মধ্যে দ্রবণীয় ধাতব আয়নগুলো ঢুকে থাকে এবং তা প্রয়োজনে বেরিয়ে এসে গাছকে পুষ্টি জোগায়। কাদা, মাটির জৈব পদার্থ হিউমাসের সঙ্গে জোড়-বদ্ধ (complex) হয়ে থাকে যার ফলে জমির সচ্ছিদ্রতা বজায় থাকে। মাটিতে ছিদ্র না থাকলে তাতে জল এবং বাতাস আবদ্ধ হয়ে থাকতে পারে না, ফলে গাছের শিকড়কে শ্বসনের জন্য অক্সিজেনের অভাব ভোগ করতে হয়। মাটিতে জৈব পদার্থ কম থাকলে আবার সে জমি অনুর্বর হিসাবে চিহ্নিত হয় কারণ সেখানে মাটির উপকারী জীবাণু এবং কেঁচো ইত্যাদি গাছের বন্ধুরা সংখ্যালঘু

হয়ে পড়ে। তাই জমিতে হিউমাসের মাত্রা বৃদ্ধি করা বা অন্ততঃ একটা নির্দিষ্ট মাত্রা স্থির রাখা অবশ্যই প্রয়োজনীয়। হিউমাসের অভাবে (কেবলমাত্র রাসায়নিক সার প্রয়োগের ফলে) স্বল্পকালের মধ্যেই মাটির আয়ন বিনিময় ক্ষমতা, জলধারণ ক্ষমতা, সচ্ছিদ্রতা ইত্যাদি কমে যাওয়ার দরুন জমি পাথরের মত শক্ত হয়ে পড়তে থাকে এবং তা চাষবাসের অযোগ্য হয়ে পড়তে থাকে। তাই সার্বিক বিশ্লেষণের পর সিদ্ধান্তে আসা যায় যে মাটির উর্বরতা শুধুমাত্র সেই জমিতে তাৎক্ষণিক উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় পোষক মৌলাদির (nutrients) উপর নির্ভর করে না, সেই সঙ্গে জমির সচ্ছিদ্রতা, জলধারণ ক্ষমতা, কাদাপলি এবং বালির একটা সমতা, হিউমাসের পরিমাণ এবং সবশেষে সেই মাটিতে মোট জীবাণুর সংখ্যা এবং উপকারী জীবাণুর প্রচুর সংখ্যায় উপস্থিতির উপর নির্ভর করে। কোন মাটিতে কাদার ভাগ বেশী হলে জল জমে থাকে যা বিশেষ কোন উদ্ভিদের পক্ষে উপযোগী হলেও সাধারণ উদ্ভিদের শিকড় পচিয়ে দেয়। **কোনমাটির জীবাণু বিষয়ক বিশ্লেষণের (microbiological study) সময় সেই জমিতে উপকারী জীবাণুর অবস্থিতি এবং তাদের স্থিতির উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।**

জমিতে জৈবসার প্রয়োগের প্রধান ও মুখ্য উদ্দেশ্য হল জমির হিউমাসের পরিমাণ স্থির রাখা বা বৃদ্ধি করা। জমিতে হিউমাসের মাত্রা স্থির থাকলে জীবাণুর ক্রিয়াও অব্যাহত থাকে। **মাটিতে অবস্থিত মৌলগুলির জীবাণু ঘটিত বিবর্তনের পরিবেশবজায় রাখা সার প্রয়োগের চেয়ে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ।** সৃষ্টির পর অনাদিকাল ধরেই কোন সার প্রয়োগের প্রচলন ছিল না, তবু উদ্ভিদকুল প্রাকৃতিক বিবর্তন চক্রকে সম্বল করে ঠিকই টিকে ছিল। কিন্তু তারপর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে জনসংখ্যার চাপ যখন সমগ্র পৃথিবীর দুশ্চিন্তাতে পরিণত হয়েছে, তখনই প্রয়োজনের তাগিদে এসেছে উন্নত উচ্চ ফলনশীল জাতের চাষ, এবং তাদেরই প্রয়োজনে এসেছে রাসায়নিক সারের ব্যবহার। কিন্তু আজ যখন শক্তি সঙ্কট চরমে উঠেছে, তখনই চিন্তা করতে হচ্ছে বিকল্প পথের। তাই প্রকৃতির উপজাত ও সহজাত পণ্যের মধ্যে চলেছে শক্তির উৎস সন্ধানের গবেষণা। জৈবসার তারই একটা প্রতিশ্রুতি মাত্র।

এককভাবে বিভিন্ন জৈবসার সম্বন্ধে আলোচনার পূর্বে উপসার হিসাবে ব্যবহৃত কতকগুলি পণ্যের মূল্যায়ন করা যাক।

তালিকা—১

উপসার হিসাবে ব্যবহৃত পণ্যের গড়পড়তা পোষক মূল্য (মুখার্জি, দাজি এবং রায়চৌধুরি ১৯৬৯ ; In. Hand book of Agriculture)।

উপসার হিসাবে ব্যবহৃত পণ্যাদি	শতকরা হিসাবে নাইট্রোজেন (N)	ফসফরাস P_2O_5	পটাসিয়াম K_2O
মল			
গরু	০·৩ — ০·৪	০·১ — ০·২	০·১ — ০·৩
ঘোড়া	০·৪ — ০·৫	০·৩ — ০·৪	০·৩ — ০·৪
ভেড়া	০·৫ — ০·৭	০·৪ — ০·৬	০·৩ — ১·০
মানুষ	১০ — ১·৬	০·৮ — ১·২	০.২ — ০.৬
মূত্র			
গরু	০·৯ — ১·২	নগণ্য	০·৫ — ১·০
ঘোড়া	১·২ — ১·৫	নগণ্য	১·৩ — ১·৫
ভেড়া	০·৬ — ১·০	০·১ — ০·২	০·২ — ০·৩
মানুষ	১·৫ — ১·৭	নগণ্য	১·৮ — ২·০
উপসার			
গ্রাম্য বর্জ্যপদার্থ	০·৫ — ১·০	০·৪ — ০·৮	০·৮ — ১·২
শহরের বর্জ্যপদার্থ	০·৭ — ২·০	০·৯ — ৩·০	১·০ — ২·০
খামারজাত	০·৪ — ১·৫	০·৩ — ০·৯	০·৩ — ১·৯
পোলট্রিজাত	১·০ — ১·৮	১·৪ — ১·৮	০·৮ — ০·৯
পয়ঃ প্রণালীজাত	২·০ — ৩·৫	১·০ — ৫·০	০·২ — ০·৫
উদ্ভিদ অবশেষ			
কয়লা ভস্ম	০·৭৩	০·৪৫	০·৫৩
কাঠের ভস্ম	০·৫ — ১·৯	১·৬ — ৪·২	২·৩ — ১২
ধানগাছ	০·৩৬	০·০৮	০·৭১
গম গাছ	০·৫৩	০·১০	১·১০
কলাগাছ	০·৬১	০·১২	১·০০
তামাক গাছ	১·১২	০·৮৪	০·৮০
আখ গাছ	০·৩৫	০·১০	০·৬০

খামরজাত গোবর সার (Farm Yard Manure) : গৃহপালিত পশুর মল মূত্রাদি শুকিয়ে জমিতে প্রয়োগ করার রীতি বহুল পরিচিত। উত্তম শ্রেণীর খামারজাত উপসার কেবলমাত্র জমির হিউমাসই বৃদ্ধি করে না। এতে যে যথেষ্ট পরিমাণে (in significant quantity) নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাসিয়াম থাকে তা আমরা তালিকায় দেখেছি। কিন্তু এটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে এই সার থেকে ভাল ফল পেতে গেলে তা ভালোভাবে মথিত (decomposed) হওয়ার প্রয়োজন। এর উদ্দেশ্য হল এইসব কার্বনজাত পণ্য অর্থাৎ জৈবসার ব্যবহারের পূর্বে তাদের কার্বন নাইট্রোজেনের অনুপাত কমিয়ে আনা হয়। এই প্রক্রিয়াকে মথিতকরণ আখ্যা দেওয়া হয় (decomposition)। শহর বা গ্রাম্য আবর্জনা এবং উদ্ভিদের দেহাবশেষের মধ্যে বিস্তীর্ণ কার্বন নাইট্রোজেন অনুপাত দেখতে পাওয়া যায়। (প্রায় ৭৫—১০০ : ১) সাধারণতঃ মাটির কার্বন নাইট্রোজেন অনুপাত ১০ : ১ ধরা হয় যদিও এর সামান্য তারতম্য দেখা যেতে পারে। প্রকৃতপক্ষে মাটির কার্বন, নাইট্রোজেনের অনুপাত হল মাটিতে অবস্থিত হিউমাসের কার্বন নাইট্রোজেন অনুপাত। মাটির জৈবপদার্থ বা হিউমাসের মূল উপাদান হল জটিল কালো বা বাদামী বর্ণের (কুইনোন জাতীয়) জৈবপদার্থ। এছাড়া হিউমাসকে আশ্রয় করে থাকে ব্যাক্টিরিয়া, ছত্রাক এবং এ্যাক্টিনোমাইসিটিস জাতীয় নানাবিধ জীবাণু। তাই এদের দেহের কার্বন নাইট্রোজেনের অনুপাতের উপর হিউমাসের কার্বন নাইট্রোজেনের অনুপাত নির্ভর করে। সাধারণতঃ ব্যাক্টোরিয়া এবং এ্যাক্টিনোমাইসিটসের কার্বন নাইট্রোজেনের অনুপাত প্রায় ৫—৭ : ১ হয়ে থাকে। কিন্তু ছত্রাকের কার্বন নাইট্রোজেন অনুপাত সাধারণতঃ ১০—১৫ : ১ এর মধ্যে থাকতে দেখা যায়। পরীক্ষায় দেখা গেছে জীবাণুর বৃদ্ধির সময় জৈবপদার্থ থেকে একভাগ কার্বন তাদের দেহের কার্বন সংশ্লেষের জন্য এবং দুইভাগ কার্বন তাদের শক্তি যোগানের জন্য কার্বনডাই-অক্সাইড হিসাবে নির্গত হয়। এর ফলে জৈবপদার্থের বিস্তৃত কার্বন নাইট্রোজেন অনুপাত ক্রমেই সঙ্কীর্ণ হতে থাকে। প্রাথমিক পর্য্যায়ের জীবাণুর মৃত্যু ঘটলে তারাই আবার পরবর্তী পর্য্যায়ের জীবাণুদের খাদ্যে পরিণত হয়। তখন দ্বিতীয় পর্য্যায়ের জীবাণুরা সক্রিয় হয়ে উঠে। তাদের বংশ বিস্তারের ফলে কার্বন নাইট্রোজেন অনুপাত আরও কমে আসতে থাকে। এভাবে কার্বন নাইট্রোজেনের অনুপাত প্রায় ১০ : ১ এর নিকটবর্তী হয়ে পড়লে তখন নির্গত নাইট্রোজেন

জীবাণুর প্রয়োজন মিটিয়ে উদ্বৃত্ত হয়। এই সময় গাছ দ্রবণীয় পর্য্যায়ের অজৈব নাইট্রোজেনের সরবরাহ মাটি থেকে পেতে থাকে। এই পরিস্থিতিকে নাইট্রোজেন অজৈবকরণ (mineralisation) আখ্যা দেওয়া হয়। ২নং তালিকায় কয়েকটি বিভিন্ন জৈবসার এবং মাটির কার্বন নাইট্রোজেন অনুপাত দেখান হল।

তালিকা—২

জৈবপদার্থ সমৃদ্ধ এবং মৃত্তিকার কার্বন নাইট্রোজেন অনুপাত (গোবিন্দরাজন এবং গোপালরাও ১৯৭৮)

জৈবসার হিসাবে ব্যবহৃত পদার্থ	কার্বন নাইট্রোজেন অনুপাত	মাটির উৎস এবং শ্রেণী	কার্বন নাইট্রোজেন অনুপাত
ধানের খড়	১০০ : ১	পলিমাটি	
আখের ছিবড়া	৬০ : ১	কার্ণাল	৭·৬৩ : ১
গমের খড়	৫০ : ১	বারুইপুর	৯·৮৯ : ১
খামারজাত উপসার (FYM)	৪০ : ১	উচ্চক্যালসিয়াম কার্বনেট যুক্ত পলিমাটি	
শহরের আবর্জনা সার (Town compost)	১৫ : ১	পুসা	১১·৮ : ১
		কৃষ্ণমৃত্তিকা	
		প্যাড়েগাঁও	১২·৫ : ১
		হারিজ	৭·৯ : ১
		লালমাটি	
		মহীশূর	৬·৮৬ : ১
		কোয়েম্বাটোর	৭·১ : ১
		পাহাড়ী মাটি	
		মোংপু	৭·৭ : ১
		ল্যাটারাইট	
		কাপগাড়ি	৬·২৮ : ১
		পট্টাম্বি	৯·৭ : ১
		তরাইমাটি	
		রুদ্রপুর	১৬·৯ : ১

সাধারণতঃ যেসব উদ্ভিদের দেহাবশেষের মধ্যে কার্বন নাইট্রোজেন অনুপাত কম তাদের ক্ষেত্রেই অজৈবকরণ দ্রুত ঘটে থাকে। তাই শিম্ব কড়াই বা শুঁটি জাতীয় (leguminous) উদ্ভিদের দেহাবশেষকে অতি উত্তম জৈবসারের কাজ করতে দেখা যায়। বিস্তীর্ণ (wide) কার্বন নাইট্রোজেন অনুপাতযুক্ত উদ্ভিদাবশেষ জমিতে সরাসরি প্রয়োগ করলে, কৃষি জমিতেই তার মথিতকরণ (decomposition) হতে থাকে। এইরূপ জীবাণুর ক্রিয়া কৃষি জমিতে ঘটান বিজ্ঞানসম্মত নয় কারণ, প্রথমতঃ এর ফলে জমির দ্রবণীয় নাইট্রোজেন জীবাণুর ভোগে চলে যায়, কারণ এইসব জৈবপদার্থে নাইট্রোজেনের পরিমাণ কম থাকায় জীবাণুরা তাদের প্রয়োজনীয় নাইট্রোজেন মাটি থেকে গ্রহণ করে, এবং দ্বিতীয়তঃ এই পদ্ধতিতে কৃষিজমিতে রোগজীবাণু প্রবেশের সম্ভাবনা থেকে যায়। তাই জৈব উপসার তৈরীর জন্য পৃথক ব্যবস্থা অবলম্বন করাই বৈজ্ঞানিক বিধিসম্মত। যে কারণেই হোক আমাদের দেশে খামারজাত উপসারের ব্যবহার আজও বৈজ্ঞানিক বিধিসম্মত হয়ে উঠে নি। তার ফলে খামারজাত উপসার থেকে প্রচুর পরিমাণে নাইট্রোজেন অ্যামোনিয়া হিসাবে নষ্ট হয়ে যায়। এই পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য জমিতে জিপসাম প্রয়োগে সুফল পাওয়া যায়। জমিতে আংশিক মথিত (partially decomposed) খামারজাত সার প্রয়োগের ক্ষেত্রে বীজ বপন করার (sowing) তিন থেকে চার সপ্তাহ পূর্বেই তা প্রয়োগ করতে হবে এবং জমিতে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে। তাহলে সময়ে সুফল পাওয়া যাবে। উত্তমরূপে মথিত খামারজাত উপসার যদি বপন করার বহুপূর্বেই জমিতে প্রয়োগ করা হয় তবে তা জমিতে শুকিয়ে যাবে কিম্বা অতিদ্রুত মথিত হয়ে নষ্ট হবে, গাছের উপকারে আসবে না। তাই এই উপসারকে বীজবপন বা রোয়া করার (transplanting) ঠিক পূর্বে প্রয়োগ করাই বিধিসম্মত। খামারজাত উপসার বা গোবরসারকে জমিতে সাধারণতঃ ছোট ছোট স্তূপ করে সাজিয়ে রাখা হয় এবং চাষের পূর্বে মাটিতে মিশিয়ে লাঙল দেওয়া হয়। এই জৈবসার যে কোন ফসলের পক্ষেই উপযোগী। এই সার প্রয়োগের পর জীবাণুর ক্রিয়া অব্যাহত রাখার জন্য জল সরবরাহ রাখতে হয়। বর্ষাকালে এই উপসার বিশেষ উপযোগী হয়ে থাকে। ফসলভেদে এই সার প্রয়োগের মাত্রার তারতম্য হয়। সাধারণতঃ প্রতি হেক্টর শুষ্ক জমিতে ১২ গরুর গাড়ী বোঝাই এবং সেচযুক্ত জমিতে ২৫—৫০ গরুর গাড়ী বোঝাই (প্রতি গাড়ী

উপসার প্রায় ০·৭৫ ঘন মিটার বা প্রায় ৫০০ কিগ্রার সমতুল) উপসার প্রয়োগ করতে হয়। অবশ্য শক্তি বা ফলচাষের ক্ষেত্রে আরো বেশী মাত্রায় জৈবসারের প্রয়োজন হয়। এই সার জমির ভৌত অবস্থার উন্নতি ঘটায় এবং গাছকে নাইট্রোজেন সরবরাহ করে। এই উপসারে নাইট্রোজেনের চাহিদা কিছুটা মিটলেও ফসফরাস ও পটাসের অভাব পূর্ণ হয় না।

কমপোস্ট উপসার (Compost manure) ঃ গ্রাম ও শহরের বর্জ্য পদার্থ, খামারজাত উপাদান, বাড়ীর তরিতরকারির খোসা, কচুরিপানা, লতাপাতা, মাছের আঁশ, হাঁস মুরগীর মলমূত্র, গৃহপালিত গবাদি পশুর মলমূত্রাদি বৈজ্ঞানিক বিধিসম্মত উপায়ে পচন ঘটিয়ে (মথিত করে) এই উপসার তৈরী করা হয়। এইসব আবর্জনাদি পচন না ঘটিয়ে প্রয়োগ করলে কি ক্ষতি হতে পারে তা আমরা পূর্বেই জেনেছি। উত্তমরূপে মথিত করণ বা পচানোর (decomposition) পর ঐসব আবর্জনার কার্বন নাইট্রোজেন অনুপাত ৪০-৫০ : ১ থেকে ১০-১৫ : ১-এ নেমে আসে। তখন ঐ আবর্জনা জৈবসারে পরিণত হয়। এই জৈব উপসারে ০·৮ থেকে ১ শতাংশ নাইট্রোজেন থাকে। এই উপসার অন্যান্য মৌল উপাদানের দিক থেকেও প্রায় খামারজাত গোবর সারের সমতুল। আবর্জনাসার তৈরীর জন্য যে পচনক্রিয়া ঘটানো হয় তাতে দুইপ্রকার পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। (১) সবাত পদ্ধতি (aerobic), (২) অবাত পদ্ধতি (anaerobic)।

সবাত পদ্ধতিতে সুবিধাজনক দৈর্ঘ্য ও প্রস্থবিশিষ্ট ৩০-৫০ সেন্টিমিটার গভীর গর্তে দৈনন্দিন খামারজাত আবর্জনা, গৃহের জঞ্জাল, কিছু গোময়, গৃহপালিত পশুমূত্র ভিজা মাটি এবং কয়েক মুষ্টি কাঠের ছাই নিক্ষেপ করা হয়। এই প্রক্রিয়া বর্ষার ঠিক পূর্বে শুরু করা হয়। বর্ষা শুরু হয়ে গেলে এ আবর্জনাদি ভিজা অবস্থায় থাকে এবং পচনের ক্রিয়া দ্রুত হয়। ঐ স্তুপের উচ্চতা মাটির তল থেকে প্রায় এক মিটার উঁচু হলেও কোন ক্ষতি হয় না। তিন চার সপ্তাহ পর পর ঐ স্তুপের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করা হয় যাতে পচন সার্বিক এবং সমভাবে হতে পারে। ফলে পচনশীল আবর্জনাদি অক্সিজেনের সংস্পর্শে আসতে পারে যার ফলে সবাত শ্বসজীবী জীবাণুদের ক্রিয়া উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। বৃষ্টির উপর নির্ভর করে শেষবার আলোড়ন করার পর (শুরু করার প্রায় তিন থেকে চার মাস পর) কালো বা বাদামী বর্ণের জৈব উপসার ব্যবহার উপযোগী হয়ে উঠে। ওজন

হিসাবে এই উপসার তৈরী করতে গেল নিম্নলিখিত অনুপাতে শেষোক্ত উপাদান-গুলি প্রয়োজন হয়ে থাকে।

খামারজাত ও অন্যান্য আবর্জনাদি	৪০০
পশুমূত্র ভিজা মাটি	৫৬
সদ্য ত্যাগ করা পশুমল (গোময়াদি)	৬০
কাঠের ছাই	৪

পশুমল মূত্রাদি না পাওয়া গেলে গাছের ঝরাপাতা, গৃহের আবর্জনাদি, ধান বা গমের খড়, তুষ ইত্যাদি ব্যবহার করা যেতে পারে।

অবাত পদ্ধতিতে অপেক্ষাকৃত ছোট কিন্তু গভীর প্রকোষ্ঠে দৈনন্দিন সংগৃহীত আবর্জনাদির সঙ্গে বেশ কিছুটা গোবর এবং কাঠের ছাই যোগ করা হয়। এক মিটার গভীর গর্ত হলে প্রায় ৫০ সে.মি. পরিমাণ ভর্তি হবার পর ঐ আবর্জনাদির উপর গোময় এবং মাটির প্রলেপ দেওয়া হয়। তারপর বেশ কিছুটা মাটি দিয়ে ঐ গর্ত বোজানো হয়। মাটির নীচে ঐ আবর্জনার কার্বনজাত অংশের উপর জীবাণুর অবাত ক্রিয়া চলতে থাকে। ঐ আবর্জনার ভিতে জল সরবরাহ করে জীবাণুর ক্রিয়াপোযোগী করে রাখতে হয়। উপরে মাটি চাপা থাকার দরুন দুর্গন্ধ বা মাছির উপদ্রব হয় না। এই অবস্থায় প্রচুর পরিমাণে কার্বন-ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হবার দরুন নাইট্রোজেন অ্যামোনিয়া হয়ে নষ্ট হতে পারে না। নিজের বাগানে জৈবসার প্রয়োগের উপযোগী সার প্রস্তুতির জন্য শহরাঞ্চলে এই পদ্ধতি বিশেষ সুবিধাজনক। সাধারণতঃ চার থেকে পাঁচ মাসের মধ্যেই এই উপসার ব্যবহারোপোযোগী হয়ে উঠে।

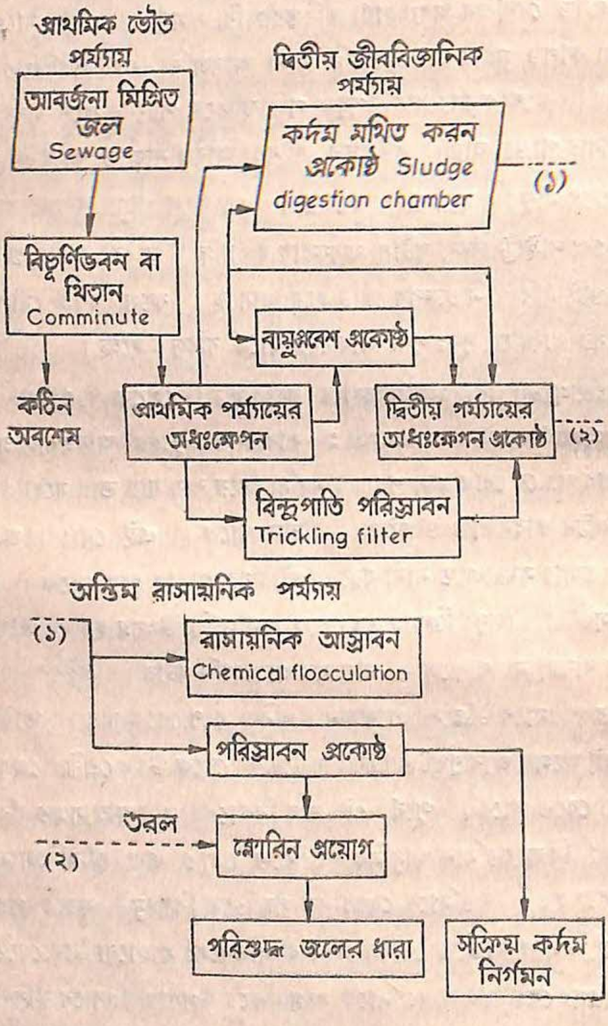
শহরের আবর্জনাদি থেকে উৎপন্ন জৈব উপসার (Town Compost) : শহরের আবর্জনাদি নিয়মিত পরিষ্কার করে ফেলার পর তা সঞ্চয় করার জায়গা পাওয়া মিউনিসিপ্যালিটি কর্তৃপক্ষের কাছে একটা মস্ত বড় সমস্যা। আমাদের দেশে জনবহুল শহরের সব জায়গায় আজও আধুনিকীকরণ হয় নি। পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা অনেক স্থানেই মান্ধাতা আমলের রীতি অনুযায়ী চলে আসছে। এরই মধ্যে একটা কার্যকর নিদর্শন হিসাবে মানুষের মল নিক্ষেপের (Night soil) জন্য মিউনিসিপ্যালিটি শহরের উপকণ্ঠে নির্জন একটা স্থানকে বেছে নেন এবং সেখানে গভীর প্রকোষ্ঠের সৃষ্টি করে দৈনন্দিনের সঞ্চিত মল জমা করেন। ক্রমে ক্রমে ঐ প্রকোষ্ঠগুলি ভরাট হয়ে এলে তা মাটি চাপা দিয়ে দেওয়া হয়। তখন

অবাত পদ্ধতিতে ঐ জৈব পদার্থের উপর জীবাণুর ক্রিয়া করে ক্রমে তাকে এক বিশেষ উপকারী জৈব উপসারে পরিণত করে। এই বিশেষ স্থানটিকে অনেকে ভাগাড় বলে অভিহিত করেন। মল ছাড়া মৃত জীবজন্তুর দেহাবশেষও এইখানে নিক্ষেপ করা হয়। উদ্ভিদ পুষ্টির সব উপাদানগুলিই এই উপসারে যথেষ্ট পরিমাণে থাকে। এছাড়া দৈনন্দিন অব্যবহার্য্য তরিতরকারি, ফলমূলের খোসা, মাছের আঁশ, ছেঁড়া জামা কাপড়, চুল্লীর ছাই ইত্যাদি নানা আবর্জনা একই পদ্ধতিতে পচানো হয়। প্রায় তিন থেকে চার মাস উপযুক্ত পরিস্থিতিতে পচনের ফলে ব্যবহারোপযোগী উপসার পাওয়া যায়। বর্তমানে এইসব আবর্জনাজাত সারকে কৃষিজীবী এবং সাধারণ মানুষ সাদরে গ্রহণ করেছে। এর ফলে প্রচুর শক্তির অপচয় বন্ধ হয়েছে এবং নাইট্রোজেন, পটাস, ফসফরাস ইত্যাদি উদ্ভিদের অত্যাবশ্যকীয় মৌল উপাদানগুলির বিবর্তন চক্রপথ ছোট হয়ে আসছে। ফলে একই মৌল উপাদান অল্প সময়ের ব্যবধানে পুনঃ পুনঃ আমাদের স্বার্থে ব্যবহৃত হচ্ছে।

পয়ঃপ্রণালী বা নর্দমাজাত আবর্জনা থেকে উৎপন্ন উপসার (Sewage and sludge manure) : সাধারণতঃ গৃহের আবর্জনা, স্নানাদি ও শৌচ করার পর যে ধৌত জল শহরের নর্দমা দিয়ে বয়ে যায় তার মধ্যে প্রায় ০·০১ শতাংশ কঠিন কার্বনজাত ও অজৈব উপাদান থাকে। এই নোংরা জল নর্দমা দিয়ে বয়ে চলার সময় এতে নানা ধরনের জীবাণুর আবাস হয়ে থাকে। প্রধানতঃ অবাত শ্বসজীবী জীবাণুর ক্রিয়ায় এর থেকে পচা দুর্গন্ধ উৎপন্ন হয়। তাই উপযুক্ত নিষেকের ব্যবস্থা না থাকলে তা মানুষের স্বাস্থ্যহানি ঘটায়। এইসব আবর্জনার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় খনিজ লবণ থেকে যায়। তাই উপযুক্ত উপায়ে এই জলের জীবাণুঘটিত ক্রিয়া ঘটিয়ে তা থেকে উত্তম শ্রেণীর জৈব উপসার তৈরী করা যেতে পারে। পূর্বে এই জল নিকাশের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত বিধি মেনে চলা হত না, কিন্তু বর্তমান আধুনিক পদ্ধতিতে ভৌত এবং জীববিজ্ঞানের প্রথা অবলম্বন করা হয়। বর্তমানে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিপদমুক্ত করার পর উন্মুক্ত প্রান্তরে এই জলকে মাটিতে শোষণ এবং বাষ্পীভবনের সাহায্যে উবে যেতে দেওয়া হয়। তারপর সেই শুষ্ক আবর্জনাকে সংগ্রহ করে উপসার হিসাবে কৃষি জমিতে প্রয়োগ করা হয়। অবাত শ্বসজীবী জীবাণুর ক্রিয়ায় দুর্গন্ধজাত গ্যাস উৎপন্ন হয় বলে বর্তমানে নর্দমার জল যেখানে সঞ্চয় করা হয়, তাতে সবুজ বা নীলসবুজ শেওলা জন্মাতে দেওয়া হয়। নীলসবুজ শেওলা নাইট্রোজেন বন্ধন করে ঐ জলে

নাইট্রোজেনের পরিমাণ বাড়ায় এবং উভয় শেওলাই অক্সিজেন উৎপন্ন করে পরিবেশকে সবাত শ্বসজীবী জীবাণু বৃদ্ধির উপযোগী করে তোলে। এই উপসারে প্রায় শতকরা ৩-৬ ভাগ নাইট্রোজেন, ২ ভাগ ফসফরাস ও একভাগ পটাস থাকে।

নীচে একটা বিজ্ঞানসম্মত আধুনিক পদ্ধতি দেখানো হল (চিত্র-১) :



চিত্র ১
নর্দমাজাত আবর্জনা থেকে উপসার উৎপাদন পদ্ধতি
(পেলকৎসার ও রীড্, ১৯৭৪)

এই পদ্ধতিতে উৎপন্ন সক্রিয় কর্দম (Activated sludge) উত্তমমানের জৈব উপসার হিসাবে ক্রিয়া করে থাকে।

এইসব জৈবসার ছাড়াও কিছু প্রাকৃতিক সম্পদকে সরাসরি জমিতে প্রয়োগ করে সুফল পাওয়া যায় তা আগেই বলা হয়েছে। এর মধ্যে পাথুরে ফসফেটকে জমিতে ফসফেট সারের বিকল্প হিসাবে ব্যবহারের প্রয়াস চালানো হচ্ছে। ফসফেট জীবাণু আলোচনা প্রসঙ্গে তা উল্লেখ করা হবে। এছাড়া বিশেষ করে লৌহ ধাতু শিল্পের ক্ষারধর্মী ধাতুমল অম্লধর্মী মাটিতে ফসফরাস সরবরাহের ক্ষেত্রে বিশেষ কার্য-কর প্রমাণিত হচ্ছে। সুপার ফসফেটের বিকল্প হিসাবে পাথুরে ফসফেট ও লৌহ ধাতুমল ছাড়াও অস্থিচূর্ণকে সরাসরি জমিতে প্রয়োগ করা হচ্ছে। এছাড়া বিভিন্ন শিল্পে উৎপন্ন বর্জ্য পদার্থের মধ্যে চিনি শিল্পের অবশেষ (Press mud) বিশেষ-ভাবে ফসফরাস ও নাইট্রোজেন সমৃদ্ধ। কারণ আখের রস থেকে চিনি তৈরীর সময় আখের রস থেকে প্রোটিন জাতীয় উপাদান পৃথক করা হয়, সেজন্য কিছু চুণও যোগ করতে হয়। তাই আখের রসের গাদে নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও চুণ যথেষ্ট পরিমাণে থেকে যায়। এই বর্জ্য পদার্থের প্রয়োগ অম্লজমিতে বিশেষ উপযোগী হয়ে থাকে। বর্তমানে মৃত জীবজন্তুর হাড়, শিং এবং পরিত্যক্ত চামড়ার গুঁড়ো থেকেও উত্তমমানের উপসার তৈরীর চেষ্টা চলেছে।

জমিতে রাসায়নিক বা জৈবসার প্রয়োগের পদ্ধতি ও সময় নিরূপণ ঃ উত্তমরূপে মথিত না হয়ে থাকলে জমিতে জৈবসার বীজরোয়ার যথেষ্ট পূর্বেই প্রয়োগ করতে হবে। যদি তা কোন কারণে না সম্ভব হয়, তবে তা বীজ থেকে গাছ বেরিয়ে চারা খানিকটা বড় হওয়ার পর প্রয়োগ করতে হবে। অন্যথায় শিশু চারাগাছের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম হওয়ার জন্য চারাগাছের রোগাক্রান্ত হবার সম্ভাবনা থেকে যাবে। ভালো ফল পাবার জন্য সার যত চূর্ণীকৃত হবে ততই ভালো। মাটিতে জৈবসার ভালোভাবে কাজ করার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে জল সরবরাহের প্রয়োজন হয় তাই বর্ষাকালেই জৈবসার প্রয়োগ করা ভাল। রাসায়নিক সারপ্রয়োগের ক্ষেত্রে (বিশেষ করে নাইট্রেট জাতীয় লবণ) লবণগুলির জলে অত্যন্ত দ্রবণীয়তার জন্য ক্ষেতে দাঁড়ানো ফসলের উপর তা বিশেষ বিশেষ পর্বে ছড়িয়ে প্রয়োগ করা হয়। অ্যামোনিয়া ঘটিত লবণ কাদার সঙ্গে যুক্ত হয়ে অপরিবর্তনীয় জোড় গঠন করে এবং প্রায়ই জমিতে অম্লত্বের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। অপচয় রোধের জন্য ইউরিয়া সার ছোট ছোট পলিথিনের

প্যাকেটে করে গাছের গোড়ার কাছে প্রয়োগ করা হয়। এই পদ্ধতিতে সার প্রয়োগ জলমগ্ন ধান জমির পক্ষে বিশেষ উপযোগী। সুপার ফসফেট মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তা অতি দ্রুত আবদ্ধ হয়ে পড়ে যার ফলে প্রায় অর্দ্ধেক সারই গাছের কোন কাজে লাগে না। তাই ফসফেট জাতীয় সার ফসল হিসাবে বিশেষ বিশেষ সময়ে প্রয়োজনমত অল্প অল্প করে প্রয়োগ করাই বিধিসম্মত। সাধারণতঃ যে সব ফসলে সেচ প্রয়োজন হয় সেইসব ফসলের জমিতে সার প্রয়োগের পর জল দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হয়। ফলের গাছে সার প্রয়োগ করতে হলে তা মাটির নীচে গর্ত করে পুঁতে দিতে হবে। গাছের শিকড় বিস্তারের সঙ্গে সার প্রয়োগের সীমানাও বৃদ্ধি করতে হয়। উন্নত দেশগুলিতে যেখানে অবিচ্ছিন্ন বিশাল এলাকা জুড়ে চাষ হয় সেখানে লাঙল দেওয়ার জন্য ট্রাক্টার এবং সার প্রয়োগের জন্য হেলিকপ্টারের সাহায্য নেওয়া হয়ে থাকে।

জমিতে সার প্রয়োগের আগে মাটি পরীক্ষা করা একান্ত প্রয়োজনীয়। অন্যথায় সারের অপচয় হয় অথবা গাছের প্রয়োজন মেটানো সম্ভব হয় না। জমিতে সারের প্রয়োজনীয়তা নির্ণয়ের জন্য মাটির রাসায়নিক বিশ্লেষণ, জীবাণু ঘটিত পরীক্ষা, টবে বা সরাসরি জমিতে ফলন সম্পর্কিত পরীক্ষা করা যেতে পারে। সরাসরি জমিতে পরীক্ষা চালানো সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি কিন্তু তা খরচ এবং সময়-সাপেক্ষ। জীবাণুঘটিত পরীক্ষাদি খুবই সূক্ষ্ম ফল দেয় বটে, কিন্তু এই পরীক্ষাগুলি মোটামুটি জটিল এবং রাসায়নিক পরীক্ষার মত দ্রুত সম্পন্ন করা যায় না। তাই সাধারণতঃ. তাৎক্ষণিক বিচারের প্রয়োজনে রাসায়নিক পদ্ধতির সাহায্যই নেওয়া হয়ে থাকে। হিউমাসের পরিমাণ কম থাকলে সেইসব জমিতে জৈবসার ব্যবহারের জন্য অবশ্য পরীক্ষার প্রয়োজন হয় না। আমাদের দেশে উচ্চ তাপমাত্রা এবং জীবাণুর উচ্চ শ্বসনহারের জন্য বেশীর ভাগ মাটিতেই হিউমাসের পরিমাণ শতকরা ১ ভাগের নীচে থাকতে দেখা যায়। **দীর্ঘকাল জৈবসার ব্যবহারের ফলে জমির হিউমাসের পরিমাণ বাড়তে পারে। পক্ষান্তরে দীর্ঘকাল শুধুমাত্র রাসায়নিক সার ব্যবহারের ফলে হিউমাসের পরিমাণ কমে গিয়ে জমি দীর্ঘকালের জন্য চাষের অযোগ্য হয়ে পড়তে পারে।**

সবুজ সার 8

সবুজ সারের অর্থ কি? নাম থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায় এই সারের সঙ্গে তাজা বা সবুজ উদ্ভিদ জড়িত। জমিতে জৈবসার প্রয়োগের এক বিশেষ পন্থা হল সবুজসার প্রয়োগ। সাধারণতঃ কয়েকটি বিশেষ কড়াই জাতীয় (leguminous plant) গাছকে সবুজ সার উৎপাদনে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। প্রথমেই প্রশ্ন আসবে **সবুজ সার প্রয়োগের উপযোগিতা কি?** উত্তর, অন্যান্য জৈব উপসারের মতই সবুজ সার প্রয়োগের উদ্দেশ্য ও জমিতে হিউমাসের পরিমাণ বৃদ্ধি করা। শুধু তাই নয়, সবুজ সার প্রয়োগের ফলে অন্য বড় সম্ভাবনাময় প্রতিশ্রুতি, জমিতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া। এছাড়াও সবুজ সার প্রয়োগের ফলে মাটিতে নাইট্রোজেন অজৈবকরণ প্রক্রিয়া (Nitrogen mineralisation) ত্বরান্বিত হয়। নাইট্রোজেন অজৈবকরণ প্রক্রিয়ার ফলে নাইট্রোজেন সমৃদ্ধ জৈব পদার্থ থেকে জৈব নাইট্রোজেন জীবাণুর ক্রিয়ায় দ্রবণীয় অজৈব পর্যায়ে "অ্যামোনিয়াম" ও "নাইট্রেট" নাইট্রোজেনে রূপান্তরিত হয়। দ্রবণীয় অজৈব পর্যায়ের নাইট্রোজেনই কেবলমাত্র উদ্ভিদ পোষক (Plant nutrient) হিসাবে বিবেচিত হয়।

এখন কথা হল, সবুজ সার হিসাবে কড়াই জাতীয় গাছ ব্যবহার করার কি বিশেষ কোন সুবিধা পাওয়া যায়? যায় বৈ কি, কড়াই জাতীয় গাছ জীবাণুর সহযোগীতায় বায়ুমণ্ডলীয় নাইট্রোজেন বন্ধন করতে পারে বলে সাধারণতঃ প্রোটিন সমৃদ্ধ হয়ে থাকে। এই নাইট্রোজেন গাছ সঞ্চয় করে থাকে জীবাণুর সহযোগীতায় বায়ুমণ্ডলীয় নাইট্রোজেন বন্ধন করে। তাই কড়াই জাতীয় গাছের অবশেষ মাটিতে জীবাণুর ক্রিয়ায় প্রচুর পরিমাণে নাইট্রোজেন মুক্ত করবে। এর ফলে জমিতে অজৈব নাইট্রোজেন ঘটিত সার প্রয়োগের প্রয়োজন হবে না বা কম হবে।

এরপর মনে প্রশ্ন জাগবে **সবুজ সার কিভাবে উৎপাদন করা হয়ে থাকে?**

অবশ্যই ভালোভাবে পচানো খামারজাত সার বা আবর্জনাদি থেকে উৎপন্ন সার জমিতে প্রয়োগের আগেই তৈরী অবস্থায় থাকে কিন্তু সবুজ সার উৎপাদনের জন্য কাঁচা বা সবুজ রসালো গাছের পাতা, ডাঁটা শিকড় সবটাই সরাসরি জমিতে মিশিয়ে দেওয়া হয়। লাঙল দিয়ে ভালোভাবে মিশানোর পর মাটিকে সেচ দিয়ে

মাটির জটিল নাইট্রোজেনজাত পদার্থ থেকে উদ্ভিদের গ্রহণোপযোগী নাইট্রোজেন পাওয়া সম্পূর্ণভাবে জীবাণু ঘটিত প্রক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল। তাই সবুজ সারের সাফল্য সম্বন্ধে আলোচনা করার আগে জীবাণু ঘটিত নাইট্রোজেন অজৈবকরণ প্রক্রিয়া সম্বন্ধে জানতে হবে।

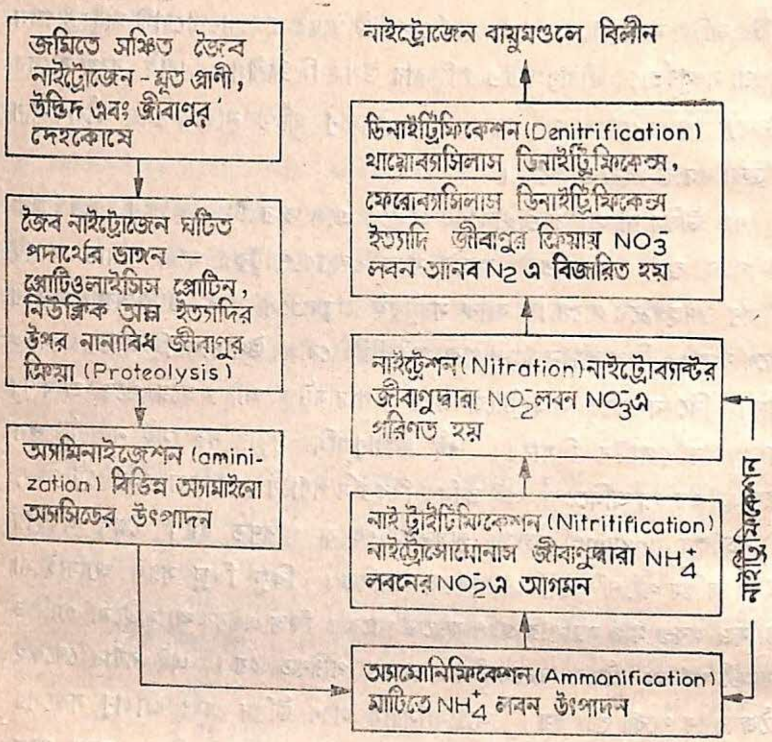
মৃত উদ্ভিদ বা প্রাণীর দেহাবশেষ জমিতে এলে তার উপর জীবাণু ঘটিত ক্রিয়া বা পচন শুরু হয়ে যায়। কার্বন সমৃদ্ধ দেহাবশেষটুকুর মধ্যে সামান্য অংশই জীবাণুর দেহগঠনে লাগে। বাকি সবটুকুই বায়ুমণ্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইড হয়ে মিশে যায়। কিন্তু কার্বন ছাড়া অন্য অনুদ্বায়ী মৌল উপাদানগুলি মাটিতে থেকে যায়। বিশেষ করে নাইট্রোজেনজাত উপাদানটুকু আবদ্ধ হয়ে পড়ে জীবাণুর দেহকোষে প্রোটিন হিসাবে। এই জীবাণুগুলির মৃত্যুর পর সেই নাইট্রোজেন এসে হাজির হয় জমিতে। এই ক্রমিক বিবর্তন পর্যায়ে প্রোটিনজাত নাইট্রোজেন, উৎসেচকের (enzyme) ক্রিয়ায় ক্ষুদ্রতর এককে পরিণত হয়। জৈব অবস্থার এদের অন্তিম পরিণতি হল অ্যামাইনো অ্যাসিড। কিছু কিছু সরল অ্যামাইনো এ্যাসিড অবশ্য গাছ সরাসরি গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু এইসব অ্যামাইনো এ্যাসিড পরবর্তী পর্যায়ে অজৈব অ্যামোনিয়াম লবণে পরিণত হয়। এই পর্যায় থেকেই অজৈবকরণ পর্বের শুরু হয়। অ্যামোনিয়াম লবণ উদ্ভিদ এবং জীবাণু সকলের কাছেই সমানভাবে গ্রহণযোগ্য। কিন্তু মাটিতে উৎপন্ন অ্যামোনিয়াম লবণ দ্রুত কর্দম (clay) দ্বারা আবদ্ধ (fixed) হয়ে পড়ে। উদ্ভিদ অবশ্য অ্যামোনিয়াম লবণের চেয়ে নাইট্রেট লবণকেই বেশী পছন্দ করে। অ্যামোনিয়াম লবণের যেটুকু উদ্ভিদ বা সাধারণ জীবাণু গ্রহণ করার পর উদ্বৃত্ত থাকে তা নাইট্রোসো-ফাইয়িং (Nitrosofying) জীবাণু **নাইট্রোসোমোনাসের** ক্রিয়ায় নাইট্রাইট (NO_2^-) লবণে পরিণত হয়। নাইট্রাইট লবণ পরবর্তী পর্যায়ে নাইট্রিফাইয়িং (Nitrifying) জীবাণু **নাইট্রোব্যাক্টার** এর ক্রিয়ায় নাইট্রেট লবণে পরিণত হয়। সাধারণতঃ অ্যামোনিয়াম থেকে নাইট্রেট লবণে পরিণত হওয়ার পুরো জীবাণু ঘটিত প্রক্রিয়াকে নাইট্রিফিকেশন (Nitrification) বলে। নাইট্রেট লবণ আবার ডিনাইট্রিফাইয়িং জীবাণুর (Denitrifying) ক্রিয়ায় আনব (molecular) নাইট্রোজেনে পরিণত হয়। শেষোক্ত প্রক্রিয়া কৃষি জমিতে সঞ্চিত নাইট্রোজেনের পরিমাণ হ্রাস করে। এই প্রাকৃতিক উপায়ে নাইট্রোজেন অজৈবকরণ চক্রে সক্রিয় জীবাণুর ভূমিকা এবং পথচক্রটি পরপৃষ্ঠায় চিত্রে দেখানো হল (চিত্র ১)।

ভিজিয়ে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। জমিতে দ্রুত পচনের ফলে প্রায় মাসখানেক পরে এর সুফল পাওয়া যেতে থাকবে। সবুজ সার, খামারজাত সারের চেয়ে তুলনামূলক বিচারে কিছুটা নিচুমানের হলেও এর যথেষ্ট সুবিধার দিকও আছে। সবুজ সার উৎপাদনের জন্য আলাদা জমির প্রয়োজন হয় না বা এদের পচনের জন্য দীর্ঘকাল অপেক্ষাও করতে হয় না। জমিতে হিউমাস বৃদ্ধির ক্ষমতা সবুজ সারে খামারজাত সার অপেক্ষা কম হলেও, এই সার অধিক নাইট্রোজেন সমৃদ্ধ। সবুজ সার ফসফরাস ও পটাসের পরিমাণের দিক থেকে মধ্যম মানের। এবার কয়েকটি বিশেষ বিশেষ সবুজ সার হিসাবে ব্যবহৃত উদ্ভিদের মূল্যায়ন তালিকার পর্যালোচনা করা যাক (তালিকা ১)।

তালিকা—১

কতিপয় শস্যের গড়পরতা পোষকমূল্য [মুখার্জী, দাজি এবং রায়চৌধুরী (১৯৬৯) In. Handbook of Agriculture]

সবুজ সার হিসাবে ব্যবহৃত উদ্ভিদের প্রচলিত এক বৈজ্ঞানিক নাম	শতকরা মাত্রা নাইট্রোজেন	ফসফরাস	পটাশ
বরবটি (*Vigna Catjang*)	০·৭১	০·১৫	০·৫৮
ধইঞ্চা (*Sesbania aculeata*)	০·৬২	—	—
ক্লস্টার বীন (*Cyamopsis tetragonoloba*)	০ ৩৪	—	—
অশ্বখাদ্য ছোলা (*Dolichos biflorus*)	০·৩৩	—	—
মথ বীন (*Phaseolus aconitifolicus*)	০·৮০	—	—
সবুজ ছোলা (*Phaseolus aureus*)	০·৭২	০·১৮	০·৫৩
শন (*Crotolaria juncea*)	০ ৭৫	০·১২	০·৫১
কালমুগ (*Phaseolus mungo*)	০ ৮৫	০·১৮	০·৫৩



চিত্র ঃ ১ মাটিতে নাইট্রোজেন অজৈবকরণ চক্র (আলেকজান্ডার, ১৯৬১)

পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে, বিস্তীর্ণ কার্বন নাইট্রোজেন অনুপাত সম্পন্ন জৈব পদার্থ জমিতে প্রয়োগ করলে প্রাথমিক পর্যায়ে, গাছ নাইট্রোজেনের অভাবে ভোগে। এর প্রধান কারণ হল ঐ জৈব পদার্থে নাইট্রোজেনের পরিমাণ কম থাকায় জীবাণুরা, ঐ জৈব পদার্থ পচন ক্রিয়ার জন্য অজৈব দ্রবণীয় নাইট্রোজেন মাটি থেকে আহরণ করে। এই প্রক্রিয়াকে বলে নাইট্রোজেন ঘটিত পদার্থের স্থিতিকরণ (microbial nitrogen immobilisation)। জীবাণুরা মাটি থেকে খাদ্য শোষণের ক্ষেত্রে উদ্ভিদের চেয়ে অনেক বেশী বলশালী। তার কারণ হল অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় (osmosis) খাদ্য শোষণের জন্য জীবাণু তার দেহের সমগ্র অংশকে ব্যবহার করতে পারে। তাই জমিতে না পচানো খড় ইত্যাদি প্রয়োগ করা উচিত নয়। কিন্তু সবুজ সারের প্রয়োগ রীতি হল ঠিক এর বিপরীত। কারণ সবুজ সারে কার্বন নাইট্রোজেন অনুপাত বিস্তীর্ণ নয় বলে এর পচন কৃষি জমিতেই

ঘটানো হয়ে থাকে। তাই ফসল রোয়া করার কিছু আগেই সবুজ সার প্রয়োগ করার রীতি প্রচলিত। সাধারণতঃ কড়াই জাতীয় উদ্ভিদ প্রতি একর জমিতে তিন থেকে দশ টন সবুজ সার উৎপন্ন করে যা হেক্টর প্রতি ২৪-৬০ কিলোগ্রাম নাইট্রোজেনের সমতুল্য। সবুজ সারের আর এক মুখ্য ভূমিকা হল ভূমিক্ষয় এবং দ্রবণীয় লবণের অবচয়রোধ। সবুজ উদ্ভিদ হিসাবে নীলসবুজ শৈবাল এবং এজোলাকে (*Azolla*) বর্তমানে ধান জমিতে ব্যবহার করে প্রভূত উপকার পাওয়া যাচ্ছে। সবুজ সার হিসাবে যে সকল গাছগুলি প্রধানতঃ ব্যবহার করা হয় তা হল; শন (**Sunnhemp**), ধইঞ্চা (**Dhaincha**), ক্লাস্টার বীন (**Cluster bean**), সেনজি (**Senji**) বরবটি (**Cowpea**), কুলতি কলাই (Horse bean), বারসীম (Berseem) ইত্যাদি। এদের মধ্যে এক-একটি গাছের কার্যকারিতা এক একটা ফসলের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য হয়ে থাকে। দেশভেদেও এইসব সবুজ সার ব্যবহারের রীতি ভিন্ন। যেমন কাশ্মীরে ধান জমিতে সবুজ সার হিসাবে মসুরকে (**lentil**) ব্যবহার করা হয়। শন, অতি উত্তম সবুজ সার হিসাবে প্রায় সর্বত্রই ব্যবহার করা হয়। শন, সাধারণতঃ আম, আলু, সবরকম শব্জিতে এবং দক্ষিণ ভারতে ধান এবং সেচযুক্ত গমের জমিতে বিশেষ কার্যকর হয়ে থাকে। ধইঞ্চা সাধারণতঃ বাংলা, বিহার, আসাম এবং মাদ্রাজে বেশী ব্যবহৃত হয়। এই সবুজ সারটি বিশেষতঃ ক্ষার মৃত্তিকা ও জলাজমিতে ভালো ফল দেয়। ক্লাস্টার বীন, বারসীম এবং সেনজির ব্যবহার পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, দিল্লী ও মধ্য-প্রদেশেই বেশী প্রচলিত। ফল চাষের জমিতে এবং সেচযুক্ত আখ বা তূলার জমিতে বারসীমের প্রয়োগ বেশী প্রচলিত। এই সবুজসারের ব্যবহার উত্তরপ্রদেশ ও পাঞ্জাবে বেশী দেখা যায়। বরবটি এবং অশ্বখাদ্য ছোলাকে সবুজ সার হিসাবে মহীশুরে ব্যবহারের প্রচলন বেশী।

প্রায়ই দেখা যায় বারসীম, সেনজি, লুসার্ন ও শনকে আংশিক পশুখাদ্য এবং আংশিক সবুজ সার হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়া প্রায়শঃই এদের সবুজ পাতা দু'তিন দফায় কেটে নিয়ে পশু খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয় এবং বছরের শেষে মূলসহ সমগ্র গাছকে জমিতে মিশিয়ে লাঙল দেওয়া হয়। তখন তা সবুজ সারের প্রয়োজন মেটায়। প্রয়োগ পদ্ধতি যাই হোক না কেন, সব শ্রেণীর জমির ভৌত অবস্থার উন্নতি হয় সবুজ সারের প্রয়োগে।

সবুজ সারকে ভালোভাবে পচানোর জন্য ব্যবহৃত গাছকে অবশ্যই রসালো

(succulent) হতে হবে এবং এছাড়াও জমিতে যথেষ্ট জলের সরবরাহ রাখতে হবে। ধরা যাক, গাছের ফুলফোটার পর্যায়—এই সময় গাছের কার্বনজাত অংশ অধিক সরস থাকে কিন্তু সেইসময় গাছে কার্বন নাইট্রোজেনের অনুপাত কম হয়ে থাকে। মাটিতে প্রয়োগের ফলে এই পর্যায়ের গাছের পচনের কাজ দ্রুত হবে এবং তা থেকে দ্রুত উদ্ভিদ গ্রহণযোগ্য নাইট্রোজেন মুক্ত হবে। অনেক ক্ষেত্রে কচুরি পানা (Water hyacinth) সরাসরি জমিতে সবুজ সার হিসাবে প্রয়োগ করা হয়। সাধারণ রীতি অনুযায়ী গাছের বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কার্বনজাত পদার্থের পরিমাণও বাড়তে থাকে এবং তার সঙ্গে কমতে থাকে নাইট্রোজেনজাত পদার্থের পরিমাণ। আমরা আগেই জেনেছি কার্বন নাইট্রোজেন অনুপাত বিস্তীর্ণ হলে তা থেকে উদ্ভিদগ্রহণযোগ্য নাইট্রোজেন মুক্ত হবার জন্য সময় লাগে অনেক বেশী এবং প্রাথমিক পর্যায়ে অজৈব নাইট্রোজেন রুদ্ধ (immobilisation) করে জীবাণুরা উদ্ভিদের বৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে।

সবুজ সার প্রয়োগের বিভিন্ন রীতির মধ্যে প্রধান হল, ধইঞ্চাকে আখ বা তুলার সঙ্গে একই জমিতে আলাদা সারিতে চাষ করা। পাঁচ থেকে ছয় সপ্তাহ পরে ধইঞ্চা গাছকে জমিতে মিশিয়ে দিলে ভালো ফল পাওয়া যেতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে কেবলমাত্র সবুজ সার প্রয়োগ করে ৩০ থেকে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত ফলন-বৃদ্ধির নজির রয়েছে।

সবুজসারের সঙ্গে সুপার ফসফেট প্রয়োগের ফলে আরো ভালো ফল পাওয়া যায়। সুপার ফসফেটের অভাবে পাথুরে ফসফেটকে বিকল্প হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। উর্বর জমিতে উপকারী জীবাণুর ক্রিয়া সন্তোষজনক হয়ে থাকে। তাই উর্ব্বর জমিতে উচ্চমানের পাথুরে ফসফেট প্রয়োগের ফলও (P_2O_5-এর পরিমাণ ২০—২৫ শতাংশ) সুদূর প্রসারী হতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে সবুজ সার প্রয়োগের পর অল্পমাত্রায় খামারজাত বা আবর্জনা উপসার প্রয়োগেরও রীতি প্রচলিত আছে। সবুজ সারের উপযোগিতা প্রসঙ্গে বলতে গেলে জীবাণু সার প্রয়োগের কথা ভাবতে হবে। আজকাল কৃষি বিজ্ঞানীরা জীবাণুসার সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন হয়েছেন। জীবাণু সারের সার্থকতা কার্বনজাত উপসার প্রয়োগের উপর নির্ভরশীল। আমাদের দেশে অপেক্ষাকৃত দরিদ্র শ্রেণীর মানুষ বনের শুকনো পাতা, আগাছার ডালপালা এবং প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ গোময়কেই জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করেন। তাই এইসব আবর্জনাকে সার

হিসাবে সুষ্ঠ প্রয়োগের প্রকল্প আমাদের দেশে আজও গড়ে উঠে নি। এই অবস্থায় সবুজ সারকে খুবই ফলপ্রসূ বলেই মনে হয়। বিশেষ করে জীবাণু সার প্রয়োগের ক্ষেত্রে জীবাণুর জীবনধারণ ও বংশবৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহের ক্ষেত্রে সবুজ সার এক অনন্য ভূমিকা পালন করবে।

দেবনাথ ও হাজরার ১৯৭২ সালের একটা পরীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ধইঞ্চার নাইট্রোজেন সরবরাহের ক্ষমতা খামারজাত উপসার ও ধানের খড় পচানো সার থেকে বেশী, ফসফরাস সরবরাহের ক্ষমতা খামারজাত উপসার ও খড় পচানো সারের মাঝামাঝি এবং পটাস সরবরাহের ক্ষমতা খামারজাত উপসার অপেক্ষা বেশী কিন্তু খড় পচানো সার অপেক্ষা কম। সবচেয়ে বড় লক্ষণীয় ব্যাপার হল খামারজাত ও খড় পচানো সার প্রয়োগের ফলে জমির ক্ষারত্ব বেড়েছে কিন্তু ধইঞ্চা ব্যবহারে জমির অম্লত্ব বা ক্ষারত্বের কোন পরিবর্তন হয়নি।

সবুজ সার চাষ করা হয় প্রধানতঃ দুটি কারণে ; প্রথমতঃ পশুখাদ্য হিসাবে ব্যবহারের জন্য, দ্বিতীয়তঃ জমির হিউমাস বৃদ্ধি এবং জমির ভৌত অবস্থা উন্নয়নের জন্য। সবুজ সারের ফলন বাড়ানোর জন্য কিছুটা ফসফেট জাতীয় সার প্রয়োগের ফলে সুফল দেখা যায় তা আগেই আলোচিত হয়েছে। একটা অম্ল মৃত্তিকায় চূণ এবং ফসফেট সার প্রয়োগের ফলে "শনের" ফলনের প্রতিক্রিয়া কি হয়েছে তা নিরীক্ষা করা যাক। (তালিকা-২)

তালিকা ২ : খরিপ মরশুমে শনের সবুজ অংশের ফলন প্রতিক্রিয়া (সরকার, ১৯৭৩)

	নাইট্রোজেনের মাত্রা ০, ক্যালসিয়ামের মাত্রা ০	নাইট্রোজেনের মাত্রা ০, ক্যালসিয়ামের মাত্রা ২.৫ টন প্রতি হেক্টরে	নাইট্রোজেনের মাত্রা ২২.৫ কেজি প্রতি হেক্টরে, ক্যালসিয়ামের মাত্রা ০	নাইট্রোজেনের মাত্রা ২২.৫ কেজি প্রতি হেক্টরে, ক্যালসিয়ামের মাত্রা ২.৫ টন প্রতি হেক্টরে
প্রথম বৎসর				
নিয়ন্ত্রিত	৬৬০	৫৮২	২১০	৫০২
সুপার ফসফেট	১৮২২	২৬৬৭	২৯৩২	৩৯১৭
অস্থিচূর্ণ	২৫৩৭	২০৬০	২২৯৭	২১৯২
ক্ষারীয় ধাতুমল	১৪২৩	১০৩০	১০৩৫	১৪২৭

	*তৃতীয় বৎসর			
নিয়ন্ত্রিত	৪৬৩৫	৫০২৫	২৬৩৫	৫১৫৭
সুপার ফসফেট	৪১২৭	৮৩০৭	৩৫৮৪	৬৪৭২
অস্থিচূর্ণ	৫০৩০	৬২৪৫	২৯২০	৭৫৩৫
ক্ষারীয় ধাতুমল	৫৮২০	৬২০২	৪১১০	৬৯৯৫

এই পরীক্ষায়, প্রতিটি ফসফরাস ঘটিত সারের মাধ্যমে ফসফরাস সরবরাহের পরিমাণ ছিল হেক্টর প্রতি ৪৫ কেজি। এই পরীক্ষার ফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এক্ষেত্রে নাইট্রোজেন এবং চুন প্রয়োগ খুব ফলপ্রসূ হয় নি, কিন্তু ফসফেট প্রয়োগ খুবই ফলপ্রসূ হয়েছে। সুপার ফসফেট সর্বাপেক্ষা ভাল ফল দিয়েছে, তুলনামূলকভাবে অস্থিচূর্ণ তদপেক্ষা নিষ্প্রভ এবং ক্ষারীয় ধাতুমল সর্বাপেক্ষা কম কার্যকর হয়েছে। অন্য একটা পরীক্ষায় দেখা গেছে চুন এবং নাইট্রোজেন সহযোগে সুপার ফসফেট সর্বাধিক ফলপ্রসূ হয়েছে। এই ধারা জমির পরিবেশ এবং জলবায়ুর প্রভাব নিরপেক্ষ। নীচে পরীক্ষালব্ধ ফল তালিকাভুক্ত করা হল। (তালিকা ৩) এই পরীক্ষায় সার প্রয়োগের মাত্রা পূর্ববর্তী পরীক্ষার অনুরূপ ছিল।

তালিকা ৩ঃ শনের সবুজ অংশের ফলনমাত্রা (সরকার, ১৯৭৬)

সবুজ অংশের ফলন (কেজি প্রতি হেক্টরে)

	বৎসর			
	প্রথম	দ্বিতীয়	তৃতীয়	
নিয়ন্ত্রিত	৬৬০	২১৭৭	৯৭৩	১২৭০
চুন	৫৮২	৩৮৯২	১৪৫২	১৯৭৫
নাইট্রোজেন	২১০	২৪৪৩	১৬৪৫	১৪৩৩
নাইট্রোজেন + চুন	৫০২	৩৫৬২	২০৮৭	২০৫০
ফসফরাস	১৮২২	৭২৬৫	৫১৭২	৪৭৫৩
ফসফরাস + চুন	২৬৬৭	৮৮৫২	৬৯৮৫	৬১৬৮
নাইট্রোজেন + ফসফরাস	২৯৩২	৮১৯২	৫৮৬৮	৫৬৬৪
নাইট্রোজেন + ফসফরাস + চুন	৩৯১৭	৮৭২৭	৭৪৮৮	৬৭১১

* দ্বিতীয় বৎসর শনের উপর এই পরীক্ষা চালানো হয়নি।

আমাদের এক পরীক্ষায়, ধইঞ্চা সবুজ সার হিসাবে প্রয়োগ করে তদোপরি খামারজাত উপসার, শহরের আবর্জনাজাত উপসার, ধানের খড় পচানো সার, এবং অ্যামোনিয়াম সালফেট সহযোগে পাথুরে ফসফেট, এদের পৃথক পৃথক ভাবে প্রয়োগ করে নাইট্রোজেন বন্ধনকারী জীবাণু, ফসফেট দ্রবণকারী জীবাণু, সেলুলোজ খনিজিকরণ জীবাণু, নীলসবুজ শেওলা, মাটির জীবাণুর নাইট্রোজেন বন্ধন ক্ষমতা এবং ফসফরাস দ্রবণে আনয়নকারী জীবাণুর ক্ষমতা মূল্যায়ন করা হয়। এই পরীক্ষায় প্রাথমিক পর্যায়ে ধান ও পরবর্তী পর্যায়ে উপসারগুলির অবশিষ্ট শক্তি গমের উপর কেমন প্রভাব বিস্তার করেছে তা পর্যবেক্ষণ করা হয়। এই পরীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণে জানা যায় মাটির নাইট্রোজেন বন্ধনকারী জীবাণু, নীলসবুজ শেওলা, ফসফেট জীবাণু, সেলুলোজ জীর্ণকারী জীবাণু এবং মাটির নাইট্রোজেন বন্ধন ক্ষমতা ও ফসফেট দ্রবণায়ন ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

অম্ল মাটিতে চুন প্রয়োগের উপযোগীতা ৫

সাধারণতঃ মাটির pH ৬·৬ এর নীচে থাকলে সেই মাটিকে বলে অম্ল মাটি বা বাংলার চাষীদের ভাষায় টকোমাটি। মাটিতে অম্লত্বের চরম মান pH ৪·৫ পর্যন্ত হতে দেখা যায়। অতিরিক্ত অম্লত্ব মাটির উর্বরা শক্তি যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস করে। এইসব মাটিতে সর্বাপেক্ষা অভাব দেখা যায় ফসফরাসের। তাই অম্ল মাটিতে ফসফরাস যোগ করলে যথেষ্ট ভালো ফসল পাওয়া যায়। কিন্তু এই সকল জমিতে প্রযুক্ত দ্রবণীয় ফসফরাসের স্থায়িত্ব খুবই অল্প সময়ের। এছাড়া অম্ল মৃত্তিকায় প্রায়শই গাছ নানাবিধ পোষক মৌলের সংকটে ভোগে। এই অভাবের কারণ সবসময় জমিতে উদ্ভিদ খাদ্যের ঘাটতি থেকে উৎপত্তি হয়, তা নয়। বরং প্রায়ই দেখা যায় এইসব মাটিতে বিভিন্ন মৌল দ্রবণীয় পর্যায়ে আসা মাত্র তা অতিরিক্ত মুক্ত এলুমিনিয়ম লোহা ইত্যাদি মৌলের ক্রিয়ায় তা অদ্রবণীয় অবস্থায় পরিণত হয়।

মাটিতে অম্লত্বের প্রধান কারণ হল লোহা, এলুমিনিয়ম, ম্যাঙ্গানীজ ইত্যাদি আয়নের আধিক্য। এদের অধিকমাত্রায় উপস্থিতির দরুনই জমিতে হাইড্রোজেন আয়নের পরিমাণ (অম্লত্ব) বৃদ্ধি পায়। এইসব জমিতে জৈব কার্বন বা হিউমাসের পরিমাণ যথেষ্ট কম থাকে এবং মুক্ত অবস্থায় ক্যালসিয়াম কার্বনেট থাকে না। তাই এইসব জমির অম্লত্ব-ক্ষারত্ব প্রতিরোধক (Buffer) ক্ষমতা খুবই নিম্নমানের হয়ে থাকে। জৈব পদার্থ এবং প্রয়োজনীয় ধাতব লবণাদির অপর্যাপ্ত হওয়ার দরুন এইসব মাটিতে জীবাণুর সংখ্যা এবং উপকারী জীবাণুর সক্রিয়তাও যথেষ্ট কম হতে দেখা যায়। তাই এইসব জমিতে সাফল্যের সঙ্গে চাষ করতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন হয় অম্লত্ব মোচনের। অম্লত্ব মোচনের প্রচলিত রীতি হল জমিতে চুন প্রয়োগ। চুনের ক্ষারধর্ম মাটিকে আংশিক প্রশমিত করে রাখে। স্পষ্টতই এই প্রক্রিয়াতে চিরস্থায়ী সমাধান হয় না। মাটিতে সব সময় একটা গতিশীল সাম্য বিরাজ করে, তাই তাৎক্ষণিক সুফল পাওয়া যায় এমন পদ্ধতিকেই সন্তোষজনক মনে করা হয়।

জমিতে কতটা চুন প্রয়োগ করলে তা পর্যাপ্ত হবে তা নির্ণয়ের জন্য রাসায়নিক পরীক্ষার প্রয়োজন হয়। সাধারণতঃ মাটির অম্লত্বকে pH ৬·৫-এ তুলতে পারলেই চুনপ্রয়োগে সন্তোষজনক ফল বৃদ্ধি হয়। প্রশম বা প্রায় প্রশম অবস্থায় মাটির আবদ্ধ বা রুদ্ধ মৌলগুলি ক্রমে ক্রমে মুক্ত হতে থাকে। অম্ল মাটিতে সাধারণতঃ গ্রহণযোগ্য (available) নাইট্রোজেন, পটাসিয়াম, গন্ধক, ফসফরাস, ম্যাঙ্গানীজ, বোরন, মলিবডেনাম ইত্যাদি মৌলের অভাব লক্ষিত হয়। মাটিতে চুনপ্রযুক্ত হলে এইসব মৌলগুলি মুক্ত হয়ে দ্রবণীয় পর্যায়ে আসতে থাকে। তাই ইংরাজীতে একটা প্রবাদ বাক্য প্রচলিত আছে, Liming makes father rich but son poor. কথাটার তাৎপর্য হল, জমিতে বছরের পর বছর চুন প্রয়োগের ফলে মাটিতে সঞ্চিত মৌলগুলি ক্রমাগত বেরিয়ে আসতে থাকে, ফলে কলন বৃদ্ধি হয় বটে, কিন্তু এইসব মৌলের সঞ্চয় শেষ হয়ে গেলে জমি অনুর্বর হয়ে পড়ে।

অম্ল মাটি সৃষ্টি হবার জন্য দায়ী আম্লিক শিলা। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের জন্য মাটি থেকে ক্রমাগত সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামের মত অধিক দ্রবণীয় লবণগুলি ধুয়ে যেতে থাকলে মাটিতে অপেক্ষাকৃত অদ্রবণীয় লোহা, এ্যালুমিনিয়ম ইত্যাদি মৌলের আধিক্যের জন্য অম্লত্ব সৃষ্টি হতে পারে। সাধারণতঃ ১৫ সেমি. পুরু জমিই সাধারণ চাষের জন্য প্রয়োজন হয়। ১৫ সেমি. গভীর এক হেক্টর জমির ওজন দাঁড়ায় প্রায় ২২·৫ লক্ষ কিলোগ্রাম। হেক্টর প্রতি ২২·৫ লক্ষ কিগ্রা. মাটির ভিত্তিতেই কৃষি জমিতে সার প্রয়োগ করা হয় এবং চুনের পরিমাণ নির্ণয় করা হয়। কারণ সাধারণ ফসলের শিকড় ১৫ সেমি.-র নীচে পৌছায় না। এখানে কৃষিজীবিদের সতর্ক করার প্রয়োজন যে তাঁরা যেন একটু গভীরভাবে জমিতে লাঙল দেন। কারণ, দীর্ঘকাল আবাদের ফলে মাটির উপরের স্তরের উর্বরতা কমে গেলেও নীচের স্তরে তখনও যথেষ্ট উর্বরাশক্তি বজায় থাকতে পারে। এটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে প্রাকৃতিক বিবর্তনের ফলে ক্রমে ক্রমে শিলাক্ষয় হয়ে নূতন মাটি সৃষ্টি হচ্ছে। আর গাছের পুষ্টি উপাদানগুলি সঞ্চিত থাকে ঐ সকল শিলার মধ্যেই। নীচের স্তরের মাটিতে হিউমাস এবং খনিজ দ্রবণীয় পর্যায়ের লবণ কম থাকার কারণ হল সেখানে জীবাণুর অপর্যাপ্ত ক্রিয়া। তাই মাঝে মাঝে মাটিকে আলোড়িত করে দিলে সুফল মিলতে পারে।

সাধারণতঃ ৬·৫ থেকে ৬·০ pH সম্পন্ন মাটিকে স্বল্প আম্লিক, ৬·০ থেকে

৫·৫ pH সম্পন্ন মাটিকে মাঝারি আম্লিক এবং ৫·৫ থেকে ৫·০ pH সম্পন্ন মাটিকে বেশী আম্লিক এবং ৫·০ থেকে ৪·৫ pH সম্পন্ন মাটিকে অত্যধিক আম্লিক বলা হয়। অবশ্য এর চেয়ে বেশী আম্লিক মাটির সন্ধান আমাদের দেশে ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলে এবং সাঁওতাল পরগণায় দেখা যায়। অম্লত্বের মাত্রা বেশী হলে সে জমি চাষের পক্ষে অনুপযুক্ত হয়ে থাকে। কিন্তু আম্লিক মাটি জলমগ্ন থাকাকালীন তা প্রায় প্রশম অবস্থায় পৌছায় এবং এই অবস্থায় বিভিন্ন উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় মৌলাদি নির্গত হয়। তাই জলে ডোবা জমিতে ধানচাষের সময় এসব অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় না। এই কারণেই জলে ডোবা অম্ল জমিতে চুন প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু এই জমি শুকিয়ে গেলে অম্লত্ব ততোধিক বৃদ্ধি পায়। সাধারণতঃ অম্ল জমিকে চাষোপোযোগী করার জন্য চুন প্রয়োগের রীতি প্রচলিত। কিন্তু চুনের বিকল্প হিসাবে চুনাপাথর (lime stone), ডলোমাইট ($CaCO_3$+$MgCO_3$), ক্যালসিয়াম সায়নামাইড, ক্যালসিয়াম নাইট্রেট বা ক্ষারীয় ধাতুমল (basic slag) প্রয়োগে সুফল পাওয়া যায়। বিশেষ করে কড়াই জাতীয় উদ্ভিদের চাষ অম্ল জমিতে মোটেই হয় না। তাই চুন প্রয়োগে এইসব চাষে বেশী সুফল পাওয়া যায়। যেসব গাছ যত অম্লত্ব সহ্য করতে পারে সেইসব গাছের ক্ষেত্রে চুন প্রয়োগ করলে লাভের পরিমাণও তত কম হয়। জমিতে চুন প্রয়োগ করতে হলে তাকে অবশ্যই উত্তমরূপে চূর্ণ করে প্রয়োগ করতে হবে অন্যথায় ভালো কাজ হবে না। বিভিন্ন পরীক্ষায় দেখা গেছে অম্ল মাটিতে চুন প্রয়োগে **এজোটোব্যাক্টার** বা **রাইজোবিয়াম** জাতীয় নাইট্রোজেন বন্ধনকারী জীবাণুর কার্যকারিতা বৃদ্ধি পেয়েছে। **নাইট্রোব্যাক্টার** জীবাণু মাটিতে ক্যালসিয়াম কার্বনেট দানার চারপাশে একত্রিভূত হয়েই জন্মায়। ফসলভেদে চুন প্রয়োগের ফলে উদ্ভিদের ফলনের উপর যে প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গেছে তার একটা তালিকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখান হয়েছে (তালিকা ১)।

জমিতে কতটা চুন দিতে হবে ঃ জমিতে কতটা চুন দিলে তা এ্যাসিড মুক্ত হবে তা নির্ণয় করার জন্য ১০ গ্রাম পরিমাণ মাটিকে একটা ১০০ মিলি লিটার শঙ্কু আকৃতির ফ্লাস্কে নিয়ে তাতে ২০ মিলি লিটার বাফার দ্রবণ যোগ করে ১০ মিনিট ভালোভাবে আলোড়ন করতে হবে। তারপর দ্রবণকে pH মাপক যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করে তালিকা অনুযায়ী চুন যোগ করতে হবে। উক্ত বাফার দ্রবণ তৈরি করতে হলে ১·৮ গ্রাম নাইট্রোফেনল,

তালিকা ১ : চূন প্রয়োগে বিভিন্ন উদ্ভিদের উৎপাদনে তুলনামূলক সাড়া
(গোবিন্দ রাজন ও গোপালা রাও ১৯৭৮)

	উত্তম সাড়া			মধ্যম সাড়া					নিম্নমানে সাড়া			
	অড়হর	সয়াবীন	তূলা	ছোলা	মসুর	মটর	চিনা-বাদাম	গম	যব	বোরোধান	আউস ধান	তিল
নিয়ন্ত্রিত	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০
চুন	১১৩৩	৫০৩	১০৮৩	২৩৩	২৬৬	২৯৫	৩০৪	১০৯	১০২	১৭৩	১২২	১২৬
এন পি কে (NPK)	৩৯৪	২০৭	২২৭০	২৫৬	৩০১	৩১৩	১৯৭	২১৫	২৫৬	২৮০	১২৪	১০৭
চুন + এন পি কে	১৯২৭	৭৮৮	৩৮৮৭	৬০৬	৬২৭	৫৯৬	৩৩৩	২৬৭	৩২৭	২৬৬	—	১৪৩

২·৫ মিলি লিটার থায়োইথানল অ্যামিন, ৩·০ গ্রাম পটাসিয়াম ক্রোমেট, ২·০ গ্রাম ক্যালসিয়াম অ্যাসিটেট এবং ৩·১ গ্রাম ক্যালসিয়াম ক্লোরাইডকে প্রায় ৮০০ মি.লি. জলে দ্রবীভূত করে লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড বা সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড দ্রবণের সাহায্যে pH ৭·৫ এ স্থির রেখে একলিটার পূর্ণ করতে হবে, জল ঢেলে। নীচে pH ভেদে অম্লত্ব মোচনের জন্য প্রয়োজনীয় চুনের পরিমাণ তালিকাভুক্ত করা হল (তালিকা ২)।

তালিকা ২ : অম্লমাটির pH-এর সঙ্গে প্রয়োজনীয় চুনের পরিমাণের সম্পর্ক (সংগৃহীত)

বাফার দ্রবণে মাটির pH	প্রয়োজনীয় চুনের পরিমাণ $CaCO_3$ টন প্রতি একরে	বাফার দ্রবণে মাটির pH	প্রয়োজনীয় চুনের পরিমাণ $CaCO_3$ টন প্রতি একরে
৬·৭	১·৬	৫·৭	৭·৬
৬·৬	২·২	৫·৬	৮·২
৬·৫	২·৮	৫·৫	৮·৯
৬·৪	৩·৪	৫·৪	৯·৫
৬·৩	৪·০	৫·৩	১০·১
৬·২	৪·৫	৫·২	১১·০
৬·১	৫·২	৫·১	১১·৭
৬·০	৫·৮	৫·০	১২·৪
৫·৯	৬·৪	৪·৯	১৩·২
৫·৮	৭·০	৪·৮	১৪·০

১ টন প্রতি একরে = ২·৫১ মেট্রিক টন প্রতি হেক্টরে

জমিতে চুন প্রয়োগের মাত্রা মাটির বুননের উপর (texture) যথেষ্টভাবে নির্ভর করে। বিভিন্ন অম্লমাত্রা এবং বিভিন্ন প্রকার বুননের মাটির উপর তা কিভাবে নির্ভর করে তার একটা তালিকা এবার আমরা দেখব পরবর্তী পৃষ্ঠায় (তালিকা ৩)।

০-৭ ইঞ্চি কৃষি জমির ক্ষেত্রে pH ৬·৫ পর্যন্ত উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় উত্তম

তালিকা ৩ : অম্লমাটির বুননের সঙ্গে অম্লত্ব মোচনের জন্য প্রয়োজনীয় চুনের পরিমাণের সম্পর্ক (রায়চৌধুরী, দেশাই এবং আগরওয়াল ১৯৬৯ ; In. Hand book of Agriculture).

মাটির বুনন এবং অবস্থান	প্রয়োজনীয় চুনাপাথরের পরিমাণ টন প্রতি একরে		
	pH ৪·০	pH ৪·৫	pH ৫·৫
উষ্ণ আর্দ্র সমভূমি			
দোআঁশ বেলেমাটি (Loamy sand)	১·৫	১	০·৫
বেলে দোআঁশ মাটি (Sandy loam)	—	২	১
দোআঁশ মাটি (Loam)	—	৩·৫	২
দোআঁশ কাদামাটি (Clay loam)	—	৫	৩
নাতিশীতোষ্ণ বা শীতল অঞ্চলের পাহাড়ী মাটি			
দোআঁশ বেলেমাটি	৩	২	১
বেলে দোআঁশ মাটি	—	৩	২
দোআঁশ মাটি	—	৪.৫	৩
দোআঁশ কাদামাটি	—	৬	৩·৫
উপত্যকা অঞ্চল			
জলমগ্ন বোঁদমাটি	৯	৭	৪·৫

১ ইঞ্চি = ২·৫৪ সেমি. ; ১ টন প্রতি একরে = ২·৫১ মে. টন প্রতি হেক্টরে

তালিকা ১ : ক্ষার মৃত্তিকায় জিপসাম প্রয়োগের প্রতিক্রিয়া
(গোবিন্দ রাজন এবং গোপালা রাও ১৯৭৮)

মাটির ধর্ম	প্রতিকারের পূর্বে	প্রতিকারের পর (জিপসাম প্রয়োগে) ধইঞ্চা ব্যতীত	প্রতিকারের পর (জিপসাম প্রয়োগে) ধইঞ্চা প্রযুক্ত
pH	১০·২	৮·৬	৮·৫
	সম্পৃক্ত দ্রবণের বিশ্লেষণ ফলাফল		
বিনিময় ক্ষমতা × ১০³	১৮·৯৯	১·৬৫	১·৪২
কার্বনেট	০·৬০ মিলিতুল্যাঙ্ক শতাংশ হিসাবে	নগন্য	নগন্য
বাইকার্বনেট	২·৩৯	০·৮০	০·৭০
ক্লোরাইড	৩·৯৭	০·০৬	০·০৩
সালফেট	২·৮৫	নগন্য	নগন্য
মোট অ্যানায়ন	৯·৮১	০·৮৬	০·৭৪
ক্ষার বিনিময় ক্ষমতা	৮·৪০	৭·৪৪	৭·৪৮
বিনিময়যোগ্য সোডিয়াম	৪·৩৬	০·৩৬	০·৩৩
বিনিময়যোগ্য পটাসিয়াম	০·১২	০·১২	০·১১
মোট নাইট্রোজেন	০·০৪ শতকরা হিসাবে	০·০৫	০·০৯
জৈব কার্বন	০·২৫	০·৩৬	০·৫৩
কার্বন নাইট্রোজেন অনুপাত	৬·২৫	৭·২০	৫.৮৯
জল ভেদন ক্ষমতা	০·০২ ইঞ্চি প্রতি ঘণ্টায়	১·০৭	১·৬৮

অম্ল মাটিতে চুন প্রয়োগের মাত্রা নির্ণয়ের জন্য যেমন রাসায়নিক পরীক্ষার প্রয়োজন হয় ক্ষার মৃত্তিকাতেও জিপসামের মাত্রা নির্ণয়ের জন্য তেমনই পরীক্ষার

প্রয়োজন হয়। জিপসাম প্রয়োগের মাত্রা নির্ণয়ের জন্য পরীক্ষা পদ্ধতি নিয়ে এবার আলোচনা করা যাক।

জিপসামের মাত্রা নির্ণয়প্রণালী : ৫ গ্রাম পরিমাণ মাটিকে একটা ২০০ মিলি লিটার শঙ্কু আকৃতির ফ্লাস্কে নিয়ে তাতে ১০০মিলি লিটার সম্পৃক্ত জিপসাম দ্রবণ মিশিয়ে যান্ত্রিক উপায়ে ৫ মিনিট আলোড়িত করার পর পরিশ্রুত করা হয়। এই দ্রবণের ৫ মিলি লিটার নির্যাস ১০০ মিলি লিটার ফ্লাস্কে নিয়ে তাতে জল দিয়ে প্রায় ২৫ মিলিলিটার করা হয়। তারপর তাতে ০·৫ মিলি লিটার অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইডের বাফার দ্রবণ যোগ করা হয়। এই দ্রবণকে ই বি টি সূচকের উপস্থিতিতে প্রমাণ ই. ডি. টি. এ. (ইথিলিন ডাই এ্যামিন টেট্রাএ্যাসিটিক এ্যাসিড) দ্বারা প্রশমিত করা হয়। মাটি ছাড়া একই প্রক্রিয়া পুনরায় সম্পন্ন করে পাঠ নেওয়া হয়। এই প্রশমন ক্রিয়ায় নির্দেশকের বর্ণ মদ্যলাল থেকে নীলবর্ণ ধারণ করে।

বিকারক প্রস্তুতি :

(১) সম্পৃক্ত $CaSO_4$ দ্রবণ প্রস্তুতির জন্য ৫ গ্রাম জিপসামকে এক লিটার জলে ১০ মিনিট যান্ত্রিক উপায়ে আলোড়িত করা হয়।

(২) বাফার তৈরির জন্য ৬৭·৫ গ্রাম কঠিন অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের মধ্যে ৫৭০ মিলি লিটার ঘন অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড যোগ করে জল দ্বারা এক লিটার পূর্ণ করা হয়।

(৩) সূচক—০·৫ গ্রাম ইরিওক্রোম ব্লাক টি (ই বি টি) এবং ৪·৫ গ্রাম হাইড্রোক্সিল অ্যামিন হাইড্রোক্লোরাইডকে (NH_2OH, HCl) ১০০ মিলি লিটার ৯৫ শতাংশ ইথানলে দ্রবীভূত করা হয়।

(৪) প্রমাণ ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড দ্রবণ প্রস্তুতির জন্য ০·৫ গ্রাম ক্যালসিয়াম কার্বনেটকে ১০ মিলি লিটার লঘু হাইড্রোক্লোরিক এ্যাসিডে দ্রবীভূত করে এক লিটার পূর্ণ করা হয়।

(৫) ০·০১ নর্মাল ই. ডি. টি. এ. দ্রবণ প্রস্তুতির জন্য ২ গ্রাম ই. ডি. টি. এ.-কে এক লিটার জলে দ্রবীভূত করা হয়। মাত্রা নিরূপণের জন্য উৎপন্ন দ্রবণকে প্রমাণ $CaCl_2$ দ্রবণ দ্বারা প্রশমিত করা হয়।

মানের চূর্ণীকৃত চুনাপাথরের পরিমাণ ভালোভাবে গুঁড়োকরা চুন, প্রয়োগের সময় জমিতে সমানভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে। মাটিতে ভালোভাবে কাজ করার জন্য চুন প্রয়োগ ফসল লাগানোর ২—৩ মাস আগেই সম্পন্ন করা উচিত। এই সময়ে জমিতে জল সরবরাহ থাকা প্রয়োজন। এর ফলে জমির ক্ষার বিনিময় ক্ষমতা (base exchange capacity) যথেষ্ট বৃদ্ধি পাবে। বলা বাহুল্য একবার পূর্ণমাত্রায় চুন প্রয়োগ করা হলে তার প্রতিক্রিয়া প্রায় পাঁচ বৎসর বজায় থাকে। কিন্তু এর পূর্বেই অম্লত্ব বেড়ে গেলে অন্তবর্তীকালের মধ্যেই আবার চুন প্রয়োগ করতে হবে। চুন প্রয়োগ, মাটিতে ফসফরাস সাম্যের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। পরীক্ষায় দেখা গেছে চুনপ্রয়োগে মাটিতে এ্যালুমিনিয়ম এবং ফেরিক ফসফেটের পরিমাণ কমে বটে কিন্তু অদ্রবণীয় ক্যালসিয়াম ফসফেটের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

ক্ষারীয় মাটির সমস্যা এবং সমাধান ৬

সমস্যাক্লিষ্ট মাটির মধ্যে লবণাক্ত, ক্ষারীয় লবণাক্ত বা ক্ষারীয় মাটি কৃষিজীবিদের কাছে এক একটা বড় প্রতিকূলতা। প্রতিটি মাটির উৎপত্তির কারণ ভিন্ন তাই এদের সমাধানের পথগুলিও ভিন্ন। কিন্তু সমস্যার কথা হল এদের কোন স্থায়ী সমাধানের পথ আজও কৃষি এবং মৃত্তিকা বিজ্ঞানীদের জানা নেই। কারণটা প্রাকৃতিক বলেই বোধহয় এদের বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষুদ্র শক্তির অসম লড়াই ক্ষণস্থায়ী।

পর্যায়ক্রমে দেখা যাক কোন্ পরিস্থিতিতে এদের উদ্ভব হয় এবং কিভাবে তার আপাত নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। আমাদের দেশে প্রায় ৭০ লক্ষ হেক্টর জমি লবণাক্ত, ক্ষারীয় লবণাক্ত বা ক্ষারীয় মাটির পর্যায়ে পড়ে। লবণাক্ত মাটির পরিচিতি বিভিন্ন প্রদেশে এমন কি বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন। মাটিতে অতিরিক্ত লবণ জমার কারণ প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম হতে পারে। সাধারণতঃ স্বল্প বৃষ্টিপাত অঞ্চলে ঠিকমত জল নিষ্কাশন ব্যবস্থা না থাকলে জল চুঁইয়ে মাটির নীচে চলে যাবার আগেই বাষ্পীভূত হয়। ফলে জমিতে ক্রমশঃ লবণের পরিমাণ বাড়তে থাকে। অনেক সময় সমুদ্রের লবণাক্ত জল জোয়ারের ফলে নিকটবর্তী কোন নীচু জমিতে ঢুকে আটকা পড়লে, ক্রমে জল বাষ্পীভূত হয়ে যায় এবং সেই দ্রবীভূত লবণ মাটিতে থেকে যায়। বিশেষ করে সমুদ্র উপকূলবর্তী কৃষি জমি প্রায়ই এই সমস্যা সম্বলিত হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে কৃত্রিম জলসেচের জন্য অধিক লবণযুক্ত জল সরবরাহ করা হলে ক্রমেই মাটি লবণ সমৃদ্ধ হতে হতে একসময় লবণাক্ত মাটির পর্যায়ে এসে পড়ে। হরিয়ানা এবং পাঞ্জাবে প্রায় ২৮ লক্ষ হেক্টর জমি এভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।

লবণাক্ত মাটির তড়িৎ পরিবাহিতা সাধারণতঃ ৪ মিলি মোহ প্রতি সেন্টিমিটারে বা তার অধিক হতে দেখা যায়। এইসব মাটির বিনিময়যোগ্য সোডিয়ামের পরিমাণ (exchangable sodium) ১৫ শতাংশের বেশী এবং pH সাধারণতঃ ৮·৫ এর নীচে হয়ে থাকে। এইসব জমিতে উপকারী জীবাণুর ক্রিয়া খুবই সীমিত হয়ে থাকে। তাই এইসব মাটিতে জৈব পদার্থ উপযুক্ত জারনের অভাবে বিপদের সূচনা করে। এ ছাড়া এ্যালুমিনিয়ম এবং লোহা প্রায়ই উদ্ভিদ বৃদ্ধির প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

লবণাক্ত জমির লবণমুক্তির একটা পথ হল মাটির উপর সঞ্চিত লবণের স্তরকে চেঁছে ফেলে দেওয়া। এই পদ্ধতি সব সময় সন্তোষজনক হয় না। কারণ মাটির উপর থেকে সম্পূর্ণ লবণ এভাবে মুক্ত করা সম্ভব নয়। এ ছাড়া অন্য একটা পন্থা হল লবণাক্ত জমিতে জল দাঁড় করিয়ে রাখা। কিছুকাল পরে সেই জল নিষ্কাশন করলে জমি অনেকাংশে দ্রবণীয় লবণমুক্ত হতে পারে। বাংলাদেশে সুন্দরবন এলাকায় চাষের জমিকে সমুদ্রজল থেকে বাঁচবার জন্য মাটির বাঁধ দিয়ে জোয়ারের জল প্রবেশ রোধের প্রচেষ্টা করা হয়।

ক্ষারীয় লবণাক্ত মাটিতে নীচের স্তর (sub soil) দুর্ভেদ্য শক্ত কাদার আস্তরণ থাকে যাকে অনেক সময় কাঙ্কর বলে অভিহিত করা হয়। এর ফলে এইসব জমিতে প্রায়ই জল দাঁড়িয়ে সমস্যার সৃষ্টি করে। **ক্ষার মাটির উপর স্তরে পিচ্ছিল আস্তরণ এবং নীচের স্তরে অভেদ্য দৃঢ় আস্তরণ থাকে বলে এই মাটি চাষের কাজে প্রায় অনুপযুক্ত বলা চলে।** এ ছাড়া এই মাটিতে সোডিয়াম ও অন্যান্য ক্ষার ধাতুর পরিমাণ যথেষ্ট বেশী হয়। এই মাটির তড়িৎ পরিবাহিতা ৪ মিলি মোহ প্রতি সেন্টিমিটারের বেশী হতে দেখা যায়। এই মাটিতে বিনিময়যোগ্য সোডিয়ামের পরিমাণ ১৫ শতাংশের বেশী এবং pH ৮·৫ বা তার বেশীও হতে পারে। জলধৌত করে (leaching) এই জমির লবণের পরিমাণ কমানো যায়। এই জমির জল নিষ্কাশন ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য দ্বিতীয় স্তরে কাঙ্করের শক্ত আস্তরণ ভেঙে দিলেও সন্তোষজনক ফল পাওয়া যেতে পারে।

ক্ষারীয় মাটিতে অভেদ্য কাঙ্কর স্তর ছাড়াও অত্যধিক পরিমাণে সোডিয়াম ও অন্যান্য ক্ষারধাতু বর্তমান থাকে। এই মাটির তড়িৎপরিবাহিতা সাধারণতঃ ৪ মিলি মোহের (প্রতি সেন্টিমিটারে) কম হয়। এই মাটিতে বিনিময়যোগ্য সোডিয়ামের পরিমাণ ১৫ শতাংশের বেশী এবং মাটির pH ৮·৫ থেকে ১০·৫ পর্যন্ত হতে দেখা যায়। যান্ত্রিক পদ্ধতি ছাড়া এইসব মাটিতে জিপসাম ($CaSO_4$, $2H_2O$) প্রয়োগ করে সুফল দেখা যায়। জিপসাম মাটিতে অবস্থিত মুক্ত কার্বনেটের সঙ্গে বিক্রিয়ায় অদ্রাব্য ক্যালসিয়াম কার্বনেট উৎপন্ন করে। এ ছাড়া সোডিয়াম ও পটাসিয়াম সালফেটও উৎপন্ন হয়। এই দ্রবণীয় সালফেট লবণ বৃষ্টিপাত বা ধৌত পদ্ধতির সাহায্যে মুক্ত করা হয়। ক্যালসিয়াম কার্বনেট জৈবসারের ক্রিয়ায় ক্রমে ক্রমে মুক্ত হয়ে যায়। জিপসাম ছাড়া ক্ষারমাটিতে গন্ধক, চিটাগুড় বা ইক্ষুচিনি শিল্পের অম্লধর্মী গাদ (Press mud) ব্যবহারের রীতি আছে।

গন্ধক, মাটির গন্ধক ব্যাক্টিরিয়ার ক্রিয়ায় (**থ্যায়োব্যাসিলাস থ্যায়োঅক্সিডেনস, থ্যায়োব্যাসিলাস ফেরোঅক্সিডেনস** ইত্যাদি) সালফিউরিক এ্যাসিডে পরিণত হয়। উৎপন্ন সালফিউরিক এ্যাসিড মাটির ক্ষারত্বকে আংশিক প্রশমিত করে। বিভিন্ন উদ্ভিদের সাফল্যজনক ফলনের জন্য সবুজ সার বা খামারজাত উপসারের সঙ্গে হেক্টর প্রতি ৬·৭৫-১১·২৫ মে. টন জিপসাম প্রয়োগে সুফল পাওয়া যায়। গন্ধকের ক্রিয়া সফলভাবে পেতে গেলেও জৈবসার বা সবুজ সার প্রয়োগ করতে হবে। জিপসাম প্রয়োগের ফলে মাটির কি রকম পরিবর্তন হয় তা পরবর্তী পৃষ্ঠায় তালিকা দেখে বোঝা যাবে (তালিকা ১)।

এই পরীক্ষায় মাটিতে একর প্রতি তিন টন অর্থাৎ হেক্টর প্রতি ৭·৫. মেট্রিক টন গুড়ো জিপসাম প্রয়োগ করা হয়েছিল।

কিছু কিছু ফসল আবার মাটির ক্ষারত্বকে বেশ খানিকটা সহ্য করতে পারে। এই পর্যায়ভুক্ত কিছু গাছ হল বীট, ধান, নীল, বাবুল ইত্যাদি। সমুদ্র উপকূলের মাটিতে অতিরিক্ত লবণ থাকার দরুন নারিকেলের ফলন ভালো হয়। কিন্তু সাধারণ চাষের ক্ষেত্রে ক্ষারত্বমোচন অপরিহার্য। এবার জিপসাম প্রয়োগে কয়েকটি ফসলের ফলনের প্রতিক্রিয়া দেখলে কৃষিক্ষেত্রে জিপসাম প্রয়োগের তাৎপর্য বোঝা যাবে (তালিকা ২)।

তালিকা ২ : ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার জিপসাম প্রয়োগের ফলে শস্যের ফলন প্রতিক্রিয়া

(গোবিন্দ রাজন এবং গোপালা রাও ১৯৭৮)

জিপসাম প্রয়োগের পরিমাণ (টন প্রতি হেক্টরে)	প্রথম বৎসরে ফলন কুইন্টাল প্রতি হেক্টরে			দ্বিতীয় বৎসরে ফলন কুইন্টাল প্রতি হেক্টরে		
	ধান	গম	যব	ধান	গম	যব
০	২·৩৭	০·৪৩	০·৪০	৫১·০৯	৩১·৭	৩৮·৭
৭·৫	১৪·৪১	১৬ ৪০	২২·০৮	৫১·২	৩৬·৩	৪০·৭
১৫·০	২২·৬৬	২৮·১০	২৫·৮৫	৫৬ ৩	৪০·২	৪২·৭
২২·৫	৩০ ২৬	৩৪·০৫	২৯·২৭	৫৪ ৮	৩৭·৭	৪৭·৩
৩০·৩	৩৪.৭০	৩৭·৯০	৩৩·১৮	৫৪·০	৩৮·৭	৪৮·৮

১ টন = ১·০১৬১ মেট্রিকটন

গণনা : ধরা যাক ই. ডি. টি. এ. দ্রবণের মাত্রা N মাটি ছাড়া প্রশমনের জন্য প্রয়োজনীয় ই. ডি. টি. এর পরিমাণ A মিলি লিটার।

মাটিযুক্ত অবস্থায় প্রশমনের জন্য প্রয়োজনীয় ই. ডি. টি. এর পরিমাণ B মিলি লিটার

সুতরাং জিপসামের প্রয়োজনীয় মাত্রা =৩৪৪ N (A—B) টন প্রতি একরে একে ২·৫১ দ্বারা গুণ করে, মে. টন প্রতি হেক্টরে পরিণত করতে হবে। [জিপসামের আণবিক গুরুত্ব : ১৭২]

জীবাণু সার বলতে কি বোঝায়

উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্য জল এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইড ছাড়াও প্রয়োজন হয় নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাসিয়াম, গন্ধক, ম্যাগনেসিয়াম, ক্যালসিয়াম, লোহা, ম্যাঙ্গানীজ, বোরন, দস্তা, তামা, মলিবডেনাম এবং কোবাল্টের মত নানাবিধ মৌলের। মাটিতে এইসব মৌল আসে ক্ষয়ীভূত শিলা থেকে বা জৈব-পদার্থের খনিজিকরণ mineralisation) থেকে। **উদ্ভিদের গ্রহণযোগ্য দ্রবণীয় এবং উদ্ভিদের অগ্রহণযোগ্য অদ্রবণীয় যৌগগুলি মাটিতে একটা সাম্য রক্ষা করে চলে। কিন্তু জীবাণুর ক্রিয়াতে এই সাম্য হয় গতিশীল**। তাই একই মৌলিক উপাদানগুলি চক্রপথে বারবার আসছে এবং বারবার ব্যবহৃত হচ্ছে। মাটিতে দ্রবণীয় পর্যায়ের যৌগ, সার হিসাবে প্রযুক্ত হলে তার একাংশ উদ্ভিদের কাছে সহজে গ্রহণযোগ্য হয় বটে, কিন্তু তার একটা বড় অংশ সেচের জলের সাথে ধুয়ে চলে যায় এবং আর এক অংশ মাটির স্তর ভেদ করে উদ্ভিদ মূলের সীমানা ছাড়িয়ে অনেক নীচে চলে যায় যা সম্পূর্ণভাবে অপচয় ছাড়া আর কিছু নয়। তাই জলে অপেক্ষাকৃত কম দ্রবণীয়, এমন পদার্থ জমিতে প্রয়োগ করলে তা উপরোক্ত দুটির কোন উপায়েই নষ্ট হতে পারে না। উপরোক্ত দুটি পদ্ধতি ছাড়াও দ্রবণীয় সুপার ফসফেট জাতীয় সার মাটির মুক্ত ক্যালসিয়াম, এ্যালুমিনিয়ম বা লোহার সঙ্গে ক্রিয়ায় অদ্রবণীয় ফসফেট লবণে পরিণত হয় যা উদ্ভিদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। এ ছাড়া প্রদত্ত সারের একটা বড় অংশই যায় জীবাণুর কোষ গঠনে। তাই বোঝা যাচ্ছে প্রদত্ত সারের প্রায় অর্ধেকই নষ্ট হয় বিভিন্ন অবাঞ্ছিত প্রক্রিয়ার ফলে। যে কোন উর্বর চাষের জমিতেই প্রচুর পরিমাণে উপকারী জীবাণু থাকে। এদের সংখ্যা প্রতি গ্রাম উর্বর মাটিতে ১০^{৮} থেকে ১০^{৯} পর্যন্ত হয়ে থাকে। এদের অধিকাংশই আবার ব্যাক্টিরিয়ার পর্যায়ভুক্ত। এইসব জীবাণুর ক্রিয়াকে সুষ্ঠ উপায়ে কৃষির প্রয়োজনে লাগানোই হল কৃষি জীবাণু বিজ্ঞানীদের মূল লক্ষ্য। জৈবসার প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আমরা

জেনেছি জৈবসার কেবলমাত্র উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় যৌলের যোগানই দেয় না উপরন্তু তা জমির হিউমাসের পরিমাণ বৃদ্ধি করে এবং জমির বিভিন্ন ভৌত অবস্থার উন্নতি ঘটায় যা উদ্ভিদ মাটি এবং জীবাণুর একটা সুস্থ সাম্য বজায় রাখতে একান্ত-ভাবে প্রয়োজনীয়। তাই বোঝা যাচ্ছে যে জৈবসারের সাফল্য জীবাণুর ক্রিয়ার উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল।

জৈবসার বা সবুজ সারের মূল উপাদান হল কার্বন। এই কার্বনজাত যৌগ মৃতজীবী (Saprophytes) জীবাণুর শক্তি উৎপাদনে কার্বনের উৎস হিসাবে ব্যবহৃত হয়। মাটির জীবাণুকে প্রধানতঃ দুইভাগে ভাগ করা হয়। স্থানীয় (Indigenous) বা Autochthonus) এবং অনুপ্রবেশকারী (Invader বা Allochthonus) এদের মধ্যে এক শ্রেণী নির্ভর করে মাটির হিউমাসের উপর, বলা বাহুল্য এরা জৈবসারের অতিরিক্ত কার্বনজাত পদার্থের সরবরাহে তেমনভাবে প্রভাবিত হয় না। কিন্তু মাটিতে অবস্থানকারী এক বিশেষ শ্রেণী (Zymogenous) এবং বহিরাগত বা অনুপ্রবেশকারী কিছু ব্যাক্টিরিয়া এবং বিশেষ করে ছত্রাক জৈব পদার্থের বিবর্তনে মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। এই বিবর্তন প্রক্রিয়ার সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত জীবাণুর ক্রিয়ায় বিভিন্ন যৌলগুলি দ্রবণীয় পর্যায়ে আসে। তাই কোন জমিতে উপকারী জীবাণুর সংখ্যা অধিক পরিমাণে থাকলে, অধিক পরিমাণে উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় যৌলগুলিও মুক্ত অবস্থায় থাকবে বলে আশা করা যায়। উদ্ভিদখাদ্য সরবরাহ পর্যাপ্ত থাকলে তবেই উদ্ভিদের ফলন বেশী হবে। আবার ফলন অধিক হলে উদ্ভিদের মৃত্যুর পর মাটিতে শিকড়সহ তাদের প্রচুর দেহাবশেষ পড়ে থাকবে। এই দেহাবশেষ ব্যবহৃত হবে পুনরায় জীবাণুর বৃদ্ধির জন্য। এভাবে উর্বর জমিতে একটা গতিশীল সাম্য সর্বদাই বজায় থাকবে। কিন্তু এই প্রাকৃতিক সাম্যের মাধ্যমে প্রায়ই কৃষি উদ্ভিদের চাহিদা মেটে না। তার প্রধান কারণ, কোন বিশেষ জীবাণু কোন বিশেষ মাটিতে বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে সক্রিয় হয়ে উঠে। তাই বিশেষ কোন যৌলের ক্রিয়া সব জমিতে সব সময়ের জন্য অব্যাহত থাকতে পারে না। অবশ্য কোন বিশেষ প্রক্রিয়া উক্ত মাটির স্থানীয় (native) জীবাণু দ্বারা নিম্নমানে চলতে পারে (with low efficiency)। এই মান উন্নয়নের তাগিদ আসে উদ্ভিদের প্রয়োজনেই। রাসায়নিক সার প্রয়োগের কোন ক্ষেত্রে জীবাণু হল বিকল্প, আবার

কোন ক্ষেত্রে জীবাণু হল রাসায়নিক সারের সহযোগী। কিন্তু জীবাণুসার প্রয়োগের খরচ রাসায়নিক সার প্রয়োগের খরচের চেয়ে অনেক কম।

এখন দেখা যাক জীবাণু সার বলতে কি বোঝায়? কোন বিশেষ শক্তিশালী জীবাণুকে উপযুক্ত জৈবসার সহযোগে সঠিকভাবে প্রয়োগের পদ্ধতিই হল জীবাণু সার প্রয়োগ। বিভিন্ন মৌলের জীবাণুঘটিত বিবর্তন নিরীক্ষা করলে আমরা দেখব উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় মৌলগুলির মধ্যে নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও গন্ধক জীবাণুর জীবনচক্রের সঙ্গে মুখ্যতঃ জড়িত। এর প্রধান কারণ, লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এইসব অধাতব মৌলগুলি জীবকোষ গঠনের চাবিকাঠি। এরা উৎসেচক ঘটিত নানাবিধ বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে থাকে। এদের জীব রাসায়নিক গুরুত্ব অপরিসীম। অপরপক্ষে অতীব প্রয়োজনীয় হলেও পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম ইত্যাদি ধাতব মৌলগুলি কিভাবে বিপাকীয় ক্রিয়ার সামিল হয় তা আজও পরিষ্কারভাবে জানা যায় নি। এরা সাধারণতঃ জৈব পদার্থে প্রবেশ করে না। তাই এই মৌলগুলির জীবাণুঘটিত বিবর্তনচক্র তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়।

বিশেষ করে নাইট্রোজেনচক্র বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখব, বায়ুমণ্ডলীয় **নাইট্রোজেনকে দেহকোষে আবদ্ধ করবার ক্ষমতা সম্পন্ন একশ্রেণীর জীবাণু জীবমণ্ডলে (biosphere) গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে। এদের অনন্য বলার কারণ হল উদ্ভিদ এবং প্রাণীজগতে এ ঘটনা সত্যি বিরল। কিছু কিছু আদ্যপ্রাণী (Protozoa)** এবং জীবাণুর সহযোগিতায় কয়েকশ্রেণীর উদ্ভিদই কেবলমাত্র এই বিচিত্র ক্ষমতার অধিকারী। জীবাণুঘটিত নাইট্রোজেন বন্ধন দুইপ্রকার হতে পারে। প্রথমতঃ মুক্তজীবী (free living) ব্যাক্টিরিয়া বা নীল সবুজ শেওলা এবং দ্বিতীয়তঃ সহজীবী (Symbiont) ব্যাক্টিরিয়া ও উদ্ভিদ এবং নীলসবুজ শেওলা, ছত্রাক বা এ্যাজোলা নামে একপ্রকার ফার্ণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যৌথ প্রক্রিয়ায় বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন কোষে আবদ্ধ করে প্রোটিন হিসাবে। মুক্তজীবী নাইট্রোজেন বন্ধনকারী জীবাণুর মধ্যে ব্যাক্টিরিয়াই প্রধান হলেও অপেক্ষাকৃত কম সক্রিয় মুক্তজীবী নাইট্রোজেন বন্ধনকারীর পর্যায়ভুক্ত কিছু কিছু ছত্রাক, নীল সবুজ শেওলা এবং একটিনোমাইসিটসের নামও আমাদের পরিচিত। এদের মধ্যে কেবলমাত্র **ব্যাক্টিরিয়াকেই নাইট্রোজেন ঘটিত জীবাণু সার হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে।** অবাত শ্বসনকারী জীবাণুর সক্রিয়তা নিম্নমানের হওয়ার জন্য এবং

তাদের পরীক্ষাগারের কৃষ্টিমাধ্যমে আবাদ করা (culture) যথেষ্ট কষ্টসাধ্য হওয়ায় ব্যবহারিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে তারা যোগ্য স্থান দখল করে নিতে পারে না। সবাত শ্বসনকারী সহজলভ্য এবং সর্বাধিক সক্রিয় মুক্তজীবী নাইট্রোজেন বন্ধনকারী ব্যাক্টিরিয়া হল **এ্যাজোটোব্যাক্টার** (*Azotobacter*)। এই **এ্যাজোটো-ব্যাক্টার** গণের (genus) সক্রিয় প্রজাতির মধ্যে **এ্যাজোটোব্যাক্টার ক্রকক্কাম** এবং **এ্যাজোটোব্যাক্টার ভাইনল্যাণ্ডি** উল্লেখযোগ্য। নাইট্রোজেন বন্ধনকারী জীবাণু হিসাবে **এ্যাজোটোব্যাক্টার** এর ব্যবহারই সমধিক প্রচলিত। বাণিজ্যিক জগতে এই জীবাণু সার এ্যাজোটোব্যাক্টিরিন নামে পরিচিত। এ ছাড়া বর্তমানে **এ্যাজোস্পিরিলাম** (*Azospirillum*) নামক একশ্রেণীর উত্তমমানের নাইট্রোজেন বন্ধনকারী জীবাণুর প্রয়োগ সম্ভাবনা নিয়ে গবেষণা চলেছে। মাটিতে **এ্যাজোটোব্যাক্টারের** সাফল্য সম্বন্ধে অনেকেই সন্দিহান। তার প্রধান কারণ হল এই শ্রেণীর জীবাণুর উচ্চ শ্বসন হারের জন্য প্রয়োজন মত দ্রবণীয় পর্যায়ের কার্বনজাত পদার্থের যোগান দেওয়াই একটা বড় সমস্যা।

নীলসবুজ শেওলার নাইট্রোজেন বন্ধন ক্ষমতা **এ্যাজোটোব্যাক্টার** অপেক্ষা অনেক কম হলেও এদের প্রয়োগ সুবিধাজনক এই কারণে যে এরা স্বভোজী। তাই এদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য জৈব পদার্থ সরবরাহের প্রয়োজন হয় না। এরা বায়ু-মণ্ডলীয় কার্বন (কার্বন-ডাই-অক্সাইড থেকে) ও নাইট্রোজেনকে একই সঙ্গে বন্ধন করে জমির কার্বন ও নাইট্রোজেন উভয়ের পরিমাণই বৃদ্ধি করে। এ ছাড়াও নীলসবুজ শেওলার প্রয়োগে অন্য যেসব সুফল দেখা যায় পরবর্তী অধ্যায়ে তার পৃথক আলোচনা করা হবে। বিশেষ করে **নীলসবুজ শেওলার ক্রিয়া জলে ডোবা ধান জমিতে খুবই সন্তোষজনক।**

নাইট্রাজিন জীবাণু সার হিসাবে পরিচিত, কড়াইজাতীয় উদ্ভিদের ক্ষেত্রে (leguminous plant) **রাইজোবিয়াম** (*Rhizobium*) জীবাণুর সাফল্য সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। কড়াইজাতীয় উদ্ভিদের মূলে এক ধরনের অর্বুদ বা গুটি (nodule) দেখা যায়। ঐ গুটিগুলি হল **রাইজোবিয়ামের** আবাসস্থল। এই প্রাকৃতিক শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ফলে জীবাণু উদ্ভিদ দেহ থেকে কার্বনজাত পদার্থের সরবরাহ পায়। পক্ষান্তরে উদ্ভিদ জীবাণুর কাছ থেকে পায় কোষগঠনের উপাদান নাইট্রোজেনের সরবরাহ। **জীবাণু-সার হিসাবে**

রাইজোবিয়াম প্রয়োগ করতে হলে জমিতে জৈবসার প্রয়োগের খুব বেশী প্রয়োজন হয় না। বিভিন্ন শ্রেণীর কড়াই জাতীয় গাছের উপর রাইজোবিয়ামের ক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতি দ্বারা হয়ে থাকে। এক একটি বিশেষ শ্রেণীর রাইজোবিয়াম কয়েক শ্রেণীর কড়াই জাতীয় গাছের উপর সক্রিয় হতে দেখা যায়। এদের বলে বিপ্রতীপ প্রয়োগ শ্রেণী (Cross inoculation group)। কড়াই জাতীয় গাছের শিকড়ে গুটি হওয়া প্রাকৃতিক ঘটনা। কিন্তু কোন বিশেষ মাটিতে গুটির সংখ্যা সন্তোষজনক না হলে এই জীবাণু সার প্রয়োগে আশাতীত ফল পাওয়া যায়।

জীবাণু সার হিসাবে ব্যবহৃত হয় এমন আর এক শ্রেণী হল ফসফোব্যাক্টিরিন। বিভিন্নগণের, বিভিন্ন প্রজাতির জীবাণু তাদের নানাবিধ ক্রিয়ার ফলে মাটির অদ্রবণীয় ফসফেটকে বা মাটিতে যুক্ত পাথুরে ফসফেট, অস্থিচূর্ণ বা ফসফরাস সমৃদ্ধ ক্ষারধর্মী ধাতুমল থেকে দ্রবণীয় পর্যায়ের ফসফেট মুক্ত করতে সক্ষম। এদের মধ্যে ব্যাসিলাস মেগাথেরিয়াম (*Bacillus megatherium*) প্রজাতির ব্যাক্টিরিয়াকে জীবাণু সার হিসাবে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। এই শ্রেণীর জীবাণু প্রধানতঃ মাটির অদ্রবণীয় জৈব পর্যায়ের ফসফরাস বা অজৈব ট্রাইক্যালসিয়াম ফসফেটের উপর সক্রিয় হয়ে দ্রবণীয় ফসফরাস মুক্ত করতে সক্ষম। জৈব ফসফরাস সমৃদ্ধ পদার্থের উপর এদের ক্রিয়া ফসফেটেজে উৎসেচকঘটিত এবং অজৈব ফসফেটের উপর এদের ক্রিয়া মুখ্যতঃ বিপাকীয় ক্রিয়ায় উৎপন্ন জৈব এ্যাসিডের উপর নির্ভরশীল। ব্যাসিলাস মেগাথেরিয়াম ছাড়াও অজস্র ব্যাক্টিরিয়া, একটিনোমাইসিট্ এবং ছত্রাক জৈব বা অজৈব ফসফরাস সমৃদ্ধ অদ্রবণীয় যৌগ থেকে দ্রবণীয় পর্যায়ের ফসফরাস মুক্ত করতে সক্ষম।

অল্প পরিমাণে প্রয়োজনীয় মৌলের জন্য (micro-elements) অবশ্য কোন জীবাণু সার প্রয়োগের প্রচলন নেই। পক্ষান্তরে, অনেকেই মুক্তজীবী নাইট্রোজেন বন্ধনকারী জীবাণুর প্রয়োগে প্রাপ্ত সুফলকে কেবলমাত্র নাইট্রোজেন বন্ধনজাত বলে স্বীকার করেন না। অনেক বিজ্ঞানীর মতে মাটিতে এজোটোব্যাক্টারের সাফল্যের কারণ এদের উদ্ভিদ হর্মোন উৎপাদন ক্ষমতা। কিন্তু এ সম্বন্ধে যথেষ্ট গবেষণা না হওয়ায় নিশ্চিত করে কিছু মন্তব্য করা কঠিন। তবে অবশ্য বেশ কিছু নাইট্রোজেন বন্ধনকারী ব্যাক্টিরিয়া, নীলসবুজ শেওলা বা সাধারণ জীবাণু বিভিন্ন উদ্ভিদ উদ্দীপক পদার্থ উৎপাদনে সক্ষম এ

তথ্য প্রমাণিত হয়েছে। জমিতে সার হিসাবে এদের (এইসব জীবাণুর) প্রয়োগরীতি আজও প্রচলিত হয় নি। এর কারণ হল উপযুক্ত ক্ষমতাশালী জীবাণু চয়নের গবেষণার অভাব। বিভিন্ন উচ্চ শক্তিশালী নাইট্রোজেন বন্ধনকারী বা ফসফেট দ্রবণকারী জীবাণুর মধ্যে এ ক্ষমতা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বর্তমান থাকতে পারে। এরূপ কয়েকটি প্রজাতির সন্ধান ও তাদের সম্ভাবনা সম্বন্ধে পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হবে।

কৃষিবিজ্ঞানে জীবাণু সার হিসাবেই শুধু জীবাণুর ব্যবহার সীমিত নেই। কৃষিক্ষেত্রে কীটনাশক হিসাবে যে বিবিধ রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রয়োগ করা হয় তার নানাবিধ কুফলের হাত থেকে রক্ষা পাবার একটা সমাধান নির্বাচিত জীবাণুর প্রয়োগে সম্ভব হয়েছে। বিভিন্ন উদ্ভিদ-রোগ উৎপাদনকারী পতঙ্গ, বিশেষ বিশেষ জীবাণুর দ্বারা আক্রান্ত ও নির্মূল হয়। উপযুক্তভাবে ঐসব জীবাণুকে চয়ন করে পতঙ্গক্লিষ্ট উদ্ভিদে প্রয়োগ করলে অপকারী পতঙ্গের হাত থেকে ফসলকে রক্ষা করা যাবে। এই পতঙ্গ নির্মূলকারী জীবাণুরা বিভিন্ন প্রজাতির ভাইরাস, ব্যাক্টিরিয়া, প্রোটোজোয়া বা ছত্রাক হয়ে থাকে। এদের বিপুল সম্ভাবনা সম্বন্ধেও পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। জীবাণু বিজ্ঞানের ব্যবহার আজ নানা শিল্পে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। আশা করা যায় কৃষিক্ষেত্রেও এর প্রয়োগ দিন দিন বেড়ে চলবে এবং এর ফলে আরো নূতন নূতন দিগন্ত উন্মোচিত হবে। কৃষিবিজ্ঞানে জীবাণুর সম্ভাবনা সম্বন্ধে জনসাধারণকে, বিশেষ করে কৃষিজীবিদের সচেতন করাই হল এই পুস্তিকার মূল উদ্দেশ্য।

নীলসবুজ শেওলা এবং এজোলা ৮

মাটি, জল, বাঁধানো স্যাঁতস্যাতে জায়গা এমন কি গাছের ছালে পর্যন্ত শ্যাওলার বিস্তার সর্বত্র। সবুজ, নীলসবুজ, কালচে সবুজ, হলদে সবুজ ইত্যাদি নানা বর্ণের সম্ভার সাজিয়ে শেওলা প্রকৃতির সর্বত্র বিরাজ করছে। প্রকৃতপক্ষে শেওলা হল থ্যালাস শ্রেণীভুক্ত (থ্যালাস অর্থ যাদের মূল, কাণ্ড, পাতা, ফুল ও ফলের পার্থক্য করা যায় না) এককোষী বা বহুকোষী সবুজ উদ্ভিদ। এরা নিজের খাদ্য নিজে উৎপাদন করতে পারে। এরা কোষ দ্বিবিভাজন (binary cell division), অযৌন এবং যৌন প্রক্রিয়ায় বংশ বৃদ্ধি করতে পারে বলে এদের বংশ বৃদ্ধির হার অত্যন্ত দ্রুত হয়ে থাকে। এরা সচরাচর যেখানে জন্মায় সেখানে একটা পিচ্ছিল আস্তরণের সৃষ্টি করে।

বৈজ্ঞানিক ফ্রিংসের মতে শেওলাকে নয়টি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, কিন্তু বর্তমানে শেওলাকে দশটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। এই শ্রেণীগুলি পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখানো হল :

বিভিন্ন জাতের শেওলা বিভিন্ন স্থানে জন্মায়। যেমন মুক্ত জলে ভাসমান অবস্থায়, স্রোতের জলে, জলাশয়ের তলায়, পাথরের গায়ে, সমুদ্রের লবণাক্ত জলে, গাছ বা প্রাণীর দেহে এবং মাটিতে। আমাদের প্রধান আগ্রহ হল শুধু মাটিতে বসবাসকারী শেওলাদের নিয়ে। এক শ্রেণীর শেওলা জন্মায় মাটির উপরিস্তরে, এদের বলে স্যাফোফাইট (Saphophytes) এবং আর এক শ্রেণী জন্মায় মাটির নীচের স্তরে, এদের বলে ক্রিপটোফাইট (Cryptophytes)। ভিজা মাটির উপর যে শেওলা জন্মায় তারা হল স্বভোজী (Photo synthetic) কিন্তু পরিবর্তিত পরিবেশে তারা ক্লোরোফিল হারিয়ে মাটির নীচের স্তরে ব্যাক্টিরিয়া বা ছত্রাকের মত পরভোজী (heterotrophic) জীবন, চালাতে পারে। কিন্তু মাটির উপরিতলে উঠে এলে এরা আবার স্বাভাবিক স্বভোজী পর্যায় ফিরে পায়। মাটিতে প্রধানতঃ সবুজ, নীলসবুজ এবং হলদে সবুজ শেওলার প্রাধান্য দেখা যায়।

নীলসবুজ শেওলা, ব্যাক্টিরিয়া বা একটিনোমাইসিটসের মত অবিন্যস্ত নিউক্লিয়াসযুক্ত (Procaryotic) অর্থাৎ নিউক্লিয়াসের মূল উপাদান ডি. এন. এ. সাইটোপ্লাজম থেকে নিউক্লিয় পর্দা দ্বারা আবৃত হয়ে পৃথকভাবে অবস্থান করে না।

বৈজ্ঞানিক নাম	পরিচিত নাম
সায়নোফিসি Cyanophyceae বা মিক্সোফিসি Myxophyceae	নীলসবুজ শেওলা
ক্লোরোফিসি Chlorophyceae	সবুজ শেওলা
ইউগ্লেনোফিসি Euglenophyceae	কমলা শেওলা
জ্যান্থোফিসি Xanthophyceae	হলদে সবুজ শেওলা
ব্যাসিলারিওফিসি Bacillariophyceae	ডাইএটম
পাইরোফিসি Pyrophyceae	অগ্নিশৈবাল
ফিওফিসি Phaeophyceae	বাদামী শেওলা
রোডোফিসি Rhodophyceae	লাল শেওলা
ক্রাইসোফিসি Chrysophyceae	সোণালী শেওলা
ক্রিপটোফিসি Cryptophyceae	হিম শেওলা (বর্ণের কোন বিশেষত্ব নেই)

কিন্তু অন্য শেওলারা বিন্যস্ত নিউক্লিয়াসযুক্ত (Eucaryotic) হয় অর্থাৎ তাদের ডি. এন. এ. নিউক্লিয় পর্দা দ্বারা আবৃত থাকে এবং সাইটোপ্লাজম থেকে পৃথকভাবে অবস্থান করে। চাষের জমিতে, জলে ভাসমান নীলসবুজ শেওলা অক্সিজেন

উৎপন্ন করে গাছের শিকড় এবং মাটির জীবাণুর (সবাত শ্বসনকারী) শ্বসনের জন্য প্রয়োজনীয় অক্সিজেন সরবরাহের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এছাড়া বিভিন্ন শ্রেণীর শেওলা মাটিতে আঁঠালো পদার্থ উৎপাদন করে মাটির স্বাভাবিক গঠন বৈশিষ্ট বজায় রাখে, যার ফলে ভূমিক্ষয় রোধ হয়। এইসব ক্ষমতা ছাড়াও নীল-সবুজ শেওলা মুক্তজীবী ব্যাক্টিরিয়ার মত বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন বন্ধনে সক্ষম।

সায়ানোফিসি বা নীলসবুজ শেওলার বিশেষত্বগুলি হল :

(১) এরা অবিন্যস্ত নিউক্লিয়াসযুক্ত (Procaryotic),

(২) এদের জীবনচক্রে চলনাঙ্গ সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত (aflagellated),

(৩) কোন জিনিস বেয়ে বেয়ে চলা (gliding motion) হল এদের চলনের বৈশিষ্ট।

(৪) এদের মধ্যে সালোক-সংশ্লেষকারী রঞ্জক পদার্থ হিসাবে বিলোপ্রোটিনের (ফাইকোসায়ানিন বা ফাইকোএরিথ্রিন) সঙ্গে এক অনন্য ক্যারোটিন মিক্সো-জ্যানথিন এবং মিক্সোক্লোরোফিল থাকে।

(৫) এদের দেহে সঞ্চিত খাদ্য হিসাবে মজুত থাকে সায়ানোফাইসিন নামে একপ্রকার বিশেষ প্রোটিন।

(৬) এদের মধ্যে যৌন জনন দেখা যায় না বটে কিন্তু ব্যাক্টিরিয়ার মত অবিন্যস্ত যৌন সম্মিলনের (Conjugation) মত ঘটনা ঘটা অস্বাভাবিক নয়।

ব্যাক্টিরিয়ার সঙ্গে নীলসবুজ শেওলার সাদৃশ্য : সাইজোফাইটা পর্বের (Phylum—*Schizophyta*) দুটি শ্রেণী (Class) হল, সাইজোফিসি [(*Schizophyceae*)—নীলসবুজ শেওলা] এবং সাইজোমাইসিট [(*Schizomycetes*)—ব্যাক্টিরিয়া] এদের প্রধান তিনটি মিল হল অবিন্যস্ত নিউক্লিয়াস (Procaryotic nucleus), যৌন জননের অক্ষমতা এবং প্লাসটিড হীনতা (lack of plastid)। এছাড়াও বিভিন্ন জৈবরাসায়নিক দৃষ্টিভঙ্গিতেও ব্যাক্টিরিয়া ও নীল-সবুজ শেওলার মিল খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু সবচেয়ে বড় মিল হল এন্টি-বায়োটিক উৎপাদন এবং নাইট্রোজেন বন্ধনক্ষমতা যা সাধারণতঃ সুবিন্যস্ত নিউক্লিয়াসযুক্ত কোষে প্রায়ই দেখা যায় না। নীলসবুজ শেওলার জীবনচক্রে হিটারোসিস্ট (heterocyst) নামক এক বিশেষ অবস্থা দেখা যায়। এই হিটারোসিস্টের মধ্যেই নাইট্রোজেন বন্ধন হয় বলে অনেক বিজ্ঞানীর বিশ্বাস।

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে কৃষি জমিতে বিশেষ করে জলমগ্ন ধান

জমিতে জীবাণু সার হিসাবে নীলসবুজ শেওলা প্রয়োগের ফল হবে বহুমুখী। প্রথমতঃ এরা জমিতে বায়ুমণ্ডলীয় নাইট্রোজেন বন্ধন করে জমির উর্বরতা বাড়াবে, দ্বিতীয়তঃ এরা মারা গেলে জমিতে জৈবকার্বন হিসাবে যুক্ত হবে, যার ফলে জমিতে নূতন জীবাণু জন্মানোর উপযুক্ত পরিবেশ বজায় থাকবে এবং তৃতীয়তঃ তাদের সালোকসংশ্লেষ ক্রিয়ায় নির্গত অক্সিজেন জীবাণু এবং উদ্ভিদ মূলের শ্বসনের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করবে। সায়ানোফিসি শ্রেণীর শেওলাকে চারটি প্রধান বর্গে (order) ভাগ করা হয়।

(১) ক্রুকক্কেলস (*Chroococcales*)—সাধারণতঃ এককোষী হয়ে থাকে। এদের হিটারোসিস্ট এবং হর্মোগোন থাকে না (হর্মোগোন হল গোল প্রান্তবিশিষ্ট ছোট ট্রাইকোম—অর্থাৎ কোষের মালাকার সজ্জায় গঠিত অনুসূত্র)।

(২) কিমোসিফোনেলস (*Chaemosiphonales*)- সাধারণতঃ এদের কোষগুলি একক বা শ্রেণীবদ্ধভাবে থাকতে পারে। এদের কোষের বাইরে সিথ (Seath) থাকে।

(৩) প্লিউরোক্যাপসেলস (*Pleurocapsales*)—এদের অনুসূত্রে (filament) হিটারোসিস্ট খুব স্পষ্ট নয়।

(৪) হরমোগোনেলস (*Hormogonales*)—এরা অনুসূত্র বিশিষ্ট, কিন্তু এদের অনুসূত্রে হিটারোসিস্ট এবং হর্মোগোনিয়ার অবস্থিতি খুব স্পষ্টভাবে দেখা যায়।

বাঙালী জীবাণু বিজ্ঞানী প্রাণকুমার দে-এর ১৯৩৯ সালের যুগান্তকারী আবিষ্কারের পর (নীলসবুজ শেওলা আণবিক নাইট্রোজেন বন্ধন করতে পারে) থেকেই নীলসবুজ শেওলার উপর কৃষি বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। বিশেষ করে জলমগ্ন ধান জমিতে কোন রাসায়নিক সার প্রয়োগ ব্যতীত কিভাবে বছরের পর বছর ধানের ফলন অব্যাহত থাকে এই ঘটনার উপর পরীক্ষা চালাতে গিয়ে তিনি এই মূল্যবান তথ্যটি আবিষ্কার করেন।

এরপর বহু নীলসবুজ শেওলার উপর নানাবিধ গবেষণা চলেছে। বর্তমানে কৃষি জমিতে নীলসবুজ শেওলার ভূমিকা নিঃসন্দেহে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; এ সম্বন্ধে কোন দ্বিধা নেই। সাধারণতঃ নস্টক (*Nostoc*), এনাবীনা (*Anabaena*), সিলিণ্ড্রোস্পার্মাম (*Cylindrospermum*), ক্যালোথ্রিক্স (*Calothrix*) টলিপোথ্রিক্স (*tolypothrix*), অলোসিরা (*Aulosira*) প্রভৃতি নীলসবুজ শেওলা নাইট্রোজেন বন্ধন ক্ষমতার অধিকারী। এদের মধ্যে নস্টক, এনাবীনা এবং সিলিণ্ড্রোস্পার্মামেরই সর্বাধিক প্রজাতি নাইট্রোজেন বন্ধন ক্ষমতার অধিকারী।

নীলসবুজ শেওলার গবেষণা সারা বিশ্বে সমানতালে চলছে। স্কটল্যাণ্ডের বিভিন্ন জমিতে মুক্তজীবি নাইট্রোজেন বন্ধনকারী সক্রিয় শেওলাদের একটা তালিকা প্রকাশ করা হল (তালিকা ১)।

তালিকা ১ঃ প্রাকৃতিক উৎস নির্ভর নীলসবুজ শেওলার প্রজাতি (স্টুওয়ার্ট, ১৯৭৩)

প্রাকৃতিক উৎস	প্রধান প্রধান গণের নীলসবুজ শেওলা
উন্মুক্ত জমি	নস্টক, এনাবীনা, সিলিণ্ড্রোস্পার্মাম, অসিল্যেলেটোরিয়া
আম্লিক পঙ্কিল জমি	অসিল্যেলেটোরিয়া, এনাবীনা, লিংগবিয়া নস্টক
সরলবর্গীয় বনভূমি	অসিল্যেলেটোরিয়া
পর্ণমোচী বনভূমি	নস্টক
জলাভূমি	অসিল্যেলেটোরিয়া, ফোর্মিডিয়াম, নস্টক, এনাবীনা
চিরাচরিত তৃণভূমি	নস্টক, অসিল্যেলেটোরিয়া, লিংগবিয়া, অলোসিরা, এনাবীনা, ফোর্মিডিয়াম
গুল্মময় প্রান্তর	নস্টক
নদীর বাঁক	অসিল্যেলেটোরিয়া, নস্টক, ফোর্মিডিয়াম
শিলাগাত্র	এনাবীনা, এনবিনোপসিস, ফোর্মিডিয়াম নস্টক, লিংগবিয়া, অসিল্যেলেটোরিয়া
লবণাক্ত শিলাতট	ক্যালোথ্রিক্স
বালিয়াড়ি	নস্টক, এনাবীনা, লিংগবিয়া, অসিলেটোরিয়া
লবণাক্ত জলাভূমি	ফোর্মিডিয়াম, অসিল্যেলেটোরিয়া, লিংগবিয়া, এনাবীনা, নস্টক, নডিউলেরিয়া, গ্লিওক্যাপসা

এইসকল জীবাণু প্রথমতঃ সৌরশক্তি থেকে কৃষিক্ষেত্রে সরবরাহের উপযোগী শক্তি সরবরাহ করেছে জৈব কার্বন সরবরাহের মাধ্যমে, দ্বিতীয়তঃ এরা নাইট্রোজেন বন্ধন করে জমির উর্বরাশক্তি বৃদ্ধি করছে। নাইট্রোজেন বন্ধনকারী কয়েকটি প্রজাতির নীলসবুজ শেওলা হল :

বর্গ	নাইট্রোজেন বন্ধনক্ষম প্রজাতি
বর্গ—ক্রুকোক্কেলস *Chroococcales*	ক্লোরোগ্লিয়া ফ্রিটসি *Chloroglea fritschii*
বর্গ—নস্টকেলস *Nostocales*	এনাবীনা এম্বিগুয়া *Anabaena ambigua*
শ্রেণী নস্টকেসি *Nostocaceae*	এ. সিলিড্রিকা *A. Cylindrica*
	এ. ফার্টিলিসিমা *A. fertilisima*
	এ. ফ্লুমিকোলা *A. flumicola*
	এ. ন্যাভিকুলয়েডস *A. naviculoides*
	এ. ভ্যারিএবিলিস *A. variabilis*
	এ. এজোলি *A. azollae*
	এনবিনপসিস সার্কুলারিস *Anabaenopsis circularis*
	সিলিড্রোস্পার্মাম ম্যাজাস *Cylindrospermum majus*
	সি. লাইকেনিফর্মি *C. licheniforme*
	সি. স্ফেরিকা *C. sphaerica*

নস্টক কমিউন
Nostoc commune

ন. পাংটিফর্মি
N. punctiforme

ন. মাস্কোরাম
N. mascorum

এই শেওলাগুলিকে কৃষিক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে গেলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর গুরুত্ব দিতে হবে—

(১) জীবাণুগুলির বৃদ্ধির হার এবং তাদের শারীর বৃত্তীয় (Physiological) অবস্থা।

(২) জীবাণু স্ট্রেনগুলির (strain) জমিতে সহনশীলতা (adaptability) এবং উচ্চ নাইট্রোজেন বন্ধন ক্ষমতা।

(৩) স্ট্রেনগুলির অন্য জীবাণুর সঙ্গে প্রতিযোগিতার ক্ষমতা।

(৪) জীবাণুগুলির প্রকৃতি এবং তাদের কোষের বাইরে পরিত্যক্ত (extracellular) পদার্থের ধর্ম।

(৫) এদের বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদন সম্ভাবনা।

(৬) জমিতে এদের প্রয়োগ সমস্যা এবং

(৭) বিশেষ করে জলমগ্ন ধান জমিতে এদের সাফল্য লাভের ক্ষমতা।

নাইট্রোজেন বন্ধনকারী নীলসবুজ শেওলারা সাধারণতঃ স্বভোজী এবং এরা সূর্য্যালোক থেকে শক্তি সংগ্রহ করে (Photo autotroph)। কিন্তু **নস্টক, পাংটিফর্মির** ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম দেখা যায়। এরা ব্যাক্টিরিয়ার মত মৃতজীবী হলেও নাইট্রোজেন বন্ধনে সক্ষম। সাধারণতঃ নীলসবুজ শেওলা বায়ুমণ্ডলীয় নাইট্রোজেন ছাড়াও, নানারকমের উৎস থেকে নাইট্রোজেন গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু সহজলভ্য নাইট্রোজেনের যোগান থাকলে নাইট্রোজেন বন্ধনের প্রবণতা হ্রাস পায়। পর্যাপ্ত অ্যামোনিয়াম লবণ সরাসরি সরবরাহ করলে নীলসবুজ শেওলার নাইট্রোজেন বন্ধন সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায়। মাটির pH প্রশম বা অতি অল্পমাত্রায় ক্ষারধর্মী হলে তা নাইট্রোজেন বন্ধনের উপযুক্ত পরিবেশ বলে বিবেচিত হয়। যেহেতু জলে ডোবা ধান জমি (submerged rice field) আম্লিকই হোক বা ক্ষারধর্মীই হোক জলমগ্ন অবস্থায় তার অম্লত্ব বা ক্ষারত্বের মাত্রা

কমে প্রায় প্রশম অবস্থায় পৌঁছায়, তাই জলমগ্ন ধানজমিতে সবসময়ই নীল-সবুজ শেওলার সক্রিয় থাকার পরিবেশ বজায় থাকে। ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম, বেরিয়াম, কোবাল্ট ইত্যাদি ধাতব মৌল নীলসবুজ শেওলার নাইট্রোজেন বন্ধনের সময় প্রয়োজন হয়ে থাকে। এছাড়া, মলিবডেনাম নাইট্রোজেন বন্ধনের ক্ষেত্রে অপরিহার্য মৌল হিসাবে বিবেচিত হয়। পরীক্ষায় দেখা গেছে নাইট্রোজেন বন্ধনকারী সক্রিয় উৎসেচক নাইট্রোজিনেসের (Nitrogenase) মধ্যে মলিবডেনাম বর্তমান। সাধারণতঃ এইসব স্বভোজী নাইট্রোজেন বন্ধনকারী জীবাণুর বৃদ্ধির জন্য কোন উদ্দীপক রাসায়নিক পদার্থ (growth promoting substance) বা হর্মোনের প্রয়োজন হয় না।

বিভিন্ন গণের (genus) নীলসবুজ শেওলার মধ্যে নাইট্রোজেন বন্ধন ক্ষমতার পার্থক্য থাকা স্বাভাবিক কিন্তু একই গণের বিভিন্ন প্রজাতির (species) মধ্যেও নাইট্রোজেন বন্ধন ক্ষমতার প্রচুর পার্থক্য দেখা যায়। এই পার্থক্য উৎস স্থানভেদে একই প্রজাতির মধ্যেও দেখা যায়। এর কারণ হল একই প্রজাতিভুক্ত হলেও এদের মধ্যে স্ট্রেনের পার্থক্য থাকে। এই পার্থক্যের কারণ প্রকৃতির বিভিন্ন স্থানে অভিযোজন বিভিন্ন হয়ে থাকে। বলা বাহুল্য নাইট্রোজেন বন্ধন ক্ষমতার পার্থক্যের মূল কারণ নিহিত থাকে জীনের মধ্যে (নীফ-Nif-জীন নাইট্রোজেন বন্ধনকারী জীন-Nitrogen fixing gene)। নীচে কয়েকটি পরীক্ষিত প্রজাতি এবং তাদের নাইট্রোজেন বন্ধন ক্ষমতার তালিকা দেওয়া হল :

তালিকা ২ : ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির নীলসবুজ শেওলার নাইট্রোজেন বন্ধন ক্ষমতা (সংগৃহীত)

শেওলা	পরীক্ষিত সময়মাত্রা (দিনে)	নাইট্রোজেন বন্ধনের পরিমাণ মিলিগ্রাম (প্রতি ১০০ মি.লি. পুষ্টি দ্রবণে)
এনাবীনা অরাইজি *Anabaena oryzae* (দে, ১৯৩৯)	৬০	৪.৪
এ. ভ্যারিএবিলিস *A, variabilis* (দে, ১৯৩৯)	৬০	৫.৭

শেওলা	পরীক্ষিত সময়মাত্রা (দিনে)	নাইট্রোজেন বন্ধনের পরিমাণ মিলিগ্রাম (প্রতি ১০০ মি.লি পুষ্টি দ্রবণে)
এ. ন্যাভিকুলয়েডস *A. naviculoides* (দে, ১৯৩৯)	৬০	৩·৭
এ. ফার্টিলিসিমা *A, fertilissima* (সিং, ১৯৪২)	৪৫	৬·৭
এ. এম্বিগুয়া *A. ambigua* (সিং, ১৯৪২)	৪৫	৫·৬
এ. এজোলি *A, azollae* (ভেঙ্কটরমন, ১৯৬০)	৩০	৩·৪৩
নস্টক প্রজাতি *Nostoc sp.* (ভেঙ্কটরমন, ১৯৬০)	৩০	২·২
সিলিণ্ড্রোস্পার্মাম স্ফেরিকা *Cylindrospermum spherica* (ভেঙ্কটরমন, ১৯৬৯)	৫৫	৩·৯২

অপর একটি তালিকা দ্বারা স্থানভেদে **নস্টক** প্রজাতির নীলসবুজ শেওলার নাইট্রোজেন বন্ধন ক্ষমতার পার্থক্য পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখানো হল।

কোন জমিতে বছরের পর বছর নীলসবুজ শেওলা জন্মাতে থাকলে সেই জমিতে ফলন বৃদ্ধি পেতে দেখা যায় এবং তার ফলশ্রুতি হিসাবে জমির উর্বরা শক্তিও বৃদ্ধি পেতে থাকে। মাটিতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি করা বা জমির উর্বরা শক্তি বৃদ্ধি করানোর জন্য জীবাণুকে কতকগুলি বিশেষ গুণের অধিকারী হতে হয়। প্রথমতঃ তাকে উচ্চ নাইট্রোজেন বন্ধন ক্ষমতা সম্পন্ন হতে হবে। দ্বিতীয়তঃ তার আবদ্ধ নাইট্রোজেনের অন্ততঃ একটা অংশকে সহজলভ্য নাইট্রোজেনজাত পণ্য হিসাবে তৎক্ষণাৎ মুক্ত করতে সক্ষম হতে হবে। এদের নাইট্রোজেন বন্ধন ক্ষমতা

তালিকা ৩ঃ ভিন্ন ভিন্ন স্থান থেকে সংগৃহীত নস্টক প্রজাতির নাইট্রোজেন বন্ধন ক্ষমতা (সংগৃহীত)

সংগ্রহের স্থান	পরীক্ষার সময়কাল (দিনে)	নাইট্রোজেন বন্ধনের পরিমাণ (মিলিগ্রাম)
চণ্ডিগড় পাঞ্জাব	৩০	১·৩ প্রতি ১০০ মিলি-লিটার পুষ্টিদ্রবণে
কলিকাতা পশ্চিমবঙ্গ	৩০	০·৯৬ ,,
ওখলা দিল্লী	৩০	১·০৯ ,,
গোপাল সমুদ্রম মাদ্রাজ	৩০	০·৯২ ,,

মাটির ধর্ম এবং গাছের রাইজোস্ফিয়ারের পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। সাধারণতঃ নীলসবুজ শেওলা যে নাইট্রোজেন বন্ধন করে তার প্রায় শতকরা ৫০ ভাগই তৎক্ষণাৎ মুক্ত হয়। ফলে গাছ তা গ্রহণ করতে পারে। লোহা বা পটাসিয়ামের অভাবে নীলসবুজ শেওলার বন্ধনকৃত নাইট্রোজেন তাদের কোষে প্রোটিন হিসাবে যুক্ত হতে পারে না, তাই লোহা বা পটাসিয়ামের অভাবে তা অজৈব লবণ হিসাবে কোষ থেকে নির্গত হয়। কিন্তু জমিতে নাইট্রেটের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে নীল-সবুজ শেওলা সেই নাইট্রোজেন গ্রহণ করে, ফলে নাইট্রোজেন বন্ধনের মাত্রা হ্রাস পায়। অর্থাৎ জমিতে নাইট্রেট পর্যায়ের লবণ প্রয়োগ করলে নীলসবুজ শেওলা নাইট্রোজেন জাত পদার্থ মুক্ত করবে না এটাই স্বাভাবিক। সাধারণতঃ জলে নিমগ্ন ধান জমিতে, মাটি ক্রমে ক্রমে বিজারিত অবস্থায় পৌছায়। তখন জমিতে নাইট্রেট লবণ থাকতে পারে না। ফলে জলমগ্ন জমিতে নাইট্রেট, নাইট্রোজেন বন্ধনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে না। কিন্তু পরিবেশ অত্যধিক বিজারিত অবস্থায় পৌছালে মাটি থেকে নাইট্রোজেনজাত পণ্য অ্যামোনিয়া হিসাবেও মুক্ত হতে পারে। নীলসবুজ শেওলা মুক্ত অ্যামোনিয়ার যোগান পেলে

নাইট্রোজেন বন্ধন সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দেয় তা আমরা জেনেছি। নীলসবুজ শেওলার কোষ থেকে মুক্ত অনাবশ্যকীয় পণ্যাদি নানাভাবে পরিবেশের উপর প্রভাব বিস্তার করে। নীলসবুজ শেওলা কোষের বাইরে জৈব পদার্থ বিশ্লেষণ উপযোগী উৎসেচক নির্গত করে অন্য জীবাণুদের সহায়তা করে। এ ছাড়া বিভিন্ন নির্গত পদার্থের মধ্যে চিলেট (chelate) উৎপন্নকারী যৌগ উৎপাদনের ক্ষমতাও লক্ষিত হয়। কিন্তু সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হল বহু নীলসবুজ শেওলারই নানাবিধ উদ্ভিদবৃদ্ধি উদ্দীপক রাসায়নিক পদার্থ উৎপাদনের ক্ষমতা প্রমাণিত হয়েছে। এইসব পদার্থের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন অক্সিন, ভিটামিন, অ্যামাইনো এ্যাসিড এবং পলিপেপটাইড জাতীয় নাইট্রোজেন ঘটিত যৌগ। কিছু কিছু নস্টক যথেষ্ট পরিমাণে মুক্ত এ্যামাইনো এ্যাসিড (free amino acid) মুক্ত করে, যেমন অ্যাসপারটিক এ্যাসিড (asparatic acid), গ্লুটামিক এ্যাসিড (glutamic acid), অ্যালানিন (alanine) ইত্যাদি। এ ছাড়া কমেলা নস্টক ভিটামিন-বি কমপ্লেক্স—থায়ামিন, রিবোফ্লেভিন, বায়োটিন, নিকোটিনিক এ্যাসিড, পেণ্টোথেনিক এ্যাসিড, ভিটামিন বি-১২ ইত্যাদি মুক্ত করে থাকে। নীলসবুজ শেওলার কোষ থেকে মুক্ত বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ বিভিন্ন জীবাণুকে তাদের সঙ্গে সজ্ববদ্ধভাবে (Symbiotically—একে অপরের পরিপূরক হিসাবে] বাস করতে সাহায্য করে। ছত্রাক, লিভার ওর্ট (liver wort); ফার্ন (fern) গুপ্তবীজী উদ্ভিদ (angiosperm), এদের তাই নীলসবুজ শেওলার সঙ্গে সহাবস্থানে দেখতে পাওয়া যায়। এ ধরনের সহাবস্থানে প্রায়ই নীলসবুজ শেওলা নাইট্রোজেনের সরবরাহ দেয় এবং অপর অংশীদার নীলসবুজ শেওলাকে বাইরের আক্রমণ থেকে রক্ষা করে। ক্যালোথ্রিক্স স্কোপালোরাম (Calothrix Scopulorum) লবণাক্ত জলে নাইট্রোজেন জাত পদার্থমুক্ত করে, যাকে আশ্রয় করে বিভিন্ন ছত্রাক, শেওলা বা ব্যাক্টিরিয়ারা বেঁচে থাকে। জলে ভাসমান অনেক উদ্ভিদই নীলসবুজ শেওলার মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। নালসবুজ শেওলা অনেক সময় জলে বিভিন্ন দূষিত ধাতব লবণ চিলেট গঠনের মাধ্যমে বা রোগ জীবাণু মুক্ত করার কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। বিশেষ করে কলিফর্ম জীবাণুর (Coli form) ক্ষেত্রে নীলসবুজ শেওলার ভূমিকা খুবই উৎসাহব্যঞ্জক। প্রকৃতি ও পরিবেশের উপর নীলসবুজ শেওলার কতটা আধিপত্য এ থেকে তা কিছুটা বোঝা যায়। কোন কোন কৃষিবিজ্ঞানীর মতে নীলসবুজ শেওলার কৃষি জমিতে সাফল্য শুধুমাত্র

নাইট্রোজেন বন্ধনের জন্য নয়। উদ্ভিদ বৃদ্ধি উদ্দীপক হর্মোনজাত পদার্থ উৎপাদন নীলসবুজ শেওলার ক্রিয়ামানকে বহুলাংশে বৃদ্ধি করে।

এইসব বিভিন্ন দিক বিচার করার পর উৎকৃষ্ট মানের জীবাণুকে জমিতে প্রয়োগ করার সম্ভাবনা সম্বন্ধে চিন্তা করা হয়। তবে অনেকেই মাটিতে নীলসবুজ শেওলা বাইরে থেকে প্রয়োগ না করে জমির স্থানীয় শেওলার ক্রিয়াকলাপ বৃদ্ধির অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির কথা চিন্তা করেন। এই চিন্তাধারার অবশ্য বিভিন্ন দিক আছে। কোন জমিতে বাইরে থেকে প্রযুক্ত কোন বিশেষ উচ্চ ক্ষমতাশালী জীবাণু প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হবেই এমন কথা প্রয়োগ করার পর পরীক্ষালব্ধ ফল বিশ্লেষণ না করে যেমন নিশ্চিত হওয়া যায় না, তেমনই পরিবর্তিত পরিবেশে শুধু বাঁচার জন্য তাদের যে সংগ্রাম করতে হয় তাতে সেই জীবাণুর নাইট্রোজেন বন্ধন বা উপকারী অন্য শক্তি প্রয়োগের কতটুকু ক্ষমতা সে প্রদর্শন করতে পারবে সে সম্বন্ধেও যথেষ্ট সন্দেহ থেকে যায়। অন্য দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলা যায় কোন বিশেষ জমিতে উচ্চমানের জীবাণু নাও থাকতে পারে। শুধুমাত্র কোন এক বিশেষ শ্রেণীর জীবাণুর উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি পরীক্ষাগারে যত সহজে করা সম্ভব, জমিতে তা ততটা সহজে সম্ভব হয় না, এ ব্যাপারে সব বিজ্ঞানীরাই একমত। পক্ষান্তরে শেওলার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা হলে (কৃত্রিম উপায়ে) স্বাভাবিক কারণেই নীলসবুজ শেওলাকে বেশী করে নাইট্রোজেন বন্ধন ক্ষমতাহীন সবুজ বা অন্যান্য শ্রেণীর শেওলার সঙ্গে প্রতিযোগীতা করতে হবে। কারণ বংশবৃদ্ধির সুযোগ পেয়ে তারা মাটি থেকে মুক্ত বা বাইরে থেকে প্রযুক্ত সারের সহজলভ্য মৌলিক উপাদানের উপর বেশী করে ভাগ বসাবে। এর ফলে হয়ত গাছকে আরও তীব্র সংকটের সম্মুখীন হতে হবে। ব্যাক্টিরিয়ার বংশবৃদ্ধি করতে যেমন জৈবসারের প্রয়োজন নীলসবুজ শেওলার উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য জমিতে তেমন জৈবসার প্রয়োগ করতে হয় না। বরং নীলসবুজ শেওলা মারা গেলে এরাই জমিতে সবুজ সারের কাজ করে থাকে। তাই উপযুক্ত পরিমাণে উচ্চ ক্ষমতাশালী নীলসবুজ শেওলা সার জমিতে প্রয়োগ করলে তার নাইট্রোজেন বন্ধন ও কার্বনজাত যৌগ সরবরাহ ছাড়াও হর্মোন উৎপাদন ও অন্যান্য ক্ষমতা উদ্ভিদের ফলন বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই।

নীলসবুজ শেওলাকে জমিতে প্রয়োগের আগে দুটি ক্ষেত্রে অবশ্যই গুরুত্ব দিতে

হবে। প্রথমতঃ উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে জীবাণু সার হিসাবে প্রয়োগের উপযোগী প্রজাতিকে উৎপাদন করা এবং ঐ জীবাণুকে কার্যকর অবস্থায় প্রয়োগের আগে পর্যন্ত সংরক্ষণ।

সাধারণতঃ নীলসবুজ শেওলা চাষের জন্য যেসব পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া হয় তার মধ্যে অন্যতম হল কাঁচের জানালাযুক্ত প্রকোষ্ঠ পদ্ধতি। এই বিশেষ প্রকোষ্ঠের বৈশিষ্ট্য হল শেওলার চাষের জন্য প্রয়োজনীয় আলো সরবরাহের পথ হিসাবে ঐ কাঁচের জানালার ব্যবহার। প্রকোষ্ঠটি মাঝে মাঝে আলোড়ন করা হয়, উদ্দেশ্য হল নীলসবুজ শেওলার উৎপাদন বৃদ্ধি। অন্য এক পদ্ধতিতে পলিভিনাইলের বদ্ধ গোল টিউব ব্যবহার করা হয়। টিউবটি আলোক স্বচ্ছ তাই ভিতরে স্বচ্ছন্দে শেওলা জন্মাতে পারে। এর চেয়ে সুবিধাজনক পদ্ধতি হল সূক্ষ্ম সচ্ছিদ্র অগ্নিশীলার উপর শেওলার চাষ। এরজন্য শিলার উপরের স্তর ভিজা থাকার দরকার। এর উপরই নীলসবুজ শেওলার একটা আস্তরণ জন্মায়। এ ছাড়াও উন্নততর পদ্ধতিতে চাষ করে অধিকতর শেওলার সরবরাহ পাওয়া যায়। জাপানে বিজ্ঞানী ওয়াতানাবে মুক্ত পদ্ধতিতে বৎসরে ৭ টন শেওলা উৎপন্ন করার পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন। এই পরিমাণ শেওলাকে প্রায় ৩০০ হেক্টর ধান জমিতে প্রয়োগ করা চলে। ওয়াতানাবের ভিজা অগ্নিশিলার উপর নীলসবুজ শেওলার চাষ পদ্ধতি অনেক ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে। এই পদ্ধতিতে শেওলার সক্রিয় বৃদ্ধির জন্য অনবরত বুদ্বুদাকারে বাতাস চালানো হয়। গলিত ম্যাগনেসিয়াম ফসফেটকে শেওলা চাষের জন্য প্রয়োগ করা হয় এবং সেই ম্যাগনেসিয়াম ফসফেটের [$Mg_3(PO_4)_2$] অবশিষ্টাংশ জমিতে সার হিসাবে কাজে লাগে।

১৯৬১ সালে ভেঙ্কটরমন নীলসবুজ শেওলা সংরক্ষণের একটা নূতন পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। এই পদ্ধতিতে ভালোভাবে ধোয়া বালি ধারক হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এই বালিকে নাইট্রোজেনহীন শেওলার পুষ্টি মাধ্যমে ভিজিয়ে নির্বীজ (sterilised) করা হয়। এই বালিতে তারপর উপযুক্ত পরিমাণে নীলসবুজ শেওলার প্রলম্বন দিয়ে রোদে শুকানো হয়। এই শুষ্ক পরিচ্ছন্ন বালিতে নীলসবুজ শেওলার জীবনীশক্তি বহুদিন বজায় থাকে। এইভাবে শেওলা রাখাও সহজ এবং তাতে খরচাও কম পড়ে। এই পদ্ধতিকে আরো সহজলভ্য এবং সস্তা করার জন্য প্রয়োগ জমির নিকটবর্তী স্থানে বড় বড় পাত্রে নীলসবুজ শেওলা চাষ করা

হয়। এই পদ্ধতিতে ২ মিটার × ১ মিটার টিনের পাত্রে প্রায় পাঁচ সেমি পুরু মাটির উপর জল জমানো হয়। মাটির বদলে বালিও ব্যবহার করা যেতে পারে। নীলসবুজ শেওলা বীজায়ন (seeding) করার আগে পাত্রে ২৫০ গ্রাম সুপার ফসফেট ও মাটিভেদে পরিমাণমত চুন ছড়ানো হয়। চুনের উপস্থিতিতে শেওলায় বৃদ্ধি ভাল হয়। উপযুক্ত পরিমাণে প্রয়োজনীয় শেওলা প্রয়োগের পর পাত্রগুলিকে আলোতে রাখা হয়। সম্পূর্ণভাবে শেওলার একটা পুরু আস্তরণ তৈরি হলে তাকে শুকিয়ে ফেলা হয়। শেওলার পিচ্ছিল স্তর ফেটে গেলে তাকে সংগ্রহ করে পলিথিন প্যাকেটে প্যাক করা হয় বা সরাসরি জমিতে প্রয়োগ করা হয়। শেষোক্ত পদ্ধতির সবচেয়ে সুবিধা হল এই পদ্ধতিতেই শেওলার উৎপাদন সবচেয়ে বেশী পাওয়া সম্ভব। এই পদ্ধতি কৃষিজীবীরা নিজেই চালাতে পারেন। বিশেষ করে মাটিতে জন্মানো হলে (টিনের ট্রের পরিবর্তে) জীবাণুটি উক্ত মাটিতে অভিযোজনের প্রথম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বলে ধরা যেতে পারে।

ভারতের ধান জমিকে মুখ্যতঃ তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়; প্রথমতঃ জলমগ্ন দশা—চারা বোনার পর থেকে ফসল কাটার আগে পর্যন্ত (অবশ্য ফসল কাটার পূর্বেই জমি শুকিয়ে আসে), দ্বিতীয়তঃ ফসল কাটার পর জমির শুষ্ক দশা এবং তৃতীয়তঃ এরপর মাটির নিরুদন দশা যখন তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে জমি ফুটিফাটা হয়ে যায়। এই অবস্থায় মাটির তাপমাত্রা ৫০° সেন্টিগ্রেড ছাড়িয়ে যায়। আমাদের পূর্ব আলোচনার জ্ঞান থেকেই এটা স্পষ্ট বোঝা যায় যে মাটি শুকিয়ে গেলে তখন নীলসবুজ শেওলার ক্রিয়া উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমে যেতে বাধ্য। তাই জলমগ্ন ধান জমিই হল নীলসবুজ শেওলার সক্রিয় থাকার সবচেয়ে উপযুক্ত সময়। একটা হিসাবে দেখা গেছে প্রতি বৎসর পৃথিবীতে নীলসবুজ শেওলা প্রায় ৯২০ লক্ষ মেট্রিক টন নাইট্রোজেন বন্ধন করে এবং তার মধ্যে প্রায় ৮৩০ লক্ষ মেট্রিক টন নাইট্রোজেন ডিনাইট্রিফিকেসনের দ্বারা নষ্ট হয়ে যায়। এই বাকি ৯০ লক্ষ মেট্রিক টন নাইট্রোজেন উদ্ভিদ গ্রহণ করে বা মাটিতে অবশিষ্ট থাকে। একটা হিসাব অনুযায়ী বিহারে গড়ে প্রায় প্রতি হেক্টরে ১৫ কেজি নাইট্রোজেন আবদ্ধ হয়।

জমিতে নীলসবুজ শেওলা সার হিসাবে প্রযুক্ত হলে তার প্রতিদান

প্রথম বৎসরে তেমন পাওয়া যায় না, যদিও দ্বিতীয়, তৃতীয় বৎসরে অধিক পরিমাণে ফলনবৃদ্ধি হতে দেখা যায়। প্রতি বৎসর শেওলা প্রয়োগ করে গেলে ধান জমির উর্বরা শক্তি বৃদ্ধি পাবেই। ফসলহীন জমির তুলনায়, নীলসবুজ শেওলা দ্বারা নাইট্রোজেন বন্ধনের পরিমাণ ফসলী জমিতে বেশী হবার একটা কারণ হল ধানগাছের মূল দ্বারা সরবরাহ কৃত প্রচুর কার্বন-ডাই-অক্সাইড। এ ছাড়া জমিতে জৈবসার দেওয়া থাকলে জলমগ্ন ধান জমিতে মাটির জীবাণুর ক্রিয়ায় প্রচুর কার্বন-ডাই-অক্সাইড মুক্ত হয়। মাটিতে ফসফরাসের সরবরাহ পর্যাপ্ত থাকলে নীলসবুজ শেওলার নাইট্রোজেন বন্ধন ক্ষমতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। ফসফেট সার হিসাবে সুপার ফসফেট, পটাসিয়াম ফসফেট এমন কি ক্যালসিয়াম ফসফেট (অদ্রবণীয়) প্রযুক্ত হলেও নাইট্রোজেন বন্ধনের পরিমাণ যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। সুপার ফসফেট প্রয়োগে হেক্টর প্রতি ৫০ কেজি নাইট্রোজেন বন্ধন হতেও দেখা গেছে। জমিতে পটাসিয়াম বা ম্যাগনেসিয়াম সালফেট পৃথকভাবে প্রয়োগের ফলে নাইট্রোজেন বন্ধনের মাত্রা হ্রাস পায় বটে কিন্তু উভয়ের যৌথ প্রয়োগের ফলে নাইট্রোজেন বন্ধনের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। তাই নীলসবুজ শেওলা দ্বারা নাইট্রোজেন বন্ধনের জন্য ফসফেট, ক্যালসিয়াম ও মলিবডেনামকে অপরিহার্য বলে চিহ্নিত করা হয়। বিভিন্ন পরীক্ষায় অলোসিরা, ফার্টিলিসিমা, টলিপোথ্রিক্স টেনিয়াস, নস্টক মাস্কোরাম ইত্যাদি নীলসবুজ শেওলার প্রয়োগে অধিক ফলন পাওয়া গেছে। হেক্টর প্রতি জমিতে ২-১০ কেজি (শুষ্ক ওজন) উন্নত মানের নীলসবুজ শেওলা প্রয়োগের ফলে ফলনের যথেষ্ট উন্নতি লক্ষিত হয়। নীলসবুজ শেওলা অতিরিক্ত অম্লত্ব সহ্য করতে পারে না তাই অম্লজমিতে চুন প্রয়োগ করলে শেওলার ক্রিয়া ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। এর সঙ্গে সামান্য পরিমাণে সোডিয়াম হেপ্টা-মলিবডেট (০·২৫ কেজি প্রতি হেক্টরে) প্রয়োগ করা হলে ফলন বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। সাধারণতঃ উপযুক্ত পরিবেশে শুধুমাত্র নীলসবুজ শেওলা প্রয়োগের ফল হিসাবেই ১০-১৫ শতাংশ দানাশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। আমাদের দেশে যেখানে গরীব কৃষকরা অর্থাভাবে বা সরবরাহের অপ্রতুলতার জন্য রাসায়নিক সার (ইউরিয়া, অ্যামোনিয়াম সালফেট ইত্যাদি নাইট্রোজেন ঘটিত সার) ব্যবহার করতে পারেন না, তাঁরা নিঃসন্দেহে জমিতে নীলসবুজ শেওলা সার প্রয়োগ করে সুফল পেতে পারেন।

রাইজোবিয়ামের মত নীলসবুজ শেওলাও ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হয়। এদের বলে সায়ানোফাজ। এখানে এটা উল্লেখের প্রয়োজন যে অবিন্যস্ত নিউক্লিয়াস-যুক্ত জীবাণুকে আক্রমণকারী বিশেষ ডি. এন. এ. যুক্ত ভাইরাসকে ফাজ আখ্যা দেওয়া হয়। তাই একই প্রজাতির নীলসবুজ শেওলা সার একই জমিতে দীর্ঘকাল ব্যবহার করলে, তা ফাজ কবলিত হতে পারে। তখন ঐ নীলসবুজ শেওলা সার প্রয়োগ করে আশানুরূপ ফল পাওয়া যাবে না। এই অবস্থায় অন্য নীলসবুজ শেওলা ব্যবহার করাই নিরাপত্তামূলক বিধি।

যদিও নীলসবুজ শেওলা, কোন শক্তিশালী নাইট্রোজেন বন্ধনক্ষম শ্রেণী বা প্রজাতি নয়, তবু শক্তি সংকটের দিনে নীলসবুজ শেওলা অনেকাংশে শক্তির অপচয় রোধ করতে পারে। নীচে কয়েকটি সাধারণ নীলসবুজ শেওলার ফাজের নামের তালিকা দেখানো হল।

তালিকা ৪ : নীলসবুজ শেওলার ফাজ

(ভেঙ্কটরমন এবং সহকর্মীবৃন্দ ; ১৯৭৪)

ফাজের নাম	অনুপোষক নীলসবুজ শেওলা
LPP—1	লিংগবিয়া, প্লেক্টোনেমা, ফোরমিডিয়াম
SM—1	মাইক্রোসিস্টিস অরিগিনোসা
A—1	এনাবীনা সিলিণ্ড্রিকা
A—2	এনাবীনা ভ্যারিএবিলিস
N—1	নস্টক মাস্কোরাম
AS—1	এনাসিস্টিস নিডুল্যান্স
AC—1	এনাসিস্টিস নিডুল্যান্স ক্রকোক্কাস মাইনর
TAuHN—1	টলিপোথ্রিক্স টেনিয়াস অলোসিরা ফার্টিলিসিমা নস্টক মাস্কোরাম

এজোলা

নীলসবুজ শেওলা সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা জেনেছি এরা বিভিন্নপ্রকার জীবাণুর সঙ্গে সহাবস্থানে থেকেও নাইট্রোজেন বন্ধনে সক্ষম। এরকম একধরনের জলজ ফার্ন হল এজোলা যারা নীলসবুজ শেওলার সঙ্গে যুগ্মভাবে নাইট্রোজেন বন্ধন করতে পারে। এজোলা জলাভূমিতে ভেসে বিচরণ করে। **এনাবীনা এজোলিকে** (*Anabeana azollae*) নাইট্রোজেন বন্ধনকারী হিসাবে পাতার পৃষ্ঠদেশের (dorsal) গর্তে দেখা যায়। এজোলার দ্রুত বংশবৃদ্ধি ক্ষমতার জন্য এরা জমিতে একাধারে সবুজসার ও নাইট্রোজেন ঘটিত জৈবসার হিসাবে ক্রিয়া করতে পারে। সাধারণতঃ অপেক্ষাকৃত দরিদ্র এবং উন্নতিশীল দেশগুলিতে নাইট্রোজেন ঘটিত জৈবসার হিসাবে এজোলা ব্যবহারের প্রচলন দেখা যায়। ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যাণ্ড, চীন এবং ভারতবর্ষে এর প্রয়োগ ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এজোলা খুব দ্রুত বংশ বিস্তার করে বলে এদের উৎপাদন করা সহজ। এই জাতীয় উদ্ভিদের দেহে শুষ্ক ওজন হিসাবে ৪-৫ শতাংশ (টাটকা গাছে ০·২-০·৩ শতাংশ) নাইট্রোজেন থাকে। আমাদের দেশে কটকের কেন্দ্রীয় চাল গবেষণা কেন্দ্রে (CRRI) প্রায় বৎসরের সব সময়ই এজোলা উৎপাদন করা হচ্ছে। এখানে বিভিন্ন পদ্ধতিতে সারা বৎসরে প্রায় হেক্টর প্রতি ৬৫০ টন এজোলা উৎপাদন করা হয় এবং তা থেকে প্রায় হেক্টর প্রতি ৮৪০ কিগ্রা· নাইট্রোজেন পাওয়া যায়। এজোলা উৎপাদনের ক্ষেত্রে ফসফরাস সার হিসাবে প্রয়োগ করা অপরিহার্য। হেক্টর প্রতি মাত্র ৪-৬ কিগ্রা· P_2O_5 সুপার ফসফেট হিসাবে প্রয়োগ করলে ফলন যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। পটাস প্রয়োগে সরাসরি ফলনের উপর তেমন প্রতিক্রিয়া লক্ষিত হয় না বটে, তবু প্রথানুযায়ী হেক্টর প্রতি ৫-৮ কিগ্রা· K_2O, মিউরেট অব পটাস বা পটাসিয়াম সালফেট হিসাবে প্রয়োগের ফলে এজোলার উৎপাদন বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয়। জমিতে প্রারম্ভিক নাইট্রোজেনের চাহিদা মেটানোর জন্য অল্প পরিমাণে অ্যামোনিয়াম সালফেট নির্ধারিত পরিমাণ সুপার ফসফেটের সঙ্গে মিশিয়ে প্রয়োগ করা হয়। এছাড়া মাটির তাপমাত্রা ও মাটির pH-এর উপর এজোলার ফলন বহুলাংশে নির্ভরশীল। সাধারণতঃ তাপমাত্রা ১৫-৩০° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে থাকলে এজোলা খুব ভালো জন্মায়। দিনের তাপমাত্রা ৪০° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এবং রাতের তাপমাত্রা ৩২° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে পৌঁছালে এজোলার বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়। এজোলা

সাধারণতঃ অল্প অম্লত্ব থেকে অল্প ক্ষারত্বের জমি পছন্দ করে। ৬ থেকে ৮-এর মধ্যে এজোলা ভালোভাবে জন্মায়। জমির pH ৪-এর নীচে বা ৮.২-এর উপরে গেলে এজোলার বংশবৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়। এছাড়া এজোলা জলজ পতঙ্গের শুককীট বা লার্ভা দ্বারা অতি সহজেই আক্রান্ত হয়। তাই এই ক্ষয়রোধের জন্য হেক্টর প্রতি ২-৩ কিগ্রা. ফিউরাডান জমিতে প্রয়োগ করা হয়। এই কীটনাশক জমিতে ফসলের কোন ক্ষতি করে না। এজোলা শুষ্ক অবস্থায় নীলসবুজ শেওলার মত বেঁচে থাকতে পারে না। তাই পুনর্বার চাষের জন্য এদের সবুজ অবস্থাতেই প্রয়োগ করতে হয়। এদের একটা সুবিধা হল জমিতে সবুজসারের মত মিশিয়ে দিলে ৭-১০ দিনের মধ্যেই এরা বিবর্তিত হয়ে উদ্ভিদের গ্রহণোপোযোগী পর্যায়ের নাইট্রোজেন মুক্ত করতে পারে। একই জমিতে বার বার এজোলা চাষ করা চলে বলে এদের দেহে নাইট্রোজেনের পরিমাণ কম থাকা সত্ত্বেও কৃষি জমিতে, বিশেষ করে জলমগ্ন ধান জমিতে এরা পর্যাপ্ত নাইট্রোজেন সরবরাহ করতে পারে। এজোলা বা অন্যান্য সবুজ জলজ আগাছা যেমন কচুরিপানা (Water hyacinth), হাইড্রিলা (Hydrilla), লেমা (Lemna) ইত্যাদি রাসায়নিক উপাদানের দিক থেকে আলফা আলফার সমতুল। এজোলার একটা রাসায়নিক বিশ্লেষণের তালিকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেওয়া হল :

এজোলা প্রয়োগ পদ্ধতি

উৎপাদন পদ্ধতি এজোলা প্রয়োগের পূর্বেই জমিতে লাঙল দিয়ে প্লটগুলিতে বাঁধ দিতে হয়। এরপর জমিতে অন্ততঃ ৫ থেকে ১০ সেমি. জল দাঁড় করিয়ে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। জলের উচ্চতা ৩০ সেমি. পর্যন্ত হলেও কোন ক্ষতি হয় না। জলমগ্ন জমিতে প্রতি বর্গমিটারে হিসাব করে ০.২-০.৪ কিগ্রা. সবুজ এজোলা ছড়িয়ে দিতে হবে। এছাড়া জমিতে হেক্টর প্রতি ৪-১০ কিগ্রা. P_2O_5 সুপার ফসফেট হিসাবে প্রয়োগ করা হয়। পোকার হাত থেকে রক্ষা পেতে প্রয়োজনে হেক্টর প্রতি ০.১-১.০ কিগ্রা ফিউরাডান প্রয়োগ করা উচিত। এরপর সপ্তাহান্তে একটা বাঁশের সাহায্যে সবুজ এজোলা সংগ্রহ করে পদ্ধতিটি পুনরায় একইভাবে অনুসরণ করা যেতে পারে।

প্রয়োগ : জমিতে সবুজসার হিসাবে প্রয়োগের জন্য চাষের আগেই হেক্টর প্রতি ২ কুইন্টল হারে এজোলা প্রয়োগ করে দুই সপ্তাহ পরে তা চাষ করে

তালিকা ৫ঃ এজোলার রাসায়নিক বিশ্লেষণ ফল
(সিং এবং সুবুধি ; ১৯৭৮)

উপাদান	শতাংশ—শুষ্ক ওজন হিসাবে
ছাই	১০·৫
অশোধিত স্নেহজ পদার্থ	৩·৩—৩·৬
অশোধিত প্রোটিন	২৪—৩০
নাইট্রোজেন	৪—৫
ফসফরাস	০·৫—০·৯
ক্যালসিয়াম	০·৪—১·০
পটাসিয়াম	২·৪—২·৫
ম্যাগনেসিয়াম	০·৫—০·৬৫
ম্যাঙ্গানীজ	০·১১—০·১৬
লোহা	০·০৬—০·২৬
দ্রবণীয় শর্করা	৩·৫
অশোধিত তন্তু	৯·১
স্টার্চ	৬·৫৪
ক্লোরোফিল	০·৩৪—০·৫৫

মাটিতে মিশিয়ে দিতে হবে। প্রধানতঃ জমিতে হেক্টর প্রতি ৫০০-১০০০ কিগ্রা. এজোলা প্রয়োগকরণই বিধিসম্মত। এই পদ্ধতি দুইবার পুনরাবৃত্তি করলে জমিতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ যথেষ্ট বেশী হতে পারে। সাধারণতঃ একস্তর সবুজসার হিসাবে হেক্টর প্রতি ১ কুইণ্টল এজোলা, ২৫-৩০ কিগ্রা. নাইট্রোজেন সরবরাহ করে। হেক্টর প্রতি ১ কিগ্রা. এজোলার সঙ্গে হেক্টর প্রতি ৩০ কিগ্রা. নাইট্রোজেন অ্যামোনিয়াম সালফেট হিসাবে প্রয়োগের ফলে মাটির নাইট্রোজেন বন্ধন ক্ষমতা বৃদ্ধি পেতে দেখা গেছে। স্পষ্টতঃই বোঝা যায় এর ফলে ফলনও যথেষ্ট বৃদ্ধি পাবে। ধান জমিতে এজোলার সঙ্গে দুই কিস্তিতে সুপার ফসফেট প্রয়োগের ফলে ফলন আরো ভালো হয়। জলে ভাসমান এজোলা অবাঞ্ছিত

আগাছা জন্মাতে দেয় না। সাধারণতঃ উচ্চ ফলনশীল ধানের ক্ষেত্রে কমদিনে পাকে এমন গাছে এজোলাকে বেশী সুফল দিতে দেখা গেছে।

এজোলার উৎপাদন সমন্বিত তালিকা বিশ্লেষণ করে আমরা জেনেছি, এজোলা পশুখাদ্য হিসাবে যথেষ্ট উঁচুমানের। পোলট্রিতে বিশেষ করে হাঁস বা মুরগির খাদ্য হিসাবে এজোলা পরীক্ষামূলক স্তরে উত্তীর্ণ হয়েছে। পাখীরা শুকানো লাল এজোলা পছন্দ করে না, তবে তাদের খাবারের সঙ্গে সবুজ এজোলা থাকলে তারা তা সানন্দে গ্রহণ করে। এতে পাখির ওজন বৃদ্ধি পায় এবং প্রোটিনের পরিমাণও বাড়ে। মূল্য তালিকা হিসাবে এজোলা সস্তা কারণ এদের সহজে উৎপাদন করা সম্ভব। নীচে এবং পরবর্তী পৃষ্ঠায় এজোলা প্রয়োগের ফলে রবি মরশুমে আই-আর-৮, সুপ্রিয় এবং কলিঙ্গ ধানের ফলন তালিকা দেখানো হল।

তালিকা ৬ঃ এজোলা প্রয়োগে শস্যের ফলন প্রতিক্রিয়া (সিং, ১৯৭৭)

প্রযুক্ত এজোলার পরিমাণ	দানা উৎপাদন কিগ্রা. প্রতি হেক্টরে	খড় উৎপাদন কিগ্রা. প্রতি হেক্টরে
	আই আর-৮	
নিয়ন্ত্রিত	৪৭২২	৩৬০৭
হেক্টর প্রতি ১০ টন	৫৯১৮	৪৬৪৩
	সুপ্রিয়	
নিয়ন্ত্রিত	৩৪৮৯	২৫৭১
হেক্টর প্রতি ১০ টন	৫১২৫	৩৭৮৬
	কলিঙ্গ	
নিয়ন্ত্রিত	১৭২২	১৩২৫
হেক্টর প্রতি ১০ টন	২৪২৩	২০৮৭
হেক্টর প্রতি ২০ টন	২৬২৩	২৫৮৭

প্রযুক্ত এজোলার পরিমাণ	দানা উৎপাদন কিগ্রা. প্রতি হেক্টরে	খড় উৎপাদন কিগ্রা. প্রতি হেক্টরে
হেক্টর প্রতি	২২০৮	২১০০
২০ কিগ্রা. নাইট্রোজেন হেক্টর প্রতি	৩১৮৭	৩৪৩৭
৪০ কিগ্রা. নাইট্রোজেন হেক্টর প্রতি	৩৫১৮	৩৭৩৭
৬০ কিগ্রা. নাইট্রোজেন হেক্টর প্রতি	৩৮৯৪	৪৬৫০
৮০ কিগ্রা. নাইট্রোজেন হেক্টর প্রতি ৩০ কিগ্রা নাইট্রোজেন + ১০ টন এজোলা	৩৪৬১	২৮৩৭
হেক্টর প্রতি ৫০ কিগ্রা. নাইট্রোজেন + ১০ টন এজোলা	৩৫৭৬	৩০৩২

পরীক্ষালব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতে আশা করা যায় এজোলা নিঃসন্দেহে উন্নত ধানের জৈবসার হিসাবে সাফল্যলাভ করবে।

জীবাণুসার হিসাবে মুক্তজীবী নাইট্রোজেন বন্ধনকারী জীবাণু

৯

আমরা এমন একটা গ্যাসীয় সমুদ্রে বাস করি যেখানে নাইট্রোজেনই হল তার প্রধান উপাদান। আর এই নাইট্রোজেনের হাতেই রয়েছে জীবজগতের মূল চাবিকাঠি। নাইট্রোজেন ছাড়া কোষ গঠন হয় না। আমাদের খাদ্যে আজ যে বস্তুর অভাব সবচেয়ে বেশী, তা হল একটা অতি প্রয়োজনীয় নাইট্রোজেন ঘটিত জৈব পদার্থ প্রোটিন। গাছের যে নাইট্রোজেন প্রয়োজন তা অবশ্য প্রোটিন দিয়ে মেটে না। তার কারণ **গাছ হল স্বভোজী। তাই গাছ কোনরকম জৈব কার্বনজাত বস্তুকে তাদের খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করতে পারে না।** নাইট্রোজেনের অভাবে গাছের পাতা হলুদ হয়ে আসে এবং ক্রমে ক্রমে তারা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে, এ দৃশ্য আমাদের পরিচিত। তাই নাইট্রোজেনের অভাবে ভুগছে এমন জমিতে নাইট্রোজেন ঘটিত সার প্রয়োগের ফলে সুফল পাওয়া যাবে তা স্বাভাবিক ঘটনা। বিশেষ করে ধানের চারাগাছ যখন নূতন জমিতে রোয়া করা হয়, তখন শিশু চারাগাছগুলো নাইট্রোজেনের অভাবে বিবর্ণ, হলুদ হয়ে পড়ে। তারপর সেই জমিতে কোন নাইট্রোজেন ঘটিত সার প্রয়োগ করলে এক রাতের মধ্যেই তাদের চেহারা পাল্টে যায়। পরদিন সকালে তাজা সবুজ শিশু উদ্ভিদগুলি যখন মৃদুমন্দ বাতাসের সঙ্গে খেলা করে তখন তাদের আর চেনাই যায় না। অর্থাৎ নাইট্রোজেন, উদ্ভিদের ক্ষেত্রে যে কতটা অপরিহার্য তা বলার আর অবকাশ রাখে না। বিভিন্ন প্রাণী এবং মানুষের মধ্যেও নাইট্রোজেনের অভাব ঘটলে দেহ দুর্বল ও নানাবিধ রোগের আকর হয়ে পড়ে।

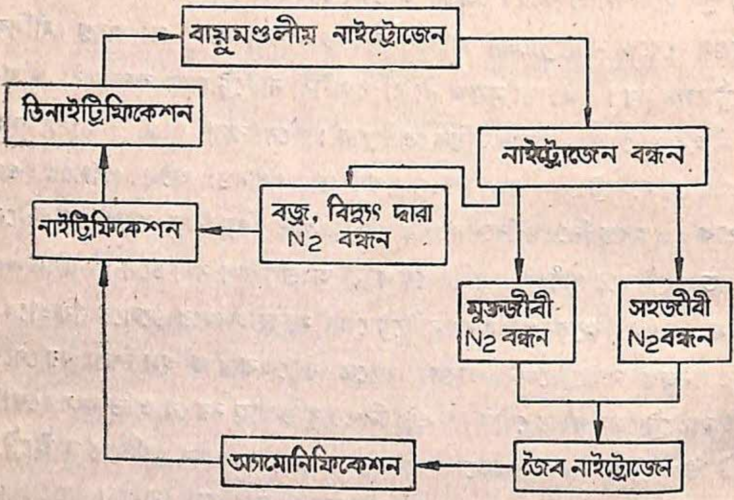
গাছ আমাদের প্রাণপ্রতিম এ মতে রায় দিতে আমরা দ্বিধাগ্রস্থ নই। কিন্তু তার অন্তরালে আর একশ্রেণীর ছোট উদ্ভিদ অনবরত আমাদের জন্য নিঃশব্দে নীরবে কাজ করে যাচ্ছে, যাদের আমরা চিরকাল অপকারী-ই ভেবে এসেছি। আসুন এবার আমরা তাদের কিছুটা মুল্যায়নের চেষ্টা করি।

গাছ নাইট্রোজেন পায় মূলতঃ মাটি থেকে। বায়ুমণ্ডলের অসীমভাণ্ডার থেকে এ সম্পদ আহরণের ক্ষেত্রে সেও প্রাণীর মতই অসহায়। জোর গলায় এটা বললে

অবশ্য ভুল হবে, কারণ কয়েক শ্রেণীর উদ্ভিদ (যেমন বট, অশ্বত্থ ইত্যাদি) সরাসরি বায়ুমণ্ডল থেকে নাইট্রোজেন আহরণ করতে সক্ষম, তবে তা অবশ্য মৌলিক নাইট্রোজেন নয়। এছাড়া মুক্তজীবী বা সহজীবী নাইট্রোজেন বন্ধনকারী জীবাণু এবং নীলসবুজ শেওলা প্রকৃত উদ্ভিদ শ্রেণীভুক্ত। সে কথা থাক। আসল কথা হল গাছ যে নাইট্রোজেন গ্রহণ করতে সক্ষম তা প্রধানতঃ অজৈব পর্যায়ের হওয়া আবশ্যক। অবশ্য বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে গাছ কিছু কিছু সরল অ্যামাইনো এ্যাসিড গ্রহণ করে থাকে। যদিও সে ঘটনা অবশ্য বিরল বলা চলে। এখন কথা হল মাটি এই বিপুল পরিমাণ নাইট্রোজেন সরবরাহ করে চলেছে কিভাবে? মাটির নিজস্ব নাইট্রোজেন ভাণ্ডার বলতে যা বোঝায় তা হল শিলা ক্ষয় থেকে উদ্ভূত নাইট্রোজেন ঘটিত যৌগ। এটা নিশ্চয় যুক্তিগ্রাহ্য নয় যে প্রতি বৎসর কোটি কোটি টন শিলা একই অঞ্চলে ক্ষয়ীভূত হচ্ছে। এছাড়া মাটিতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ শিলাভূত নাইট্রোজেন অপেক্ষা বেশী। তবে এ নাইট্রোজেন এল কোথা থেকে? বরং নাইট্রোজেন মাটিতে যা সঞ্চয় ছিল তা বহুকাল পূর্বেই শেষ হয়ে যাওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু এরকম হয় নি কেন?

এর প্রধান কারণ হল প্রকৃতিতে প্রতিটি মৌলিক পদার্থই বিবর্তনের এক পর্যায়ক্রমিক চক্রের মধ্য দিয়ে চলেছে। কিন্তু প্রশ্ন হল এই যজ্ঞের মূল পুরোহিত কে? এই পদ্ধতি পরিচালনার কর্ণধার হল বিভিন্ন শ্রেণীর জীবাণু। কিন্তু এছাড়া মাটিতে নাইট্রোজেন সংযোজনের আর কি কি উৎস আছে? সে হল বায়ুমণ্ডলীয় নাইট্রোজেন বন্ধন এবং জমিতে রাসায়নিক বা জৈব নাইট্রোজেনের ঘটিত সার প্রয়োগ। বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন বন্ধন হয় সম্ভাব্য দুটো উপায়ে। প্রথমতঃ প্রাকৃতিক রাসায়নিক বন্ধন এবং দ্বিতীয়তঃ মুক্তজীবী এবং সহজীবী জীবাণু ঘটিত বন্ধন। এখন নাইট্রোজেন বন্ধনের চক্রপথটা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখানো হল (চিত্র-১)।

বজ্র বিদ্যুৎপাতের ফলে বায়ুমণ্ডলীয় নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেন পরস্পর যুক্ত হয়ে নাইট্রিক অক্সাইড (NO) গঠন করে। এই নাইট্রিক অক্সাইড আবার অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নাইট্রোজেন-ডাই-অক্সাইড (NO_2) গঠন করে। এই নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড বৃষ্টির জলের সঙ্গে ক্রিয়ায় নাইট্রিক এ্যাসিড গঠন করে। এই নাইট্রিক এ্যাসিড বৃষ্টির জলের সাহায্যে নেমে আসে মাটিতে। এই প্রক্রিয়ায়



চিত্র ১ : নাইটোজেন চক্র

মাটিতে যুক্ত নাইট্রোজেনের পরিমাণ প্রতি বছর একর পিছু ২-১০ কিগ্রার বেশী হয় না। **মুক্তজীবী নাইট্রোজেন বন্ধনকারী জীবাণু কিন্তু জমিতে প্রতিবৎসর উল্লেখযোগ্য পরিমাণ নাইট্রোজেন যোগ করে থাকে।** এর মধ্যে জলমগ্ন জমিতে নীলসবুজ শেওলার ভূমিকা সম্বন্ধে আগেই আলোচনা করা হয়েছে। এখানে আমরা প্রধানতঃ মুক্তজীবী ব্যাক্টিরিয়া দ্বারা নাইট্রোজেন বন্ধন এবং কৃষিজমিতে তাদের প্রয়োগ সম্ভাবনা ও পরীক্ষালব্ধ ফলাফল নিয়ে আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব।

নাইট্রোজেন বন্ধনকারী মুক্তজীবী ব্যাক্টিরিয়ারা স্বভোজী বা পরভোজী, সবাত শ্বসনকারী বা অবাত শ্বসনকারী হতে পারে। তাই এরা কোন এক নির্দিষ্ট শ্রেণীভুক্ত জীবাণু নয়। সালোকসংশ্লেষকারী জীবাণুদের মধ্যে মুখ্য হল—**ক্লোরোবিয়াম, ক্রোমাটিয়াম, রোডো-মাইক্রোবিয়াম, রোডোসিউডোমোনাস, রোডোস্পিরিলিয়াম** ইত্যাদি গণের ব্যাক্টিরিয়া। রাসায়নিক স্বভোজী (Chemoautotrophic) জীবাণুদের মধ্যে মুখ্য হল—**মিথানোব্যাসিলাস** গণের ব্যাক্টিরিয়া।

পরভোজী ও সবাত শ্বসজীবী জীবাণুদের মধ্যে—**এজোটোব্যাক্টার,**

এজোমোনাস, বায়ারিঙ্কিয়া, এক্রোমোব্যাক্টার, এজোস্পিরিলাম, ডারকসিয়া, ক্লেবসিয়েলা ইত্যাদি গণের ব্যাক্টিরিয়া উল্লেখযোগ্য। পরভোজী ও অবাত শ্বসজীবী জীবাণুদের মধ্যে—ক্লস্টিড্রিয়াম, এরো-ব্যাক্টার, এরোজেন্স, ব্যাসিলাস পলিমিক্সা (সুযোগসন্ধানী—faculta-tive) সিডোমোনাস (সুযোগ-সন্ধানী) ইত্যাদি গণের ব্যাক্টিরিয়া মুখ্য ভূমিকা নেয়। এছাড়া কিছু এক্টিনোমাইসিটস যেমন নকারডিয়া, স্ট্রেপটো-মাইসিস, মাইকোব্যাক্টিরিয়াম এবং কিছু কিছু ছত্রাক যেমন এস্পার-জিলাস, পেনিসিলিয়াম, মিউকর, ক্ল্যাডোস্পোরিয়াম, ফোমা ইত্যাদি গণের জীবাণু এবং বিশেষ কয়েক শ্রেণীর ইস্ট যেমন স্যাকারোমাইসিস, রোডোটোরুলা ইত্যাদি জীবাণুর নাইট্রোজেন বন্ধনের ক্ষমতা আছে। তবে বলা বাহুল্য কয়েকশ্রেণীর সবাত শ্বসনকারী মুক্তজীবী ব্যাক্টিরিয়া ছাড়া অন্যদের নাইট্রোজেন বন্ধন ক্ষমতা আশানুরূপ নয়। এরা কেবলমাত্র নাইট্রোজেন-হীন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে নিজেদের জীবনধারণ ও বংশবৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় নাইট্রোজেন বন্ধন করতে পারে। স্পষ্টতঃই এরা আমাদের তেমন কোন উল্লেখ-যোগ্য উপকারে আসবে না। বিভিন্ন শ্রেণীর কয়েকটা জীবাণুর তুলনামূলক নাইট্রোজেন বন্ধন ক্ষমতা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখানো হল।

তুলনামূলকভাবে ক্ষমতা মূল্যায়ন করা হলে স্পষ্টই বোঝা যাবে এজোটোব্যাক্টার অন্য ব্যাক্টিরিয়া বা নীলসবুজ শেওলা থেকে অনেক বেশী ক্ষমতাশালী। পরীক্ষাগারে কোন জীবাণু নাইট্রোজেন বন্ধনে সক্ষম কিনা বোঝার জন্য, নাইট্রোজেনহীন পুষ্টি মাধ্যমে তাদের বৃদ্ধি হচ্ছে কিনা তা লক্ষ্য করা হয়। যদিও কোন জীবাণু নাইট্রোজেনহীন পুষ্টি মাধ্যমে জন্মাতে সক্ষম হয় তবুও তাকে নাইট্রোজেন বন্ধনকারী বলে সকলে মেনে নিতে রাজি নন। অনেক বিজ্ঞানীদের মতে কোন কোন জীবাণু অতি অল্প পরিমাণ নাইট্রোজেনের উপস্থিতিতে ভালোভাবে জন্মাতে পারে। অর্থাৎ কিনা অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থে যে সামান্যতম পরিমাণ নাইট্রোজেনজাত পদার্থ অপদ্রব্য হিসাবে মিশ্রিত থাকে বা স্বাভাবিক কারণেই পরীক্ষাগারের বায়ুমণ্ডলে যে সামান্য পরিমাণ মুক্ত অ্যামোনিয়া থাকতে পারে তা গ্রহণ করে ঐসব জীবাণু বিপাকীয় ক্রিয়া চালিয়ে নেয়। তাই তাদের নাইট্রোজেন বন্ধনের পরিমাণ নির্দ্ধারণ না করে নিশ্চিত হওয়া যায় না যে তারা প্রকৃত নাইট্রোজেন বন্ধনকারী কিনা। নাইট্রোজেনের পরিমাণ নির্ণয়ের

তালিকা ১ : নাইট্রোজেন বন্ধনক্ষম ব্যাক্টিরিয়ার নাইট্রোজেন বন্ধন ক্ষমতা
(আলেকজাণ্ডার, ১৯৬১)

জীবাণু	বিশেষত্ব	সময় (দিনে)	নাইট্রোজেন বন্ধনের পরিমাণ (মাইক্রোগ্রাম প্রতি মিলিলিটার µg/ml)
এক্রোমোব্যাক্টার প্রজাতি	সবাত শ্বসজীবী	৪	১৭
এজোটোব্যাক্টার ভাইনল্যাণ্ডি	,,	৩	১০৫০
এরোব্যাক্টার এরোজেনস	অবাত শ্বসজীবী	২	৬০
ক্লস্ট্রিডিয়াম বিউটিরিকাম	,,	১০	১৩৬
ক্লোরোবিয়াম প্রজাতি	অবাত শ্বসজীবী (আলোক)	৫	২০
রোডোস্পিরিলিয়াম প্রজাতি	,,	১০	৭৬
সিলিণ্ড্রোস্পার্মাম সিলিণ্ড্রিকা	সবাত শ্বসজীবী (আলোক)	৫৫	৫২

জন্য সাবেকি পদ্ধতি হল কিলডাল (kieldahl) নির্দেশিত পদ্ধতি। এই পদ্ধতি খুব সুক্ষ্ম নয় বলে অতি অল্প পরিমাণ আবদ্ধ নাইট্রোজেনের হিসাব এই পদ্ধতিতে আস্থার সঙ্গে নির্ণয় করা যায় না। এজন্য বর্তমানে যে রীতি অনুসরণ করা হয় তা হল, গ্যাস ক্রোমোটোগ্রাফির সাহায্যে এসিটিলিন বিজারণ পদ্ধতি। এই পদ্ধতি খুবই সংবেদনশীল বলে অতি অল্প পরিমাণ আবদ্ধ নাইট্রোজেনের পরিমাপও এই পদ্ধতির সাহায্যে

নির্ভুলভাবে নির্ণয় করা যায়। এ ছাড়া আছে নাইট্রোজেনের স্থায়ী আইসোটোপ N^{15} পদ্ধতি। মাস স্পেক্টোগ্রাফের (Mass spectograph) সাহায্যে নির্ণীত এই পরিমাপ পদ্ধতিও খুবই সংবেদনশীল। এই পদ্ধতির সাহায্যেও সামান্যতম আবদ্ধ নাইট্রোজেন পরিমাপ করা সম্ভব।

সাধারণতঃ সালোকসংশ্লেষকারী এবং রাসায়নিক স্বভোজী জীবাণুদের বৃদ্ধি হার যথেষ্ট বিলম্বিত হয়ে থাকে। সালোকসংশ্লেষক্ষম নাইট্রোজেন বন্ধনকারী ব্যাক্টিরিয়াদের সিউডোমোনাডেলস (*Psuedomonadales*) পর্বের এথায়োরোডেসি (*Athiorhodaceae*) বা গন্ধক বর্জিত লালাভ ব্যাক্টিরিয়া পরিবারভুক্ত এবং ক্লোরোব্যাক্টিরিয়েসি (*Chlorobactericeae*) বা সবুজ গন্ধক ব্যাক্টিরিয়া এই পরিবারভুক্ত করা হয়। প্রত্যেকেই আলোর প্রভাবে উদ্দীপ্ত হয় কিন্তু এরা অক্সিজেনের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এছাড়া এদের নাইট্রোজেন বন্ধন ক্ষমতাও নিম্নমানের হয়ে থাকে। গন্ধক বর্জিত লালাভ ব্যাক্টিরিয়ার মুখ্য প্রাপ্তিস্থান হল জলমগ্ন জমি, খালের কাদামাটি বা সমুদ্র সৈকত। সাধারণতঃ এদের কৃষি খামার বা বনভূমিতে পাওয়া যায় না। এছাড়া **এরোব্যাক্টার, এক্রোমোব্যাক্টার, সিউডোমোনাস** বা **ব্যাসিলাস পলিমিক্সা** এদের খামার বা কৃষিজমিতে দেখা যায়, যদিও এদের নাইট্রোজেন বন্ধন ক্ষমতা খুব নিম্নমানের।

সবাত পরিবেশে নাইট্রোজেন বন্ধনের মুখ্য ভূমিকা হল **এজোটোব্যাক্টারের**। এদের কোষগুলি যথেষ্ট বড়, উত্তল-ইস্টের আকৃতি বিশিষ্ট হয়ে থাকে। এরা সকলেই সবাত শ্বসজীবী। এদের সাধারণতঃ শ্বসনের হার অতি উচ্চ, সম্ভবতঃ তা সকলপ্রাণী এবং উদ্ভিদ জগতের মধ্যে সর্বোচ্চমানের। নাইট্রোজেন সাধারণতঃ বায়ুমণ্ডল থেকে গ্রহণ করলেও অ্যামোনিয়াম, নাইট্রেট, নাইট্রাইট, ইউরিয়া বা কিছু সরল জৈব যৌগ থেকেও নাইট্রোজেন আহরণ করতে এরা সক্ষম। এরা সাধারণতঃ মধ্যমমানের (mesophilic) উষ্ণতা পছন্দ করে। এদের বৃদ্ধির জন্য সর্বাপেক্ষা উপযোগী উষ্ণতা হল ৩০° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। এদের শ্বসনের হার অতি উচ্চ হওয়ার জন্য অভিযোজনের বিশেষ সুবিধা থাকা সত্ত্বেও এরা প্রকৃতিতে টিকে থাকার পক্ষে প্রবল প্রতিযোগী বলে গণ্য হয় না। এরা প্রাকৃতিক এবং ভৌগোলিক সকলপ্রকার বাধা উপেক্ষা করে শীত বা গ্রীষ্মপ্রধান সকল দেশের মাটিতেই অবস্থান করে। তবে এরা অতিরিক্ত

অম্লত্ব বা ক্ষারত্ব সহ্য করতে পারে না। অম্লমাটিতে তাই এজোটোব্যাক্টারের সন্ধান মেলে না। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে বিশেষ করে অম্লমৃত্তিকায় বায়ারিঙ্কিয়া এবং ডারকসিয়ার (*Derxia*) প্রাধান্য দেখা যায়। এদের শীতপ্রধান দেশের মাটিতে কিন্তু মোটেই পাওয়া যায় না। এই অনন্য ভৌগোলিক বিন্যাসের প্রকৃত কারণ আজও বিজ্ঞানীদের কাছে রহস্যাবৃত।

ইউব্যাক্টিরিয়েলস পর্বের এজোটোব্যাক্টারেসি (*Azotobacteraceae*) পরিবারভুক্ত হল **এজোটোব্যাক্টার** গণের ব্যাক্টিরিয়া। এদের নাইট্রোজেন বন্ধন ক্ষমতা বিভিন্ন মাটির এবং বিভিন্ন প্রজাতির উপর নির্ভর করে ভিন্ন হয়ে থাকে। **এজোটোব্যাক্টারের** প্রধান পাঁচটি প্রজাতি হল, **এজোটোব্যাক্টার ভাইনল্যাণ্ডি, এ. ক্রুকক্কাম, এ. বায়ারিঙ্কি, এ. ম্যাক্রোসাইটোজিনস, এবং এ. এজিলিস**। এদের মধ্যে আমাদের দেশে সবচেয়ে শক্তিশালী নাইট্রোজেন বন্ধনকারী ব্যাক্টিরিয়া হল **এজোটোব্যাক্টার ক্রুকক্কাম**, এছাড়া **এজোটোব্যাক্টার ভাইনল্যাণ্ডি** প্রজাতিও খুব সক্রিয়ভাবে নাইট্রোজেন বন্ধনে সক্ষম। **এ. ক্রুকক্কাম** প্রজাতিকে তার বৃদ্ধি বৈশিষ্ট থেকে চেনা খুব সহজ। এরা কঠিন মাধ্যমে জন্মানোর কয়েকদিন পরে বাদামী বা কালো রঙের মেলানিন নামক রঞ্জক পদার্থ উৎপন্ন করে। আমাদের দেশের কৃষিজমিতে নাইট্রোজেন বন্ধনকারী জীবাণুর সংখ্যা (যার মধ্যে **এজোটোব্যাক্টারই** প্রধান) প্রতি গ্রাম মাটিতে $১০^{৪}$ — $১০^{৫}$ পর্যন্ত বা তার বেশী হতে দেখা যায়। **এজোটোব্যাক্টার** ছাড়া অন্য প্রধান নাইট্রোজেন বন্ধনকারী গণের ব্যাক্টিরিয়া হল, **এজোমোনাস** এবং **ক্লেবসিয়েলা**। **এজোটোব্যাক্টার, বায়ারিঙ্কিয়া। এজোমোনাস** বা **ক্লেবসিয়েলা** মাটি ছাড়া গাছের পাতাকেও (Phyllosphere) আশ্রয় করে সক্রিয়ভাবে নাইট্রোজেন বন্ধন করে থাকে। **ক্লস্ট্রিডিয়াম** হল মাটিতে মুখ্য অবাত শ্বসনকারী নাইট্রোজেন বন্ধনক্ষম ব্যাক্টিরিয়া। এদের সংখ্যা সাধারণ জমিতে প্রতিগ্রাম মাটিতে $১০^{৫}$ বা তারও বেশী হতে দেখা যায়। এদের নাইট্রোজেন বন্ধন ক্ষমতা কম হলেও এরা বিস্তীর্ণ pH এ (৫·০ — ৯·০) জন্মাতে পারে। নাইট্রোজেন বন্ধনকারী মুখ্য **ক্লস্ট্রিডিয়ামের** প্রজাতিগুলি হল, **ক্লস্ট্রিডিয়াম পাস্তুরিয়ানাম, ক্ল, বিউটিরিকাম, ক্ল. এসেটিকাম, ক্ল. ফেলসিনাম, ক্ল. ক্লুইভেরী, ক্ল. বায়ারিঙ্কি, ক্ল. ল্যাক্টোএসিটোফিলাম, ক্ল. এসিটোবিউটিলিকাম** ইত্যাদি।

জীবাণুর নাইট্রোজেন বন্ধন কৌশল প্রসঙ্গে কিন্তু সব বিজ্ঞানীরা একমত নন। অনেকের মতে অ্যামোনিয়া (NH_3) হচ্ছে সর্বশেষ অজৈব পর্যায় যা পরবর্তী পর্যায়ে জৈব নাইট্রোজেনে পরিণত হয়। পক্ষান্তরে এক শ্রেণীর বিজ্ঞানীদের মতে হাইড্রক্সিল অ্যামিন (NH_2OH) এবং অন্য একশ্রেণীর বিজ্ঞানীদের মতে হাইড্রাজিন (N_2H_4) হল সর্বশেষ অজৈব পর্যায় যা জৈব নাইট্রোজেনে পরিণত হয়। প্রত্যেক প্রকল্পের প্রবক্তাগণই নিজেদের বক্তব্যের সমর্থনে যুক্তি উপস্থাপিত করেছেন। কিন্তু বলা বাহুল্য বর্তমানে বিভিন্ন পরীক্ষায় দেখা গেছে অ্যামোনিয়াই হচ্ছে জৈব এবং অজৈব সংযোগ রক্ষাকারী পদার্থ। অ্যামোনিয়াকে অন্তিম অজৈব পর্যায়ের যৌগ মনে করার কারণগুলো হল :

(১) সক্রিয়ভাবে বংশবিস্তার করে চলেছে এমন কোন নাইট্রোজেন বন্ধনকারী জীবাণুকে অ্যামোনিয়া গ্যাস সরবরাহ করা হলে জীবাণুর এই নূতন পদার্থ অধি-গ্রহণের জন্য কোন অতিরিক্ত সময় না নিয়েই সমানহারে বংশ বৃদ্ধি চালিয়ে যেতে পারে।

(২) অ্যামোনিয়া বা যেসব যৌগ থেকে সহজেই অ্যামোনিয়া উৎপন্ন হতে পারে তা জীবাণুরা অতি সত্বর গ্রহণ করে থাকে।

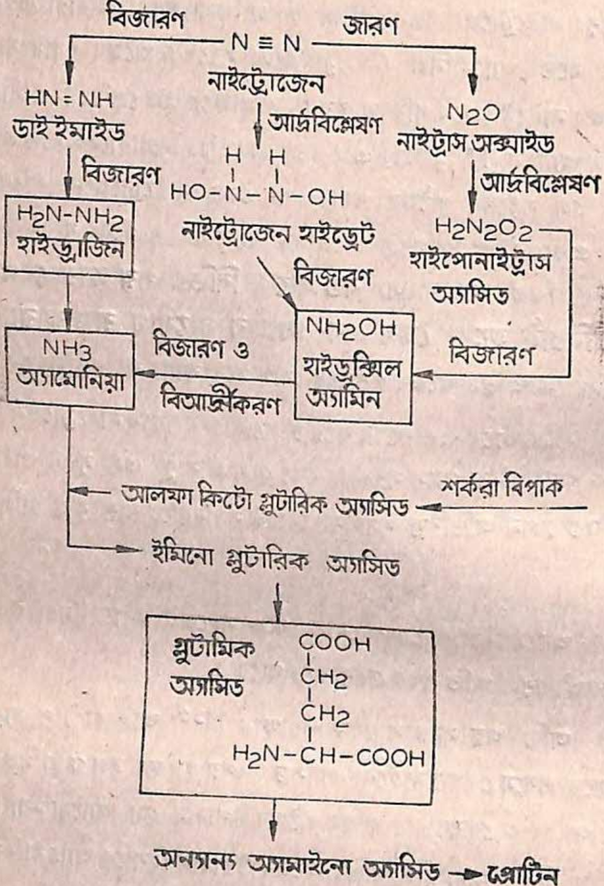
(৩) অতি অল্প সময় সাপেক্ষ পরীক্ষায় $N^{১৫}$ আইসোটোপ ব্যবহার করে দেখা গেছে প্রথমে যে অ্যামাইনো এ্যাসিড উৎপন্ন হয় তা হল গ্লুটামিক এ্যাসিড। এই পরীক্ষা থেকে বোঝা যায় অন্তিম অজৈব উপাদান হল অ্যামোনিয়া। এছাড়া তাপগতীয় হিসাব অনুযায়ীও অন্তিম অজৈব উপাদান হিসাবে অ্যামোনিয়ার পক্ষেই রায় পাওয়া যায়।

নাইট্রোজেন বন্ধনের সম্ভাব্য পথগুলি পরবর্তী পৃষ্ঠায় চিত্রের সাহায্যে দেখানো হল (চিত্র ২) :

পরবর্তী পৃষ্ঠার চিত্র থেকে বোঝা যাচ্ছে নাইট্রোজেন বন্ধনের প্রাথমিক গতি-পথকে জারণ, বিজারণ এবং আর্দ্র বিশ্লেষণ বলে দাবী করা হয়েছে। কিন্তু পরীক্ষালব্ধ ফলাফল বিজারণ প্রক্রিয়ার পক্ষে রায় দেয়। তার প্রধান কারণগুলো হল :

(১) নাইট্রোজেন বন্ধনের সময় নিম্নমানের জারণ বিভবের উদ্ভব হয়।

(২) অতিরিক্ত অক্সিজেনের উপস্থিতি নাইট্রোজেন বন্ধনক্রিয়া ব্যাহত করে।



চিত্র ২ঃ নাইট্রোজেন বন্ধনের সম্ভাব্য পথ (আলেকজাণ্ডার, ১৯৬১ হইতে গৃহীত)

প্রকৃতপক্ষে, নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনের অনুপাত ১ঃ৩ হলে নাইট্রোজেন বন্ধন সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যায়।

(৩) নাইট্রোজেন বন্ধনকারী জীবাণুর কোষ বিশ্লিষ্ট করে বিজারিত পণ্য উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।

(৪) নাইট্রোজেন সমৃদ্ধ বিজারিত পণ্যকে নাইট্রোজেন বন্ধনকারী জীবাণু বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করে।

এ ছাড়া হাইড্রাজিন এবং হাইড্রক্সিল অ্যামিন জীবাণুর পক্ষে বিষ (toxic) বলে গণ্য করা হয়।

নাইট্রোজেন একটা অতিশয় নিষ্ক্রিয় যৌগ যা স্বাভাবিক চাপে ও তাপমাত্রায় সম্ভবতঃ লিথিয়াম ছাড়া অন্য কোন যৌগের সঙ্গে যুক্ত হয় না। কৃত্রিম শিল্প পদ্ধতিতে নাইট্রোজেন বন্ধনের জন্য প্রায় ৫৫০° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপাংক এবং ২০০ গুণ বায়ুমণ্ডলীয় চাপ প্রয়োগ করতে হয়। নাইট্রোজেন অণুতে দুটি পরমাণু পরস্পরের সঙ্গে ত্রিবন্ধে যুক্ত থাকে যার প্রতিগ্রাম অণুগ্যাসে বন্ধন শক্তির পরিমাণ হল ২২৫ কিলো-ক্যালরী। এই শক্তি বণ্টনের মাত্রা হল প্রথম বন্ধনে ১২৭ কিলোক্যালরী, দ্বিতীয় বন্ধনে শক্তির মাত্রা হল ৬০ কিলোক্যালরী এবং তৃতীয় বন্ধনে শক্তির পরিমাণ হল ৩৮ কিলোক্যালরী। **কিন্তু নাইট্রোজেন বন্ধনকারী জীবাণু প্রকৃতির অদ্ভুত ক্ষমতাবলে উৎসেচক ক্রিয়ায় বায়ুমণ্ডলীয় নাইট্রোজেন থেকে নিজের দেহগঠনের উপযোগী প্রোটিন গড়তে সক্ষম।**

১৯৬২ সালে মর্টেনসন এবং তাঁর সহকারীবৃন্দ কোষহীন নির্যাস (Cell free extract) থেকে দুটি উৎসেচক আবিষ্কার করেন. একটি হল হাইড্রোজেন দাতা (H.D.S.) যাতে আছে হাইড্রোজিনেস এবং ফসফোরোক্লাস্টিক ক্ষমতা এবং দ্বিতীয়টি হল নাইট্রোজেন উদ্দীপক (N.A.S.) বা নাইট্রোজিনেস। হাইড্রোজিনেজ উৎসেচকে প্রস্থেটিক শ্রেণী (Prosthetic group) হিসাবে মলিবডেনাম সংযুক্ত ফ্লেভিন এডিনিন ডাইনিউক্লিওটাইড (FAD) এবং হিম-বিহীন (Nonheme) লোহা বর্তমান। সম্ভবতঃ কোবাল্ট পরমাণু প্রোটিন অংশের সঙ্গে যুক্ত থাকে। এ ছাড়া ফসফোরোক্লাস্টিক পর্যায়ে পাইরুভিক অম্ল থাকে। পরীক্ষায় দেখা গেছে এক অণু নাইট্রোজেন বন্ধনের জন্য প্রায় ৮০ অণু পাইরুভিক অম্লের প্রয়োজন হয়। ফসফোরোক্লাস্টিক বিক্রিয়া অবাত শ্বসনকারী নাইট্রোজেন বন্ধনক্ষম জীবাণুতে দেখা যায়। সবাত শ্বসনক্ষম জীবাণুতে এদের কোন অস্তিত্ব নেই। ফসফোরোক্লাস্টিক পর্যায়ে সহকারী হিসাবে কোএনজাইম—'এ', থাইমিন পাইরো ফসফেট (TPP), লিপোয়িক অম্ল এবং ফোলিক অম্ল পাওয়া গেছে। ১৯৭১ সালে বারগেরসন প্রথম জানতে পারেন যে নাইট্রোজিনেজ উৎসেচকে দুটি ধাতব প্রোটিন বর্তমান। বৃহত্তর প্রোটিনটিতে (আঃ গুঃ ১,০০,০০০—আঃ গুঃ ১,৮০,০০০) এক থেকে দুটি মলিবডেনাম এবং ৮-১৬টি লোহার পরমাণু থাকে। ক্ষুদ্রতর প্রোটিনটিতে (আঃ গুঃ ৪০,০০০—

৫০,০০০) দুই থেকে তিনটি Fe-S বন্ধন থাকে। তিনি প্রথম অংশের নাম দেন এজোফার্মস (Mo—Fe—প্রোটিন) এবং দ্বিতীয় অংশের নাম দেন এজোফার (Fe—প্রোটিন)। এরা সম্ভবতঃ ১ : ২ অনুপাতে থাকে। নাইট্রোজিনেজ উৎসেচকের ক্রিয়ার জন্য এডিনোসিন ট্রাই ফসফেট (ATP) এবং নিম্নমানের জারণ বিভব মাত্রার প্রয়োজন হয়।

প্রয়োজনীয় বিজারকগুলির মধ্যে একটি ইলেকট্রন দাতা, ইলেকট্রন গ্রহীতা, এটিপি এবং দ্বিযোজী ধাতব আয়ন প্রয়োজন। ইলেকট্রন দাতা এবং গ্রহীতার কাজ করে এটিপি এবং এডিপি (এডিনোসিন ডাই ফসফেট)। ইলেকট্রন দাতা হিসাবে অনেকক্ষেত্রে ফেরেডোক্সিন এবং ফ্লেভোডক্সিনের সন্ধান পাওয়া গেছে। বিভিন্ন পরীক্ষায় দেখা গেছে এটিপি নাইট্রোজেন বন্ধনে অপরিহার্য কিন্তু দ্বিযোজী ধাতু মলিবডেনামের পরিবর্তে ম্যাঙ্গানীজ Mn^{+2}, ম্যাগনেসিয়াম Mg^{+2}, কোবাল্ট Co^{+2}, লোহা Fe এবং নিকেল Ni^{+2} ক্রমাবনত মানে ব্যবহৃত হতে পারে। মলিবডেনাম যুক্ত ধাতব প্রোটিনের ক্রিয়া অ্যাসিটিলিনের উপস্থিতিতে ব্যাহত হয়। পরীক্ষায় দেখা গেছে এমতাবস্থায় নাইট্রোজেন বন্ধনের তুল্য পরিমাণ অ্যাসিটিলিন বিজারিত হয়। তাই অ্যাসিটিলিন বিজারণ পদ্ধতির সাহায্যে নাইট্রোজেন বন্ধনের পরিমাণ নির্ণয় করা সম্ভব।

নাইট্রোজেন বন্ধনকালে HDS এবং NAS উভয় পর্যায়ের উৎসেচকই প্রয়োজন হয়। কিন্তু কেবলমাত্র জীবাণু যখন আণবিক নাইট্রোজেনকে ভিত্তি করে জন্মায় তখন NAS পর্যায়টি সক্রিয় হয়।

নাইট্রোজেন বন্ধনের বাস্তবক্ষেত্রে কিন্তু কতকগুলি সমস্যা দেখা যায়। বিশেষ করে এজোটোব্যাক্টার, আম্লিক পরিবেশে একেবারেই জন্মায় না বা অম্লত্বের মাত্রা বৃদ্ধি পেলে তার নাইট্রোজেন বন্ধনের ক্ষমতা যথেষ্ট কমে যায়। পরীক্ষায় দেখা গেছে এজোটোব্যাক্টারের নাইট্রোজেন বন্ধন ক্ষমতা pH ৬·০-এর নীচে সম্পূর্ণভাবে স্তব্ধ হয়ে যায়। কিন্তু বায়্যারিঙ্কিয়া pH ৩·০ থেকে ৯·০-এর মধ্যে সক্রিয়ভাবে নাইট্রোজেন বন্ধন করে থাকে। ক্লস্ট্রিডিয়াম বা অন্যান্য ব্যাক্টিরিয়াদের নাইট্রোজেন বন্ধন ক্ষমতা এজোটোব্যাক্টার এবং বায়্যারিঙ্কিয়ার মধ্যবর্তী হয়ে থাকে। নীলসবুজ শেওলা জলমগ্ন ধানজমিতে নাইট্রোজেন বন্ধন করে বলে সম্ভবতঃ জমির অম্লত্ব বা ক্ষারত্ব দ্বারা তাদের ক্রিয়া বিঘ্নিত হয় না। কিন্তু পরীক্ষাগারে pH ৬·৫-এর কাছাকাছি হলে তারা সক্রিয়-

ভাবে নাইট্রোজেন বন্ধন করে। নাইট্রোজেন বন্ধনকারী জীবাণুদের নাইট্রোজেন বন্ধনের জন্য দ্রবণীয় পর্যায়ের ফসফরাস অত্যন্ত আবশ্যকীয় পণ্য। **এজোটোব্যাক্টারের** ফসফরাসের প্রতি সংবেদনশীলতা অত্যন্ত বেশী। বস্তুতপক্ষে ৫-১০ মিলিগ্রাম নাইট্রোজেন বন্ধনের জন্য তাদের ০·১ মিলিগ্রাম দ্রবণীয় ফসফেটের প্রয়োজন হয়। নাইট্রোজেন বন্ধনের জন্য বিভিন্ন জীবাণুর বিভিন্ন উদ্দীপক জৈব পদার্থের প্রয়োজন হয়। কিন্তু যৌগিক নাইট্রোজেন যেমন অ্যামোনিয়া বা অ্যামোনিয়াম যৌগের উপস্থিতিতে নাইট্রোজেন বন্ধন প্রায় স্তব্ধ হয়ে যায়। মলিবডেনাম (Mo^{+6}) ধাতু নাইট্রোজেন বন্ধনের ক্ষেত্রে অতি অবশ্য প্রয়োজনীয়। মলিবডেনাম কিভাবে উৎসেচকের সহায়তা করে তা আমরা জেনেছি। মলিবডেনামের বিকল্প হিসাবে অন্য ধাতু ক্রিয়া করতে পারে তবে তাদের কার্যক্ষমতা অপেক্ষাকৃত কম। ভ্যানাডিয়াম (V) হল মলিবডেনামের একটি কার্যকর বিকল্প। এছাড়া নাইট্রোজেন বন্ধনে লোহারও প্রয়োজন হয়। নীলসবুজ শেওলার ক্ষেত্রে নাইট্রোজেন বন্ধনের জন্য ক্যালসিয়ামকেও প্রয়োজনীয় ভূমিকা নিতে দেখা গেছে।

জমিতে নাইট্রোজেন বন্ধনকারী জীবাণুর কার্যকর প্রতিশ্রুতি হল নাইট্রোজেন বন্ধন। সাধারণভাবে আমরা ধরে নিতে পারি যে **এজোটোব্যাক্টার** বা অন্যান্য নাইট্রোজেন বন্ধনকারী গণের জীবাণু প্রত্যেক জমিতেই কমবেশী পরিমাণে থাকবে। তাই সঙ্গত কারণেই এটা মনে করা যেতে পারে যে, যে জমিতে যত বেশী সংখ্যক নাইট্রোজেন বন্ধনকারী থাকবে সেই জমিতে তত বেশী পরিমাণ নাইট্রোজেন বন্ধন হবে। আমাদের দেশের মত উষ্ণ বা নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ুর দেশের প্রত্যেক মাটিতেই পর্যাপ্ত পরিমাণে নাইট্রোজেন বন্ধনকারী ব্যাক্টিরিয়া থাকে এবং এই সংখ্যা সচরাচর প্রতিগ্রাম মাটিতে $১০^{৩}$ থেকে $১০^{৫}$ বা তারও বেশী হয়। তবু সব জীবাণুর বন্ধন ক্ষমতা সমান না হওয়ায় জমির নাইট্রোজেন বন্ধন ক্ষমতা কেবলমাত্র জীবাণুর সংখ্যার উপর নির্ভর করে না। আমাদের দেশের মাটিতে উন্নতমানের নাইট্রোজেন বন্ধনকারী জীবাণুর মধ্যে **এজোটোব্যাক্টার ডারক্সিয়া গাম্মোসা** (*Derxia gummosa*), **ক্লেবসিয়েলা** এবং **এজোস্পিরিলাম** প্রজাতির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে এইসব ব্যাক্টিরিয়াদের জন্য প্রয়োজন হয় প্রচুর পরিমাণে সহজলভ্য (শর্করা জাতীয়) কার্বন জাতীয় পদার্থের যোগান দেবার। অধিক ক্ষমতা-

শালী প্রজাতির ব্যাক্টেরিয়া একগ্রাম শর্করা বিপাক করে প্রায় ২০-২৫ মিলিগ্রাম পর্যন্ত নাইট্রোজেন বন্ধন করতে পারে। এদের মধ্যে অবশ্য এজোটোব্যাক্টারের বিভিন্ন প্রজাতিই সর্বত্র বিস্তৃত। উপরোক্ত পরীক্ষার উপর ভিত্তি করে যে হিসাব গড়ে উঠেছে তাতে দেখা গেছে এজোটোব্যাক্টার সর্বোচ্চ হেক্টর পিছু ৪৫-৫৬ কিলোগ্রাম পরিমাণ নাইট্রোজেন বন্ধন করতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সচরাচর এজোটোব্যাক্টার যে পরিমাণ নাইট্রোজেন বন্ধন করতে সক্ষম হয় তার পরিমাণ আরো কম হয়ে থাকে। অধিক ক্ষমতাশালী কোন এজোটোব্যাক্টার প্রজাতি যদি একগ্রাম শর্করা বিপাকের ফলে ১৫-২৫ মিলিগ্রাম নাইট্রোজেন বন্ধনে সক্ষম হয় তবে সেই হিসাবে ১৫ ২৫ কিগ্রা. নাইট্রোজেন বন্ধনের জন্য প্রয়োজন হবে ১০০০ কিগ্রা. শর্করা বা কিঞ্চিদধিক ৩০০০ কিগ্রা. জৈব পদার্থ। যেখানে আমাদের দেশের মত উষ্ণ অঞ্চলের দেশগুলিতে একেতেই মাটিতে হিউমাসের পরিমাণ শতকরা একভাগের কম, তার উপর এজোটো-ব্যাক্টারের মত ক্ষীণ প্রতিযোগী কিভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ঐ বিপুল পরিমাণ জৈব পদার্থ আত্তীকরণে সমর্থ হবে তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। অর্থাৎ এজোটোব্যাক্টারের সাফল্যের মূল প্রতিবন্ধক হল জৈব পদার্থের সরবরাহ। একটা পরীক্ষার সাহায্যে এই তথ্যের সত্যতা যাচাই করা যাক।

পরীক্ষার জন্য মাটির নির্যাসকে (soil extract) N^{15} নাইট্রোজেন পরিমণ্ডলে রেখে মাটির N^{15}-এর পরিমাণ নির্ণয় করা হল। প্রথম মাটিতে একর প্রতি ৬০০০ পাউণ্ড খড় এবং অন্য তিনটি মাটিতে যথাক্রমে একর প্রতি ২০,০০০ পাউণ্ড খড়, আলফা আলফা গাছের দেহাবশেষ, স্টার্চ এবং শর্করা যোগ হল।

পরবর্তী পৃষ্ঠায় তালিকা ২ দেখে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে মূল সমস্যাটা কোথায়? এজোটোব্যাক্টারের মত সুখী জীবাণুদ্বারা কাজ পেতে হলে জমিতে সেলুলোজ বিচূর্ণকারী (Cellulose decomposer) জীবাণুর ক্রিয়া উচ্চমানের হওয়া আবশ্যক। অবশ্য জমিতে জৈবসার প্রয়োগের ফলে সেলুলোজ জীর্ণকারী জীবাণুর প্রাচুর্য্য ঘটে, ফলে এ সমস্যার সৃষ্টি হয় না। আবার চাষের জমিতে, বিশেষ করে যখন কোন উদ্ভিদ বর্তমান তখন উদ্ভিদ, উপকারী জীবাণুকে আকৃষ্ট করার জন্য প্রতিনিয়তঃই মূলের সাহায্যে শর্করা এবং বিভিন্ন বৃদ্ধি উদ্দীপক পদার্থ নির্গত করে থাকে। তাই এই পরিস্থিতিতে মূলের চারপাশের মাটিকে

তালিকা ২ : জৈব পদার্থের প্রভাবে মাটির নাইট্রোজেন বন্ধনক্ষম জীবাণুর ক্ষমতা (আলেকজাণ্ডার, ১৯৬১)

উপাদান	মাটির pH	পরীক্ষিত সময়	আবদ্ধ নাইট্রোজেনের পরিমাণ (পাউণ্ড প্রতি একরে)
নিয়ন্ত্রিত	৭·৮	৪৬	০·৫১
খড় ৬,০০০ পাউণ্ড প্রতি একরে	৫·২—৫·৬	৪৬	০·১৪
	? ৮—৬·৩	৪৬	০·০৪
	৬ ৭—৭ ৩	৪৬	১·৩২
আলফা আলফা ২০,০০০ পাউণ্ড প্রতি একরে	৭ ৮	৪০	০·৫৯
স্টার্চ ২০,০০০ পাউণ্ড প্রতি একরে	৭ ৮	৪০	৩ ৫
গ্লুকোজ ২০,০০০ পাউণ্ড প্রতি একরে	৭ ৮	৪০	৪০ ০

১ পাউণ্ড প্রতি একরে = ১·১২ কিগ্রা· প্রতি হেক্টরে

অর্থাৎ মূল-পরিমণ্ডলকে (rhizosphere) আশ্রয় করে প্রচুর এজোটোব্যাক্টার জন্মানোর অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়। ফলে জমিতে এজোটোব্যাক্টারের নাইট্রোজেন বন্ধন ক্রিয়ার পথ রুদ্ধ হয় না। জলমগ্ন ধানজমিতে অবাত পরিবেশ সৃষ্টি হয় বলে হয়ত অনেকেই এজোটোব্যাক্টারের সাফল্য সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করবেন। কিন্তু এটা মনে রাখতে হবে এই পরিবেশেও ধানগাছের পত্ররন্ধ্র, এরেনকাইমা (aerenchyma) ও লাইসিজেনাস

আন্তর্কোষিক ছিদ্র দিয়ে পাতা থেকে অক্সিজেন মূলে গিয়ে পৌছায় এবং বাইরে বেড়িয়ে আসে, যার ফলে মূল-পরিমণ্ডলে এজোটো-ব্যাক্টার (জলমগ্ন জমিতেও সহজলভ্য শর্করা জাতীয় পদার্থের সরবরাহ অব্যাহত থাকলে) অক্সিজেনের সংকটে পড়বে না এবং নাইট্রোজেন বন্ধন ক্রিয়াও অব্যাহত রাখবে। যদিও অবাত পরিবেশে ক্লসট্রিডিয়াম জীবাণুর সংখ্যা বহুগুণে বৃদ্ধি পায় এবং তারাই তখন নাইট্রোজেন বন্ধনে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে।

গাছের মূল থেকে প্রধানতঃ যে যে জৈব পদার্থ বেরিয়ে আসতে দেখা যায় তার মধ্যে প্রধান হল বিভিন্ন শর্করা, অ্যামাইনো এ্যাসিড এবং জৈব এ্যাসিড। নাইট্রোজেন বন্ধনের জন্য অন্যান্য মৌলের মধ্যে দ্রবণীয় পর্যায়ের ফসফরাস এবং স্বল্প প্রয়োজনীয় মৌল মলিবডেনামের প্রতিক্রিয়া সর্বাপেক্ষা বেশী। বিভিন্ন পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে মাটিতে মলিবডেনামের অভাব রয়েছে এরকম জমিতে হেক্টর প্রতি ২০-৪০ গ্রাম মলিবডেনাম প্রয়োগের ফলে সবচেয়ে বেশী উপকৃত হয় নাইট্রোজেন বন্ধনকারী জীবাণু। মলিবডেনাম প্রয়োগের ফলে অন্যান্য যে প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায় তা হল, জমির জৈব কার্বনের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং নাইট্রোজেন বন্ধনের হার বৃদ্ধি। এছাড়া মলিবডেনাম প্রয়োগের ফলে জমিতে নাইট্রোজেন বন্ধনকারী শেওলা বিশেষ করে নীলসবুজ শেওলার সংখ্যা বৃদ্ধি হয়। পরবর্তী পৃষ্ঠায় এই তথ্যের সমর্থনে দে এবং ঘোষের ১৯৮০ সালের পরীক্ষালব্ধ তালিকাটি উপস্থাপিত করা যেতে পারে।

এই পরীক্ষায় দেখা যায় জমিতে সার প্রয়োগের পূর্বে যথাক্রমে ৫০×১০^{৪} এবং ৬×১০^{৩} সংখ্যক নাইট্রোজেন বন্ধনকারী ব্যাক্টিরিয়া এবং নীলসবুজ শেওলা উপস্থিত ছিল। অর্থাৎ এই তালিকা ভালোভাবে নিরীক্ষা করলেই এটা স্পষ্টভাবে বোঝা যাবে যে মলিবডেনাম প্রয়োগের প্রভাব নাইট্রোজেন বন্ধনকারী জীবাণুর ক্ষেত্রে কত স্পষ্ট। বলা বাহুল্য নাইট্রোজেন ঘটিত সার যৌথভাবে প্রয়োগের ফলে প্রতিক্রিয়া আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

এই পরীক্ষায় দানা শস্যের ওজন বৃদ্ধি তালিকাও পূর্বোক্ত বক্তব্যগুলিকে সমর্থনের পক্ষে যুক্তি রাখে।

এজোটোব্যাক্টার নিয়ে কৃষি জীবাণু বিজ্ঞানী মহলে অনেক আলোচনা এবং অনেক আলোড়নের শেষেও কিন্তু সবাই মতৈক্যে পৌছাতে পারেন নি।

তালিকা ৩: আই আর-৮ ধান গাছে বিভিন্ন পরিমাণে নাইট্রোজেন ও মলিবডেনাম জাতীয় সার প্রয়োগের ফলে সবাত মুক্তজীবী নাইট্রোজেন বন্ধনকারী ব্যাক্টিরিয়া, নীলসবুজ শেওলা এবং দানা শস্যের ওজনের উপর প্রতিক্রিয়া (দে এবং ঘোষ, ১৯৮০)

চারটি প্লটের (২৪ বর্গমিটার) গড়

সার প্রয়োগের মাত্রা		গড়ে নাইট্রোজেন বন্ধনকারী ব্যাক্টিরিয়ার সংখ্যা ($\times$১০^8)	গড়ে নীলসবুজ শেওলার সংখ্যা ($\times$১০^3)	গড়ে ১০০০ দানা শস্যের ওজন (গ্রামে)
N_0	Mo_0	৮৯	১১	২৫·০৪
	Mo_1	৯৭	১৩	২৬·২৭
	Mo_2	১১০	১৫	২৬·৬৩
N_1	Mo_0	৯৩	১০	২৫·৭৪
	Mo_1	৯৬	১৫	২৬·৬৪
	Mo_2	১১৮	১৮	২৬·৩৬
N_2	Mo_0	৯৫	১৫	২৬·৫৩
	Mo_1	১২২	২০	২৬·২০
	Mo_2	১৩০	২১	২৬·৩১

সারের মাত্রা: N_0, N_1 এবং N_2 → নাইট্রোজেনের মাত্রা যথাক্রমে ০, ৬০ এবং ১২০ কিগ্রা. প্রতি হেক্টরে ;

Mo_0, Mo_1 এবং Mo_2 → মলিবডেনামের মাত্রা যথাক্রমে ০, ২০ এবং ৪০ গ্রাম প্রতি হেক্টরে ।

এজোটোব্যাক্টার পর্যাপ্ত পরিমাণ নাইট্রোজেন বন্ধন করে রাসায়নিক সারের (নাইট্রোজেন ঘটিত) সঙ্গে সাক্ষাত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামতে সমর্থ হবে এতটা আশা অবশ্য কোন জীবাণু বিজ্ঞানীই করেন না। তবু বিভিন্ন উচ্চমানের নাইট্রোজেন বন্ধনকারী এজোটোব্যাক্টার প্রয়োগ করে অনেকেই কিছু না কিছু সুফল পেয়েছেন। সচরাচর মুক্তজীবী নাইট্রোজেন বন্ধনকারী জীবাণুসার প্রয়োগের ফলে শতকরা দশভাগ অতিরিক্ত ফলনবৃদ্ধি হয়, যদিও অনেক বিজ্ঞানী শতকরা ৩০-৪০ ভাগ বেশী ফলনের সাক্ষ্য পেয়েছেন। মিস্থুস্টিনের ১৯৭০ সালের পরীক্ষালব্ধ ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে দানা শস্যের থেকে শব্জি জাতীয় শস্যের ফলনই এজোটোব্যা ক্টিরিণ প্রয়োগে বেশী হয়েছে।

তালিকা ৪ঃ কতিপয় শস্যের ফলনের উপর এজোটোব্যাক্টিরিণ প্রয়োগের প্রভাব (মিস্থুস্টিন, ১৯৭০)

শস্য	বিনাসারে গড়পরতা ফলনমাত্রা (টন প্রতি হেক্টরে)	এজোটোব্যা ক্টিরিণ প্রয়োগের ফলে ফলন বৃদ্ধির পরিমাণ (শতকরা হিসাবে)
বসন্তকালীন গম	১·৫৮	৮ ২
শীতকালীন গম	২·১৩	৯·৮
ওট	১·৭১	১২·০
যব	২·১০	৯ ০
ভুট্টা	৩ ৬২	৮·০
বীট	২৮·৩১	৮·০
আলু	১৭·৮০	৮·০

এবার দেখা যাক জমিতে সার প্রয়োগ করার পর এজোটোব্যাক্টিরিণ কতটা সাফল্য লাভ করেছে।

তালিকা ৫ : জৈবসারের সহযোগিতায় এজোটোব্যাক্টিরিণের প্রভাব
(মিশুস্টিন, ১৯৭০)

শস্য	সার প্রয়োগ	জীবাণু প্রয়োগ না করায় প্রাপ্ত ফলন (টন প্রতি হেক্টরে)	ফলন বৃদ্ধি শতকরা হিসাবে
ভুট্টা	জৈবসার	৫·৪৭	৩৩·৪
	খনিজ সার	৫·৫০	১২·৭
আলু	রাসায়নিক সার	১৭·০০	২৫·৩
	জৈবসার	১০·৯০	১২·৮
বাঁধাকপি	জৈবসার	২৩·৯৩	১৯·০
টমেটো	জৈবসার	১৫·৮	২৮·০

এজোটোব্যাক্টার কিন্তু যে নাইট্রোজেন বন্ধন করে তা মূলতঃ প্রোটিন হিসাবে তাদের কোষে আবদ্ধ থাকে এবং কেবলমাত্র তাদের মৃত্যু ঘটলেই নাইট্রোজেন অজৈবকরণই (mineralisation) প্রক্রিয়ায় অজৈব নাইট্রোজেন মুক্ত হয় যা উদ্ভিদের উপকারে আসতে পারে। উপরন্তু এজোটোব্যাক্টার উদ্ভিদ বৃদ্ধি উদ্দীপক (হর্মোন জাতীয় পদার্থ) অক্সিন বা ইনডোল এ্যাসিটিক এ্যাসিড উৎপাদন করে। গাছের মূলে এই উপকারী জৈব পদার্থগুলি গাছের

বৃদ্ধিকে যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাবিত করে। অনেকেই অবশ্য **এজোটোব্যাক্টারের** সাফল্যের মূল কারণ হিসাবে হর্মোন উৎপাদনকেই চিহ্নিত করে থাকেন। এ ছাড়াও **এজোটোব্যাক্টার** এমন কিছু রাসায়নিক পদার্থ উৎপন্ন করে যা গাছের মূলে অপকারী জীবাণুকে বাসা বাঁধতে দেয় না। তাই সার্বিক বিচারে এই জীবাণুকে জীবাণুসার হিসাবে ব্যবহারের উপযোগিতা অস্বীকার করা যায় না। জীবাণুসার হিসাবে **এজোটোব্যাক্টারের** ব্যবহার কৌশল এবং শিল্পভিত্তিক উৎপাদন প্রসঙ্গে আলোচনার আগে আমরা দেখব মলিবডেনাম প্রয়োগের ফলে জমির হিউমাস এবং নাইট্রোজেন বন্ধনকারী জীবাণুর সংখ্যা কতটা প্রভাবিত হয়েছে।

তালিকা ৬ : মলিবডেনাম প্রয়োগে নাইট্রোজেন বন্ধনক্ষম জীবাণুর প্রতিক্রিয়া (দে এবং সহকর্মীবৃন্দ, ১৯৭৫)

মলিবডেনাম প্রয়োগের মাত্রা (গ্রামে)	জৈব কার্বন বৃদ্ধির পরিমাণ গ্রাম প্রতি ১০০ গ্রাম মাটিতে	মোট ব্যাক্টিরিয়া (সংখ্যা $\times$ ১০⁴)	নাইট্রোজেন বন্ধনকারী ব্যাক্টিরিয়ার (সংখ্যা $\times$ ১০³)	নাইট্রোজেন বন্ধনের পরিমাণ মিলিগ্রাম প্রতি ১০০ গ্রাম মাটিতে
০	০·২৭	৮৯	১০৪	২৬·১
৫	০·২৯	৮৪	১১১	২৮·২
১০	০·২৮	৮৪	৯৭	৩৫·৮
২০	০·১৩	৮০	১২৭	৪১·১
৪০	০·১৭	৮৭	১৪৫	৪৭·১

পরীক্ষার আগে জমিতে জৈব কার্বনের পরিমাণ :
০·৮২ গ্রাম প্রতি ১০০ গ্রাম মাটিতে।

এছাড়া আমাদের দেশে এক নূতন জীবাণু **এজোস্পিরিলাম** নিয়ে গবেষণা হচ্ছে। এই জীবাণুর বৈশিষ্ট্য হল এরা শর্করাকে ভিত্তি করে জন্মাতে অক্ষম। এরা ম্যালেট যৌগের উপস্থিতিতে ভালোভাবে জন্মাতে পারে। তাই তৃণজাতীয়

শস্যের মূল-পরিমণ্ডলে এদের প্রাচুর্য্য দেখা যায়। এদেরও সম্ভাবনাময় নাইট্রোজেন বন্ধনকারী জীবাণু হিসাবে গণ্য করা হচ্ছে।

বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপন্ন **এজোটোব্যাক্টার,** এজোটোব্যাক্টিরিণ নামে পরিচিত। সাধারণতঃ মুক্তজীবী নাইট্রোজেন বন্ধনকারী জীবাণু উৎপাদনের জন্য শর্করা ও মলিবডেনাম যুক্ত নাইট্রোজেন বিহীন পুষ্টি মাধ্যম ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সাধারণ ধাতু ছাড়া এই জীবাণু বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন হয় মলিবডেনামের (Mo^{+6}) এজোটোব্যাক্টার সবাত শ্বসজীবী হওয়ায় এদের উৎপাদনের জন্য অক্সিজেন সরবরাহ রাখতে হয়। সাধারণতঃ কঠিন আগার আগার মাধ্যমে বা তরল মাধ্যমে এরা জন্মাতে পারে। **ক্লেবসিয়েলা** এবং **ডারক্সিয়া গামোসা** উচ্চ নাইট্রোজেন বন্ধন ক্ষমতার অধিকারী হলেও এরা ক্ষীণজীবী। তাই জীবাণুসার হিসাবে **এজোটোব্যাক্টারই** স্বীকৃত। কিন্তু অম্ল মাটিতে **এজোটোব্যাক্টার** ব্যর্থ হলেও সেখানে **ডারক্সিয়া গামোসা** ভাল ফল দিতে পারে। সাধারণতঃ প্রশম বা জিপসাম প্রযুক্ত ক্ষার মাটিতে **এজোস্পিরিলাম** ভালো ফল দেয়।

উদ্ভিদহীন সাধারণ মাটিতে জীবাণুসারের ক্রিয়া খুব আশাপ্রদ হয় না বটে কিন্তু গাছের মূল নির্যাসের (root exudate) প্রাণস্পর্শে এদের ক্ষমতা যথেষ্ট পরিমাণে বেড়ে যেতে দেখা যায়। বিভিন্ন পরীক্ষায় দেখা গেছে ধান, গম এমন কি সব্জি গাছের মূল-পরিমণ্ডলে **এজোটোব্যাক্টারের** সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। সামান্য পরিমাণ নাইট্রোজেন এবং ফসফরাস জাতীয় সারের সহযোগিতায় **এজোটোব্যাক্টার** জীবাণুসার হেক্টর প্রতি বাড়তি ৩০ থেকে ৪০ কিগ্রা. নাইট্রোজেন প্রয়োগের তুল্য পরিমাণ ফলনবৃদ্ধি করতে সক্ষম।

এজোটোব্যাক্টার জীবাণুসার পলিথিন প্যাকেটে পীট বা বোঁদ মাটির সঙ্গে মিশিয়ে বাজারে বিক্রয় করা হয়। এছাড়া উত্তমরূপে গুঁড়ো করা মাটি এবং খামারজাত জৈব উপসারের সঙ্গেও পর্যাপ্ত পরিমাণে **এজোটোব্যাক্টারের** কোষ মিশিয়ে চাষের জমিতে প্রয়োগের উপযোগী করে পণ্য হিসাবে বাজারে বিক্রীত হতেও দেখা যায়। জীবাণু সরাসরি উৎপন্ন করে নিতে পারলে গুড় বা পলি-স্যাকারাইড জাতীয় আঁঠালো পদার্থের সঙ্গে বীজ উত্তমরূপে মিশিয়ে ছায়ায় শুকিয়ে বপনের জন্য জমিতে প্রয়োগ করা যেতে পারে। তবে এ পদ্ধতি অবশ্য শিম্বজাতীয় উদ্ভিদে **রাইজোবিয়াম** জীবাণু প্রয়োগের ক্ষেত্রেই অধিক প্রচলিত। সাধারণতঃ তরল পুষ্টি মাধ্যমে অধিক ক্ষমতাশালী **এজোটোব্যাক্টার** জীবাণুকে

প্রবেশ করানো হয়। সাধারণতঃ উৎপাদন পাত্রের আকার ১০০০-৬০০০ লিটারের মধ্যে হলে পুষ্টি দ্রবণকে নির্বীজ (sterilise) করা হয়, কিন্তু পাত্র অপেক্ষাকৃত বড় হলে তা আর সম্ভব হয় না। আজকাল গভীর পাত্রে বায়ু সঞ্চালন এবং পাত্রকে আলোড়নের ব্যবস্থা রাখা হয়। এর ফলে ব্যাক্টিরিয়া সমানভাবে এবং অধিক-সংখ্যায় জন্মাতে পারে। সাধারণ অগভীর পদ্ধতিতে যেখানে প্রতি মিলি লিটার দ্রবণে (১০-১৫) $\times$ ১০^{৬} সংখ্যক ব্যাক্টিরিয়া উৎপাদন করা সম্ভব সেখানে গভীর প্রকোষ্ঠ পদ্ধতিতে তার শতগুণ অর্থাৎ প্রতি মিলি লিটার দ্রবণে (১০-১৫ $\times$ ১০^{৮} সংখ্যক জীবাণু সৃষ্টি করা যেতে পারে। উৎপাদনের পর জীবাণুকে সেন্ট্রিফিউজ করে অধঃক্ষিপ্ত করা হয়। অতঃপর জীবাণুকে নিম্নচাপে শুষ্ক বরফের সাহায্যে হিম করে উপযুক্ত ধারকের (base) মধ্যে মিশিয়ে প্যাক করা হয়। এই জীবাণু বৎসরাধিক কাল সক্রিয় থাকতে পারে বলে আশা করা যায়।

এজোটোব্যাক্টার অনেক ক্ষেত্রেই আশানুরূপ ফল দেয় না বলে আশাহত হয়েই অনেকে এজোটোব্যাক্টার প্রয়োগের বিরুদ্ধে রায় দেন। কিন্তু এজোটোব্যাক্টারের প্রয়োগে সাফল্য লাভ করলে, সাফল্যের কারণ হিসাবে তার হর্মোন উৎপাদন ক্ষমতা, বা উদ্ভিদ অপকারী জীবাণু নিয়ন্ত্রণ বা এন্টিবায়োটিক উৎপাদনের ফলশ্রুতি বলে ব্যাখ্যা করা হয়। **পরীক্ষায় জানা গেছে পরিমিত পরিমাণ জৈবসার বা স্বল্প পরিমাণ নাইট্রোজেনজাত রাসায়নিক সার এবং মলিবডেনাম প্রয়োগের সঙ্গে এজোটোব্যাক্টার জীবাণুসার প্রয়োগের ফলে লাভজনক পরিমাণে জমিতে অতিরিক্ত নাইট্রোজেন সঞ্চিত হয়।** অর্থাৎ **এজোটোব্যাক্টার** জমিতে নিঃসন্দেহে নাইট্রোজেন বন্ধন করে। বলা বাহুল্য যে উপায়েই হোক **এজোটোব্যাক্টার** গাছের উপকার করে এ বিষয়ে দ্বিমত নেই। কারণ এই সস্তা জীবাণু সার প্রয়োগের ফলে জমিতে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয় না। এবার আমরা **এজোটোব্যাক্টার** প্রয়োগের কয়েকটা পরীক্ষালব্ধ ফলাফল যাচাই করে দেখব। মেহরোত্রা এবং লেহরির (১৯৭১) এক পরীক্ষায় দেখা যায় স্টার্চ জাতীয় দানা শস্যের (cereal) চেয়ে সব্জি জাতীয় শস্যে (vegetable) এজোটোব্যাক্টার অধিক ফলন বৃদ্ধি করেছে।

পরবর্তী পৃষ্ঠায় সোনোরা--৬৪ জাতীয় গমে এজোটোব্যাক্টার প্রয়োগের ফলাফল দেখানো হল :

তালিকা ৭ : গমের ফলনে এজোটোব্যাক্টারের প্রভাব (মেহরোত্রা এবং লেহরি, ১৯৭১)

যে স্থানের মাটি এজোটোব্যাক্টারের উৎস হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে	গম ফলন (কুইন্টাল প্রতি হেক্টরে)		
	প্রযুক্ত সারের পরিমাণ (কেজি প্রতি হেক্টরে)		
	N P K ৬০ ৩০ ৩০	N P K ৯০ ৪৫ ৪৫	N P K ১২০ ৬০ ৬০	N P K ১৫০ ৭৫ ৭৫
এজোটোব্যাক্টার ছাড়া	২৯·৭১	৩৩·৩৬	৩৬·০৬	৩৭·২১
এজোটোব্যাক্টার প্রযুক্ত				
কানপুর (পুরা)	৩০·২৪	৩৩·২২	৩৭·৩৫	৪০·২১
কানপুর (কল্যাণপুর)	২৭·৮৮	৩৫·০০	৩৫·৪৮	৪০·০০

পরিসংখ্যান তাৎপর্যপূর্ণ নয় (Statistically not significant)

আই আর-৮ জাতীয় ধানের উপর এজোটোব্যাক্টার প্রয়োগ কতটা প্রভাব বিস্তার করেছে এবার তা দেখা যাক।

তালিকা ৮ : ধানের ফলনে এজোটোব্যাক্টারের প্রভাব (মেহরোত্রা এবং লেহরি, ১৯৭১)

যে স্থানের মাটি এজোটোব্যাক্টারের উৎস	ধান ফলন (কুইন্টাল প্রতি হেক্টরে)											
	প্রযুক্ত সারের পরিমাণ (কিগ্রা. প্রতি হেক্টরে)											
	F_1			F_2			F_3			F_4		
	N	P	K	N	P	K	N	P	K	N	P	K
	৬০	৩০	৩০	৯০	৪৫	৪৫	১২০	৬০	৬০	১৫০	৭৫	৭৫
এজোটোব্যাক্টার ছাড়া		১৮·৯০			২০·৭০			২৪ ৫০			২৯ ৯০	
এজোটোব্যাক্টার প্রযুক্ত কানপুর (পুরা)		২০ ৫০			২২ ০			২৮ ২০			৩০·৫০	
কানপুর (কল্যাণপুর)		২১·৪০			২৫·০০			২৭·০০			৩৩ ৮০	
যগেশ্বর		২১ ১০			২৫·১০			২৭ ২০			৩০·৯০	
পায়রা (বুন্দেলখণ্ড)		২০ ৬০			২৪·৬০			৩০ ২০			৩০ ১০	

F_3 ছাড়া অন্য পরিসংখ্যান তাৎপর্য্যপূর্ণ নয়।

এবার দেখা যাক বেগুনের (সব্জি) ফলনের উপর এজোটোব্যাক্টারের কেমন প্রতিক্রিয়া হয়েছে।

তালিকা ৯ : সব্জির ফলনে (বেগুন) এজোটোব্যাক্টারের প্রভাব (মেহরোত্রা এবং লেহরি, ১৯৭১)

যে স্থানের মাটি এজোটোব্যাক্টারের উৎস	বেগুন মোট উৎপাদন ছয়বার তোলার ভিত্তিতে (টন প্রতি হেক্টরে) প্রযুক্ত সারের মাত্রা (কিগ্রা. প্রতি হেক্টরে)		
	N P K ২০ ১০ ১০ + ৭৫০০ কিগ্রা. খামারজাত উপসার	N P K ৮০ ৪০ ৪০ + ১৮৭৫০ কিগ্রা. খামারজাত উপসার	N P K ১৫০ ৭০ ৭০ + ৩০,০০০ কিগ্রা. খামারজাত উপসার
এজোটোব্যাক্টার ছাড়া	১০·৩৯৪	১১·১০২	১৪·০৫০
তরাই	১৩·৩৫২	১৫·৭৮৯	১৬·৫৭০
পায়রা (বুন্দেলখণ্ড)	১০·৮০৯	১৫·৮৭২	১৯·৯৯৭
যশোহর	১৩·৯৭৭	১৬·২০৬	১৬·৮৯৩
পুনা	১৪·৫২৯	১৩·২৬৯	১৪·২২৭

পরিসংখ্যান তাৎপর্য্যপূর্ণ নয়।

পরিশেষে বাঁধাকপির উপর এজোটোব্যাক্টার প্রয়োগের ফলাফল দেখা যাক।

তালিকা ১০ : সব্জির ফলনে (বাঁধাকপি) এজোটোব্যাক্টারের প্রভাব
(মেহরোত্রা এবং লেহরি, ১৯৭১)

যে স্থানের মাটি এজোটোব্যাক্টারের উৎস হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে	বাঁধাকপি ফলন (টন প্রতি হেক্টরে)		
	প্রযুক্ত সারের পরিমাণ (কিগ্রা. প্রতি হেক্টরে)		
	N P K ৯০ ৫৬ ১৫	N P K ১৮০ ১১ ৩০	N P K ৩৬০ ২২৪ ৬০
	+ ২২,০০০ কিগ্রা. সার প্রতি হেক্টরে প্রতি ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা হয়েছে		
এজোটোব্যাক্টার ছাড়া	৪৬·৯৭৩	৫০·১৬২	৬৪·৮২৭
যশোর	৬৪·৮৬৬	৬১·১৮৩	৬৫·৭১৬
পুনা	৫৬·৩৩৯	৬৯·৭২৬	৭০·৬৬০
কানপুর	৬১·৮৬৬	৬৫·৪৭১	৭৫·১৮৭
বুন্দেলখণ্ড (কাবার)	৫১·৯৪৫	৫৬·৪৫৫	৮১·৮৭৫
তরাই	৬৬·৫২৭	৫৮·১৭২	৭৬·১০৪
বুন্দেলখণ্ড (পায়রা)	৫৩·১০৬	৫৮·১৬১	৭৭·৫৭৬
আই-এ-আর-আই	৫২·২১৭	৬৩·৬০৫	৬৬·৪০৪
পার্বত্য	৫১·৬০৬	৬৭·৮৩৮	৭৪·৫৭৬
কানপুর (পুবা)	৬০·১৫০	৬৪·৪১০	৭০·৭৭১
কানপুর (কল্যাণপুর)	৫৫·৬০৬	৬৭·৮২৭	৭২·৩৪৮
করিয়াল	৫৯·৮২৭	৬৯·১৮২	৭১·১৩৭

এই পরীক্ষায় পরিসংখ্যান তাৎপর্য্যপূর্ণ হয়েছে।

অতএব পরিসংখ্যানের বোঝা না বাড়িয়ে বোধহয় এর থেকেই আমরা নিঃসন্দেহে মেনে নিতে পারব যে মুক্তজীবী নাইট্রোজেন বন্ধনকারী জীবাণুর ভূমিকা কৃষিক্ষেত্রে অবশ্যই আছে। তাই নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করা চলে যে কৃষিজমিতে এদের প্রয়োগ লাভজনক হবেই।

জীবাণুসার হিসাবে সহজীবী নাইট্রোজেন বন্ধনক্ষম জীবাণু

১০

সহযোগিতাপূর্ণ সহাবস্থান প্রকৃতিরই নিয়ম। তাই এই নীতি অনুসরণ করে বহুশ্রেণীর জীবাণু উদ্ভিদ এবং প্রাণী স্বচ্ছন্দে প্রকৃতিতে তার অস্তিত্ব বজায় রেখে টিকে আছে। এরকম একটা পরিচিত উদাহরণ হল শিম্ব, কড়াই বা শুঁটি জাতীয় উদ্ভিদ (leguminous plant) এবং **রাইজোবিয়াম** জীবাণু। শিম্ব জাতীয় প্রজাতিগুলির মধ্যে বেশ কয়েকটিকেই মানুষ চাষ করে থাকে প্রধানতঃ পশুখাদ্য এবং মানুষের প্রোটিনের প্রয়োজনে। আমরা এই শ্রেণীর গাছের ফলকে প্রোটিন সমৃদ্ধ বলেই জানি এবং তা সত্যি। প্রোটিনের মূল উপাদান নাইট্রোজেন, যা কোষে অ্যামাইনো এ্যাসিড গঠন করে প্রোটিনে পরিণত হয়। জমিতে সার প্রয়োগের রীতি মানুষ সভ্য হবার পরেই এসেছে, কিন্তু তখন কে মিটাত শিম্ব জাতীয় গাছের বিপুল নাইট্রোজেনের চাহিদা ? বলা বাহুল্য বর্তমানেও এই শ্রেণীর উদ্ভিদ চাষের জন্য নাইট্রোজেন জাত সারের চাহিদা ন্যূনতম। **তবে এ রহস্যের অন্তরালে কে ?**

একটা ৩-৪ সপ্তাহের সতেজ শিম্ব জাতীয় চারাগাছকে সযত্নে মাটি থেকে তুলে এনে তার মূল লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে সেখানে রয়েছে অসংখ্য ছোট বড় নানা রকমের গোল বা উত্তল ঈষৎ লালাভ, সবুজ বা বেগুনী বর্ণের গুটি বা অর্বুদ। এই গুটিগুলিকে শিকড়ের প্রান্ত থেকে সযত্নে কেটে অল্প জলে রেখে গুটির মাঝ বরাবর কাটলে অতিদ্রুত জলকে ঘোলা হয়ে যেতে দেখা যাবে। সম্ভব হলে এই জলীয় দ্রবণের একটা বিন্দুকে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করলে বিচিত্র আকৃতির ব্যাক্টিরিয়া দেখা যাবে। **এরাই হল রাইজোবিয়াম জীবাণু যারা গুটির মধ্যে বাসা বেঁধে নাইট্রোজেন বন্ধন করে।**

এই সহযোগিতাপূর্ণ সহাবস্থান অবশ্য **রাইজোবিয়াম**—শিম্ব জাতীয় উদ্ভিদের একচেটিয়া নয়। এছাড়া শেওলা ও ছত্রাক (লাইকেন), এজোলা নামক

জলজ ফার্ন এবং নীল সবুজ শেওলা, ব্যাপ্তবীজি বনজ উদ্ভিদ এবং মাইকোরাইজা নামে একশ্রেণীর ছত্রাকের মধ্যেও এই জাতীয় সহাবস্থান দেখা যায়।

শিম্ব জাতীয় গাছে অর্বুদ বা গুটি আবিষ্কারের পর থেকেই পরীক্ষাগারে এবং কৃষিক্ষেত্রে **রাইজোবিয়ামের** সম্মানজনক আসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৮৮ সালে বায়ারিঙ্ক (Beijerinck) প্রথম এই গুটি থেকে **রাইজোবিয়াম** জীবাণু নিষ্কাশনে সমর্থ হন (হলসওয়ার্থ, ১৯৫৮) এরপর থেকেই শুরু হয় এই জীবাণুকে কৃষিক্ষেত্রে প্রয়োগ করে ফলনবৃদ্ধির উদ্যোগ। কিন্তু বলা বাহুল্য সেই আদিম উদ্যোগে সাফল্য আসে নি। এই অসাফল্যের কারণ চিহ্নিত করতে গেলে **রাইজোবিয়াম** জীবাণু এবং শিম্ব জাতীয় গাছের সহযোগিতাপূর্ণ সহাবস্থান সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানের অপ্রতুলতার কথাই উল্লেখ করতে হয়। পরবর্তী যুগে অবশ্য এ সম্বন্ধে প্রচুর গবেষণা হওয়াতে আমাদের জ্ঞানের পরিধি অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। **রাইজোবিয়ামের** কার্যকর ভূমিকা আজ সর্বজন স্বীকৃতি লাভ করেছে। **রাইজোবিয়ামের** কার্যকর ভূমিকা সম্বন্ধে নিশ্চিত হবার পর সুনির্বাচিত উচ্চমানের জীবাণুকে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদন করা হচ্ছে এবং তা জমিতে প্রয়োগ করে আশানুরূপ সাফল্য লাভ করা যাচ্ছে। তবু এদের থেকে আরও ভাল ফললাভের জন্য গবেষণার কাজে এতটুকু ভাঁটা পড়ে নি।

উদ্ভিদ শ্রেণী এবং রাইজোবিয়াম প্রজাতি

লেগুমিনোসি (*Leguminosae*) পরিবারের প্রায় ১২,০০০ প্রজাতির মধ্যে মাত্র শতেক প্রজাতিকে আমাদের খাদ্যশস্য বা পশুখাদ্য হিসাবে চাষ করা হয়। এরা মুখ্যতঃ প্যাপিলিওনইডি (Papilionoideae) উপপরিবারের অন্তর্ভুক্ত। এরা প্রায় সকলেই মূলে গুটি উৎপন্ন করে, যেখানে **রাইজোবিয়াম** জীবাণু অবস্থান করে বায়ুমণ্ডলীয় নাইট্রোজেন বন্ধন করে।

ইউব্যাক্টিরিয়েলস পর্বের অন্তর্গত রাইজোবিয়েসি (*Rhizobiaceae*) পরিবারের তিনটি গণের অন্যতম মুখ্য গণ হল **রাইজোবিয়াম**। এই পরিবারের অন্য এক সদস্য **এগ্রোব্যাক্টিরিয়াম**—এরা উদ্ভিদের মূলে গুটি উৎপন্নকারী **রাইজোবিয়ামের** সাথেই প্রবেশ করে রোগ উৎপন্ন করতে পারে। এরা নাইট্রোজেন বন্ধন করতে অক্ষম। এছাড়া এই পরিবারের অন্য সদস্য **ক্রোমাটিয়াম** কিন্তু মাটি বা জলে মুক্তজীবী হিসাবে বসবাস করে। তাই দেখা যাচ্ছে রাইজোবিয়েসি

পরিবারের মধ্যে **রাইজোবিয়াম** জীবাণুই শিম্ব জাতীয় গাছের মূলে প্রবেশ করে বাসা বাঁধে এবং নাইট্রোজেন বন্ধন করে। গুটির মধ্যে বসবাসকারী সক্রিয় নাইট্রোজেন বন্ধনকারী **রাইজোবিয়াম** জীবাণুর আকৃতি অনিয়তাকার, অসম এবং অনির্দিষ্ট হয়ে থাকে। এদের বলে ব্যাক্টিরয়েড। কিন্তু এদের যখন পরীক্ষাগারে কৃত্রিম পুষ্টিমাধ্যমে জন্মানো হয় তখন এদের পরিচয় হল গ্রাম ঋণাত্মক, স্পোরগঠনে অক্ষম, সবাত শ্বসজীবী ০·৫-১·০ মাইক্রোমিটার চওড়া এবং ১·২-৩·০ মাইক্রোমিটার লম্বা রড আকৃতি বিশিষ্ট। পরীক্ষাগারে এরা নানাবিধ কার্বনজাত পদার্থ থেকে প্রয়োজনীয় শক্তি সংগ্রহ করে বেঁচে থাকতে পারে। কিন্তু সেক্ষেত্রে তারা নাইট্রোজেন বন্ধন করতে পারে না। এই বিশেষ পরিস্থিতিতে এদের জন্মানোর জন্য নাইট্রোজেনের উৎস হিসাবে প্রয়োজন হয় অ্যামোনিয়াম বা নাইট্রেট লবণের। অবশ্য বর্তমানে রাইবোজ শর্করাকে কার্বন উপাদান হিসাবে প্রয়োগ করে এই **রাইজোবিয়াম** জীবাণু দ্বারা কৃত্রিম মাধ্যমে নাইট্রোজেন বন্ধন করানো সম্ভব হয়েছে। এইসব সাধারণ উপাদান ছাড়াও **রাইজোবিয়াম** জন্মানোর জন্য কতকগুলি 'বি' ভিটামিনের প্রয়োজন হয়। এগুলি হল বায়োটিন, থায়ামিন, রিবোফ্লেভিন এবং পেন্টোথেনিক অ্যাসিড। **রাইজোবিয়াম** জীবাণুর নিকটতম প্রতিবেশী হল **এগ্রো-ব্যাক্টিরিয়াম রেডিওব্যাক্টার।** এরা প্রায় সবদিক থেকেই **রাই-জোবিয়ামের** খুব সন্নিকটবর্তী। তবে পরীক্ষাগার পদ্ধতিতে এদের পৃথকী-করণের মূল ভিত্তি হল এরা অতিরিক্ত ক্ষারত্বে (pH, ১১-১৩) জন্মাতে পারে। কিন্তু এই প্রবল ক্ষারত্বে **রাইজোবিয়াম** জন্মায় না। অন্যান্য রাসায়নিক, শরীরতাত্ত্বিক, বা কৃষ্টি পরীক্ষা দ্বারা কিন্তু আজ পর্যন্তও নিশ্চিতভাবে **রাই-জোবিয়ামকে** সনাক্ত করার পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয় নি। তাই **রাইজোবিয়াম** সনাক্ত করণের সর্বশেষ নিশ্চিত পরীক্ষা হল শিম্ব জাতীয় গাছে তাদের গুটি উৎপাদন এবং এইসঙ্গে সক্রিয় নাইট্রোজেন বন্ধন। শিম্ব জাতীয় শ্রেণীর যে কোন গাছ যে কোন **রাইজোবিয়াম** জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয় না। প্রকৃত-পক্ষে বিশেষ এক শ্রেণীর **রাইজোবিয়ামের** অর্বুদক গুটি সৃষ্টির ক্ষমতা বিশেষ এক শ্রেণীর শিম্ব জাতীয় গাছের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এই ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছে বিপ্রতীপ প্রয়োগ শ্রেণী (Cross inoculation group)। বিপ্রতীপ শ্রেণীর বাইরে কোন এক শ্রেণীভুক্ত **রাইজোবিয়াম** জীবাণু

সচরাচর অন্য শ্রেণীর উদ্ভিদে অর্বুদ সৃষ্টি করে না, কিন্তু এর বিপরীত ঘটনার দৃষ্টান্তও বিরল নয়। সাধারণতঃ যখন কোন শিম্ব জাতীয় উদ্ভিদ বিপ্রতীপ শ্রেণীর বাইরে কোন রাইজোবিয়াম জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয় তখন তারা সাধারণতঃ নাইট্রোজেন বন্ধনে ব্যর্থ হয়ে থাকে। বিপ্রতীপ শ্রেণীর সংজ্ঞা দিতে গেলে বলতে হয়, এরা হল একদল শিম্ব জাতীয় উদ্ভিদ প্রজাতি যাদের যে কোন একটির মূলের গুটির রাইজোবিয়াম জীবাণু, ঐ শ্রেণীভুক্ত অপর গাছকে আক্রমণ করে মূলে গুটি উৎপন্ন করতে পারে এবং সক্রিয়ভাবে নাইট্রোজেন বন্ধন করতে পারে। মোট প্রায় ২০টি এ ধরনের শ্রেণীকে চিহ্নিত করা হলেও নিশ্চিতভাবে সাতটি শ্রেণীই স্বীকৃতি লাভ করেছে। এর মধ্যে আবার মাত্র ছয়টি শ্রেণীকেই যথেষ্ট পার্থক্য বজায় রেখে সনাক্ত করা যায়।

বলা বাহুল্য এই শ্রেণীবিভাগ মোটেই ত্রুটিমুক্ত নয়। যেমন সয়াবীন এবং বরবটির রাইজোবিয়াম জীবাণু ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত হলেও এরা একে অপরকে আক্রমণ করে মূলে গুটি উৎপন্ন করতে পারে। বিপরীতক্রমে একই জীবাণু তাদের নির্দেশিত শ্রেণীর বাইরে অন্য শ্রেণীকে আক্রমণ করে। এরকম একের সঙ্গে অন্যের সমপতিত শ্রেণী (Over lapping) বা বিশৃঙ্খলাসম্পন্ন সহাবস্থান (Symbiotic promiscuity) মূলক শ্রেণীবিন্যাস সঙ্গত কারণেই বিপ্রতীপ প্রয়োগ শ্রেণীর নিশ্চয়তা সম্বন্ধে সন্দেহের উদ্রেক করে। তাই ১৯৩৯ সালের পর থেকেই নূতন শ্রেণীর আবিষ্কার সংক্রান্ত গবেষণা প্রায় স্তব্ধ হয়ে গেছে। বর্তমানে রাইজোবিয়াম বিশেষজ্ঞগণ জীবাণুর বংশবৃদ্ধির হার, অম্লত্ব উৎপাদন, শোণিতবিদ্যা (Serology), ডি. এন. এ-তে নাইট্রোজেন ঘটিত উপাদানের অনুপাত, সাংখ্যিক শ্রেণীবিন্যাস (Numerical taxonomy), ডি. এন. এ. সংকরায়ণ (DNA hybridisation) এবং (Phage) প্রতিরোধ ক্ষমতা ; এইসব পরীক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করছেন। বিগত চারদশকে আর কোন নূতন রাইজোবিয়াম প্রজাতি আবিষ্কৃত হয় নি। বর্তমানে নূতন আবিষ্কৃত রাই-জোবিয়াম জীবাণুকে চিহ্নিত করা হয় তার আশ্রয়দাতার ভিত্তিতে। একটা তালিকাতে শিম্ব জাতীয় গাছ (বিপ্রতীপ প্রয়োগ শ্রেণী) এবং তার সঙ্গে যুক্ত রাইজোবিয়াম প্রজাতিকে পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখানো হল।

তালিকা ১ঃ রাইজোবিয়ামের শ্রেণীবিন্যাস (বার্টন, ১৯৭৯)

বিপ্রতীপ প্রয়োগ শ্রেণী	রাইজোবিয়াম প্রজাতি	অনুপোষক প্রজাতি-
আলফা আলফা	রাইজোবিয়াম মেলিলোটি *Rhizobium meliloti*	মেডিকাগো Medicago মেলিলোটাস Melilotus ট্রাইগোনেলা Trigonella
ক্লোভার	রা. ট্রাইফোলিআই *R. trifolii*	ট্রাইফোলিয়াম Trifolium
মটর	রা. লেগুমিনোসেরাম *R. leguminosarum*	পিসাম (Pisam) ভিসিয়া (Vicia) ল্যাথাইরাস (Lathyrus) লেন্স (Lens)
বীন	রা. ফ্যাজিওলি *R. Phaseoli*	ফ্যাজিওলাস Phaseolus
লুপিন	রা. লুপিনি *R. lupini*	ল্যুপিনাস (Lupinus) অর্নিথোপাস Ornithopus
সয়াবীন	রা. জ্যাপোনিকাম *R. japonicum*	গ্লাইসিন Glycine
বরবটি	অপ্রতিষ্ঠিত	ভিগনা (Vigna)) এরাকিস (Arachis) ফ্যাজিওলাস Phaseolus ক্রোটালারিয়া Crotalaria লেসপেডেজা Lespedeza

শিম্ব জাতীয় গাছের মূলে যে গুটি উৎপন্ন হয় তা নানা প্রজাতির ক্ষেত্রে নানা আকৃতিবিশিষ্ট হয়ে থাকে। যেমন সাদা এবং লাল ক্লোভার-এ বড় আকৃতির উর্দ্ধমুখী (club shaped) গুটি দেখা যায়, আলফা আলফা গাছে গুটিগুলি আবার দ্বিধাবিভক্ত লম্বাটে আকারের, কিন্তু বরবটি, মটর ধইঞ্চা এবং লীমবীনে গোলাকার গুটি দেখা যায়। আকারের দিক থেকে কোন গুটি বেশ বড় আবার কোন কোন প্রজাতির গাছে গুটির ব্যাস মাত্র কয়েক মিলিমিটার হয়ে থাকে। গুটি যে আকৃতিরই হোক না কেন সাধারণতঃ প্রধান মূলে (tap root) যুক্ত গুটির আকার একটু বড় হয় কিন্তু শাখা-মূলে যুক্ত গুটিগুলি আকারে একটু ছোট এবং সংখ্যায় বেশী থাকে। শিম্ব জাতীয় গাছে গুটি উৎপন্ন হলেই তা সক্রিয় নাইট্রোজেন বন্ধনের সঙ্গে জড়িত, তা মনে করার কারণ নেই। সাধারণতঃ বড় বা মাঝারি, উত্তল, চ্যাপ্টা বা প্রায় গোলাকার ঈষৎ লালাভ, বেগুনী বা সবুজাভ বর্ণের গুটি গুলিই প্রকৃত রাইজোবিয়ামের গুটি। বিশেষজ্ঞরা এই গুটি দেখেই এদের কার্যক্ষমতা সম্বন্ধে অনেকটা ধারণা করতে পারেন।

পরবর্তী সমস্যা হল লেগুমিনেসি পরিবারে সব গণ বা প্রজাতির মূলে গুটি দেখা যায় না। সিসালপিনিওইডি (Caesalpinioideae) উপপরিবারের অধিকাংশ গণ এবং প্রজাতির গাছে বহুপ্রচেষ্টা চালিয়েও গুটি উৎপাদন করা সম্ভব হয় নি।

কোন শিম্ব জাতীয় গাছের মূলে কিভাবে জীবাণু প্রবেশ করে গুটি উৎপন্ন করে তা সত্যি এক রহস্যময় অধ্যায়। **রাইজোবিয়াম** হল মাটির জীবাণু। সাধারণ মাটিতে এদের সংখ্যা ১০—১,০০,০০০ পর্যন্ত হতে পারে। কিন্তু কোন জমিতে দীর্ঘকাল ধরে শিম্ব জাতীয় গাছের চাষ না করা হলে সে জমি থেকে **রাইজোবিয়াম** সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হতে পারে। পক্ষান্তরে কোন জমিতে প্রায় প্রতিবৎসর এই জাতীয় উদ্ভিদের চাষ করা হলে, সেই জমিতে সক্রিয় **রাইজোবিয়াম** জীবাণুর সংখ্যা অনেক বেড়ে যাবে। পরীক্ষাগারে উৎপন্ন **রাইজোবিয়াম** বড় আকৃতি বিশিষ্ট হলেও গুটির মধ্যে অবস্থানকারী জীবাণু 'ব্যাক্টিরয়েড' বিষম আকৃতির হয়ে থাকে তা আগেই আলোচিত হয়েছে। সচরাচর বড় আকৃতির জীবাণু পরীক্ষাগারে নাইট্রোজেন বন্ধন করতে পারে না। পরীক্ষাগারে পুষ্টিদ্রবণে গ্লুকোসাইড বা উপক্ষার (alkaloid) যোগ

করে ব্যাক্টিরয়েড আকৃতি বিশিষ্ট জীবাণু পাওয়া যায় বটে, তবে তারাও মুক্তজীবী জীবাণুর মত নাইট্রোজেন বন্ধনে অক্ষম। অর্থাৎ এইসব পরীক্ষা-লব্ধ ফলাফলের উপর ভিত্তি করে বলা চলতে পারে যে **রাইজোবিয়াম** জীবাণুর ক্ষেত্রে শিম্ব জাতীয় উদ্ভিদের সহাবস্থান অপরিহার্য। কারণ অন্য কোন শ্রেণীর উদ্ভিদের **রাইজোবিয়াম** গুটি সৃষ্টি করে না বা নাইট্রোজেন বন্ধনও করে না। এ থেকে এটা স্পষ্ট হয় যে প্রাকৃতিক নিয়মে নিজের তাগিদেই শিম্ব জাতীয় উদ্ভিদ বিশেষ কোন উদ্দীপক পদার্থ নির্গত করে, যা **রাইজোবিয়ামকে** স্বাগত জানায় এবং **রাইজোবিয়াম** এই ডাকে সাড়া দেয়। শিম্ব জাতীয় উদ্ভিদের প্রতি **রাইজোবিয়াম** কিভাবে আকৃষ্ট হয়ে গুটি উৎপন্ন করে তার একটা সম্ভাব্য পথ সংকেত দেখা যাক।

সাধারণ মূলরোম থেকে বিশেষ ধরনের জৈব পদার্থ নির্গত হয়।

↓

ফলে গাছের মূলের চারপাশে **রাইজোবিয়াম** আকৃষ্ট হয়।

↓

এই জীবাণুরা সম্ভবতঃ ট্রিপটোফ্যান নামক অ্যামাইনো এ্যাসিড থেকে ইনডোল অ্যাসিটিক এ্যাসিড উৎপন্ন করে।

↓

ফলে মূলরোম কুঞ্চিত হয়ে পড়ে।

↓

এরপর সম্ভবতঃ **রাইজোবিয়ামের** বিশেষ কোন পলিস্যাকারাইড এবং ক্রোমোজোমের ছিন্ন অংশ মূলরোমের ছিদ্রপথে শিম্ব জাতীয় গাছের মূলে প্রবেশ করে।

↓

এই পলিস্যাকারাইড সম্ভবতঃ উদ্যোগী হয়ে জীবাণু প্রবেশের পথ তৈরি করতে সচেষ্ট হয়।

↓

এরপর জীবাণু সম্ভবতঃ পলিগ্যালাক্টরোনেজ নামক উৎসেচক রস উৎপাদন

করে গাছকে উদ্দীপিত করে এবং কোষ প্রাচীরের পেকটিন জাতীয় পদার্থকে বিশ্লিষ্ট করে।

↓

এরপর **রাইজোবিয়াম** গাছের কোষ প্রাচীরে প্রবেশ করে।

↓

এরপর মূলরোমের কোষগুলি আক্রমণকারী জীবাণু প্রবেশের প্রাথমিক সূত্রাকৃতি পথ করে দেয়।

↓

এই সূত্রাকৃতি পথে রড আকৃতির **রাইজোবিয়াম** প্রবেশ করে এবং এই পথের সঙ্গে মূলরোমের মধ্যে এগিয়ে চলে।

↓

এই সূত্রাকার পথ মূলের বহিরাবরণের কোষগুলি ভেদ করে অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং সেখান থেকে বিভক্ত হয়। অবশেষে দ্বিগুণ ক্রোমোজোম যুক্ত গুটি সৃজনকারী মূলকোষে প্রবেশ করবার পর সূত্রাকার পথ থেকে **রাইজোবিয়াম** বেরিয়ে আসে এবং উক্ত কোষগুলিকে দ্রুত বৃদ্ধিতে প্রবৃত্ত করে। ফলে মূল ফুলে উঠে গুটির সৃষ্টি হয়। গুটি সৃষ্টির একই সঙ্গে গুটির ভিতরে **রাইজোবিয়াম** রূপান্তরিত হয়ে বিষম আকৃতি ব্যাক্টিরয়েডে পরিণত হয়। এই ব্যাক্টিরয়েড গুটিতে বায়ুমণ্ডলীয় নাইট্রোজেন বন্ধন করে। কিন্তু **রাইজোবিয়ামের** সব প্রজাতি সমান দক্ষতার সঙ্গে নাইট্রোজেন বন্ধন করতে পারে না। এই দক্ষতার ভিত্তিতে নির্বাচিত জীবাণু গুটি থেকে আহরণ করা হয়। এই গুটি চারাগাছ জন্মানোর প্রায় দুই থেকে তিন সপ্তাহের পর থেকে দেখা যায়। গুটি আহরণের শ্রেষ্ঠ সময় হল সতেজ গাছের ক্ষেত্রে চার থেকে ছয় সপ্তাহ বয়সের মধ্যে। গাছের ফুল আসার পর থেকে এই গুটি কমে যেতে দেখা যায় এবং ফল পরিপক্ক হওয়ার আগেই গুটি থেকে সব জীবাণু বেরিয়ে আবার মাটিতে চলে যায়। এই ঘটনার জন্য কি কি রাসায়নিক প্রক্রিয়া সক্রিয় ভূমিকা নেয় এ সম্বন্ধে যথেষ্ট গবেষণা হয় নি। সাধারণতঃ অদক্ষ বা অপ্রয়োজনীয় গুটি সংখ্যায় বেশী এবং ছোট আকারের হয়ে থাকে। সচরাচর

দেখা যায় একটা মাত্র **রাইজোবিয়াম** প্রজাতিও একটা গাছের প্রয়োজনের সব চাহিদা মেটাতে অক্ষম। বস্তুতঃপক্ষে একই গাছে একাধিক প্রজাতির জীবাণুর সম্মিলিত ক্রিয়ায় ভাল ফল দিতে দেখা গেছে। বিপরীতক্রমে একগাছের সক্রিয় নাইট্রোজেন বন্ধনকারী **রাইজোবিয়াম** অন্য শ্রেণীর শিম্ব জাতীয় গাছে পর-জীবীর ভূমিকা নেয়। কিন্তু বর্তমানে পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে উদ্ভিদ **রাইজোবিয়ামের** নাইট্রোজেন বন্ধন ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে। কারণ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় গাছ **রাইজোবিয়ামকে** পর্যাপ্ত পরিমাণে শর্করা জাতীয় পদার্থ সরবরাহে ব্যর্থ হয়। তাই উচ্চ সালোক সংশ্লেষক্ষম প্রজাতির উদ্ভিদে এই সহাবস্থান (Symbosis) দ্বারা আরো ভালো ফল আশা করা যায়। প্রকৃত পরীক্ষায় দেখা গেছে **রাইজোবিয়াম জ্যাপোনিকাম,** সয়াবীন গাছের প্রয়োজনীয় শতকরা ৭৫ ভাগের বেশী নাইট্রোজেন সরবরাহ করতে অক্ষম। সয়াবীন বিশেষজ্ঞগণ সয়াবীনের সালোক সংশ্লেষের হার এবং নাইট্রোজেন বন্ধনের পরিমাণ বাড়ানোর চেষ্টা করছেন।

প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিবেশ, **রাইজোবিয়াম** এবং শিম্ব জাতীয় শ্রেণীর সম্মিলিত ক্রিয়ায় বিঘ্ন ঘটায়। সাধারণতঃ যে তাপমাত্রা উদ্ভিদের পক্ষে ক্ষতিকারক নয়, সেই পাল্লার তাপমাত্রাতে **রাইজোবিয়াম** জীবাণু শিম্ব জাতীয় গাছে গুটি উৎপন্ন করে এবং সক্রিয়ভাবে নাইট্রোজেন বন্ধন করে। কিন্তু অতিরিক্ত তাপমাত্রা এবং অতিরিক্ত শৈত্য, **রাইজোবিয়ামের** ক্রিয়ায় বিঘ্ন সৃষ্টি করে। দিনরাতের দৈর্ঘ্য এবং আলোর প্রখরতার উপরও গুটি উৎপাদন এবং নাইট্রোজেন বন্ধন ক্ষমতা নির্ভরশীল। **রাইজোবিয়াম** জীবাণুর স্পোর গঠনের ক্ষমতা নেই বলে প্রতিকূল পরিবেশে সংগ্রাম চালানোর ক্ষমতা এদের অনেক কম। তার উপর **রাইজোবিয়াম** জীবাণুর বড় শত্রু হল ফাজ (ভাইরাস)। একই জমিতে একই **রাইজোবিয়াম** প্রজাতি বার বার প্রয়োগ করা হলে তা সহজেই ফাজের শিকারে পরিণত হয়। সেই পরিস্থিতিতে অন্য **রাইজোবিয়াম** প্রজাতিকে কাজে লাগানো যুক্তিযুক্ত। নাইট্রেট পর্যায়ের নাইট্রোজেন **রাইজোবিয়ামের** নাইট্রোজেন বন্ধনে বিপরীত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। নাইট্রেট প্রয়োগের ফলে ব্যাক্টিরয়েডের আকার বৃদ্ধি পায় কিন্তু পক্ষান্তরে নাইট্রোজেন বন্ধন ক্ষমতা হ্রাস পায়। সম্ভবতঃ, নাইট্রেট গাছে **রাইজোবিয়ামের**

প্রবেশপথ গঠনে বাধাসৃষ্টি করে। ইউরিয়া প্রয়োগের ফলেও গুটি উৎপাদন ব্যাহত হয় বলে জানা গেছে।

কিন্তু ঐ পরিস্থিতিতে শর্করার দ্রবণ ছিটালে গুটি উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। প্রধানতঃ ইক্ষুশর্করা বা সুক্রোজ, ম্যানিটল এবং এলএ্যারাবিনোজ উল্লেখযোগ্য ফল দেয়। সাধারণতঃ নাইট্রেট লবণ গাছের মূলের কোন অংশ কেটে, সেখান দিয়ে প্রয়োগ করলে গুটি তৈরির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয় না। মূলে নাইট্রেট প্রয়োগের ফলে সম্ভবতঃ তা নাইট্রেট থেকে নাইট্রাইটে পরিণত হয়। এই উৎপন্ন নাইট্রাইট সম্ভবতঃ ইনডোল অ্যাসিটিক এ্যাসিডকে নষ্ট করতে পারে। সাধারণতঃ **রাইজোবিয়ামের** অনুপ্রবেশের জন্য ইনডোল অ্যাসিটিক এ্যাসিডের সংকট পরিমাণ হল $১০^{-৮}$ মোল। নাইট্রেট প্রয়োগের ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া ঐ পরিমাণ আই-এ-এ প্রয়োগ করে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। এ থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে **রাইজোবিয়াম** জীবাণুর ক্রিয়া ইনডোল অ্যাসিটিক এ্যাসিড দ্বারা অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত হয়।

একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে **রাইজোবিয়াম** জীবাণুর প্রভাব, শিম্ব জাতীয় উদ্ভিদের উপর বৈজ্ঞানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত। বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যে পরিমাণ শিম্ব জাতীয় গাছের চাষ করা হয় তার একটা সম্ভাব্য তালিকা প্রকাশ করা হল।

তালিকা ২ : বিশ্বে শিম্ব জাতীয় উদ্ভিদ চাষের পরিমাণ (বার্টন, ১৯৭৯)

উদ্ভিদ		কৃষি জমির পরিমাণ (হেক্টর × $১০^{৩}$)
সয়াবীন	গ্লাইসিন ম্যাক্স (*Glycine max*)	৩৭,৫০০
চীনাবাদাম	এরাকিস হাইপোজিয়া (*Arachis hypogaea*)	১৮,০০০

উদ্ভিদ		কৃষি জমির পরিমাণ (হেক্টর × ১০^{৩})
বাকলা	ফ্যাজিওলাস ভালগারিস (*Phaseolus vulgaris*)	২২,২৭৯
ছোলা	সিসার অরিত্রটিনাম (*Cicer arietinum*)	১০,৫৪৩
মটর	পিসাম স্যাটিভাম (*Pisum sativum*)	৯,২৬৪
বরবটি	ভিগনা আনগুইকালাটা (*Vigna unguiculata*)	৪,৯৫৩
বাকলা	ভিসিয়া ফাবা (*Vicia faba*)	৪,৬৮৩
অড়হর	ক্যাজানাস ক্যাজান (*Cajanas cajan*)	২,৫৮৭
আংকারী	ভিসিয়া প্রজাতি (*Vicia sp.*)	১,৮৭৯
মসুর	লেন্স এসকুলেণ্টা (*Lens esculenta*)	১,৭১৭
লুপিন	লুপিনাস প্রজাতি (*Lupinus sp.*)	১,০৪২
অন্যান্য		৬,৩২৪
	মোট	১২০,৭৭১

পরবর্তী পৃষ্ঠার তালিকায় দেখা যাচ্ছে একটা মরশুমে বিভিন্ন শিম্ব প্রজাতির সার্থকভাবে ফলন হলে হেক্টর প্রতি কি পরিমাণ নাইট্রোজেন সাশ্রয় হয়।

তালিকা ৩ঃ শিম্ব জাতীয় চাষের ফলে নাইট্রোজেন সাশ্রয় (সংগৃহীত)

শিম্ব জাতীয় উদ্ভিদ	হেক্টর প্রতি নাইট্রোজেন বন্ধনের পরিমাণ (কিগ্রাতে)
আলফা আলফা (পশুখাদ্য)	২১৭·২৮
মিষ্টি ক্লোভার	১৩৩ ২৮
সাদা ক্লোভার	১১৫·৩৬
সয়াবীন	৬৪·৯৬
মটর	৮০·৬৪
বরবটি	১০০·৮
বীন	৪৪·৮
মসুর	১১৫·৩৬
পশুখাদ্য বিশেষ	১১৮·৭২

ভারতে নাইট্রোজেন বন্ধনের পরিমাণ হেক্টর প্রতি জমিতে ৫৬-১৬৮ কিগ্রা. হতে দেখা গেছে। আই. এ. আর. আই. দিল্লীতে এক পরীক্ষায় দেখা যায় হেক্টর প্রতি শন (sunhemp) এবং বরবটি প্রত্যেকে ১০০·৮ কিগ্রা. বারসীম ১৩৪·৪ কিগ্রা. এবং অরহর ১৫৬·৮ কিগ্রা. নাইট্রোজেন বন্ধন করেছে।

সাধারণতঃ সব মাটিতেই নাইট্রোজেন বন্ধনে সমান দক্ষ **রাইজোবিয়াম** জীবাণু থাকে না। কোন কোন মাটির রাইজোবিয়াম জীবাণুর শতকরা ২৫ ভাগও সক্রিয় নয়। আবার কোথাও এই পরিমাণ শূন্যও হতে পারে। এইসব জমিতে যখন কড়াই জাতীয় গাছের চাষ করা হয় তখন সঙ্গত কারণেই সেই জমিতে বীজের সঙ্গে উন্নতমানের জীবাণু প্রয়োগ করলে সুফল পাওয়া যাবে। বলা বাহুল্য যে মাটিতে দক্ষ নাইট্রোজেন বন্ধনকারী **রাইজোবিয়াম** প্রচুর পরিমাণে রয়েছে সেখানে জীবাণু প্রয়োগের জন্য সঠিক গুটিগুলি সংগ্রহ করে

তাকে জলের মধ্যে থেঁতো করে, মিশ্রণ বীজের সঙ্গে মিশিয়ে প্রয়োগ করলে উৎপন্ন চারাগাছে দ্রুত গুটি উৎপাদন সম্বন্ধে অনেকটা নিশ্চিত হওয়া যাবে। কিন্তু বেশ কিছুকাল সংরক্ষণের ক্ষেত্রে এই প্রথা কার্যকর হবে না।

কড়াই জাতীয় গাছ যে নাইট্রোজেন বন্ধন করে তা প্রায়ই উদ্ভিদের চাহিদার তুলনায় পর্যাপ্ত হয় না একথা আমরা আগেই জেনেছি। কিন্তু পরীক্ষায় দেখা যায় কড়াই জাতীয় গাছের সঙ্গে শর্করা প্রধান (cereal) শস্যের যৌথ চাষ করা হলে শেষোক্ত শ্রেণী বিশেষভাবে উপকৃত হয়। এই উপকারের কারণ হিসাবে শুঁটি জাতীয় শস্যের নাইট্রোজেন জাত পদার্থের নিঃসরণকে দায়ী মনে করা হয়। লিপম্যান (১৯১০) এবং ভিরটানেন ও লেন (১৯৩৫) এ সম্বন্ধে নিশ্চিতকরণ পরীক্ষা করেন। ভিরটানেনের পরীক্ষালব্ধ ফলাফল অনুযায়ী রাইজোবিয়াম দ্বারা আবদ্ধ নাইট্রোজেনের শতকরা ১০-৮০ ভাগই মূলের দ্বারা নিক্রান্ত হয়। নির্গত নাইট্রোজেন সমৃদ্ধ পদার্থের মধ্যে প্রধান হল গ্ল টামিক এ্যাসিড, এসপারটিক এ্যাসিড এবং বিটা এলানিন। বলা বাহুল্য ফিনল্যাণ্ডে ভিরটানেনের এই পরীক্ষার সপক্ষে কোন রায় আমেরিকা, জার্মানি, গ্রেটব্রিটেন বা অষ্ট্রেলিয়ায় বিভিন্ন শুঁটি জাতীয় শস্যের উপর চালিয়েও পাওয়া যায় নি। ফিনল্যাণ্ডে প্রাপ্ত পরীক্ষার ফলাফলের অনুরূপ কোন ঘটনা মাটিতে যদি প্রকৃতই ঘটে তবে তা সম্ভবতঃ আলোর স্বল্পতা, কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ হ্রাস, অতি অল্প তাপমাত্রা ইত্যাদি কারণে ঘটে থাকবে। সঙ্গত কারণেই এটা মনে করা যেতে পারে যখন জীবাণুরা সক্রিয়ভাবে পর্যাপ্ত নাইট্রোজেন বন্ধন করে তখন গাছ যদি প্রয়োজনীয় পরিমাণ সালোক-সংশ্লেষ না করতে পারে সেক্ষেত্রে অতিরিক্ত নাইট্রোজেন গাছের মূল দিয়ে বেড়িয়ে যেতে বাধ্য। আমাদের দেশে এ অবস্থা একমাত্র বর্ষাকালে সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু বর্ষাকালে এই শস্যের চাষ হয় না। তাই শুঁটি শ্রেণীর সঙ্গে চাষ করা অন্য শ্রেণীর গাছের অতিরিক্ত ফলনের কারণ স্পষ্টতঃই ভিন্ন হতে বাধ্য।

রাইজোবিয়াম এবং শুঁটি জাতীয় উদ্ভিদের যৌথ ক্রিয়ায় নাইট্রোজেন বন্ধন, মাটি থেকে সহজে গ্রহণীয় ফসফরাস (available phosphorus), পটাসিয়াম (available potassium) এবং অন্যান্য যৌলের পরিমাণের উপর

নির্ভরশীল। এছাড়া মাটির pH, এবং নাইট্রোজেন অজৈবকরণও উপরোক্ত ক্রিয়ার উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। যথেষ্ট পরিমাণ ফসফরাস এবং পটাসিয়ামের উপস্থিতিতে গুটির আকার বড় ও পুষ্ট হয়। ফলে নাইট্রোজেন বন্ধনের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। সাধারণতঃ pH ৫·০ এর নীচে থাকলে সেই মাটিতে রাইজোবিয়ামের ক্রিয়া ব্যাহত হয়। এই ক্ষতির কারণ সরাসরি অম্লত্ব নাও হতে পারে। অম্লত্ব বৃদ্ধির ফলে মাটিতে অতিরিক্ত লোহা এবং এলুমিনিয়াম দ্রবণীয় হয়ে পড়ে যা ক্ষতির কারণ হতে পারে। মুক্তজীবী নাইট্রোজেন বন্ধনের মত যৌথ নাইট্রোজেন বন্ধন প্রক্রিয়াতেও মলিবডেনাম এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। উদ্ভিদের কাছে সহজে গ্রহণীয় পর্যায়ের মলিব-ডেনামের অভাবে নাইট্রোজেন বন্ধন ক্রিয়া ব্যাহত হয়। এছাড়া **রাইজোবিয়াম** জীবাণুর আর এক মারাত্মক শত্রু হল ফাজ (রাইজোবিওফাজ)। এ সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা হয়েছে।

নাইট্রোজেন বন্ধনের রহস্য ঃ রাইজোবিয়াম এবং শিম্ব জাতীয় উদ্ভিদের যৌথ উদ্যোগে নাইট্রোজেন বন্ধন প্রক্রিয়া মুক্তজীবী জীবাণু দ্বারা নাইট্রোজেন বন্ধন প্রক্রিয়ার প্রায় অনুরূপ। ভারী আইসোটোপ $N^{১৫}$ প্রয়োগ করে বর্তমানে নাইট্রোজেন বন্ধন রহস্য সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা গেছে। মুক্তজীবী জীবাণুর নাইট্রোজেন বন্ধনের মত এক্ষেত্রেও শেষ অজৈব উপাদান হল অ্যামোনিয়া। এই অ্যামোনিয়া সম্ভবতঃ আলফা কিটো গ্লুটারিক এ্যাসিডের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গ্লুটামিক এ্যাসিড উৎপন্ন করে। $N^{১৫}$ পরিমণ্ডলে ছয় ঘণ্টা ব্যাপী পরীক্ষায় গুটি যে নাইট্রোজেন বন্ধন করে তা বিশ্লেষণ করে প্রথম উৎপন্ন পদার্থ চিহ্নিত হয়েছে গ্লুটামিক এ্যাসিড। সক্রিয়ভাবে নাইট্রোজেন বন্ধনকারী গুটির বর্ণ হয় ঈষৎ লালাভ। তার কারণ এক বিশেষ ধরনের হিমোগ্লোবিন (লোহা ঘটিত প্রোটিন)—"লেগহিমোগ্লোবিন" এই গুটির মধ্যে অবস্থান করে। এই লেগ-হিমোগ্লোবিন সক্রিয়ভাবে নাইট্রোজেন বন্ধনের জন্য দায়ী। লেগহিমোগ্লোবিন সাধারণ **রাইজোবিয়াম** বা ব্যাক্টিরয়েডে দেখা যায় না। এই রঞ্জক পদার্থকে দেখা যায় উদ্ভিদের মূলকোষের সাইটোপ্লাজমে।

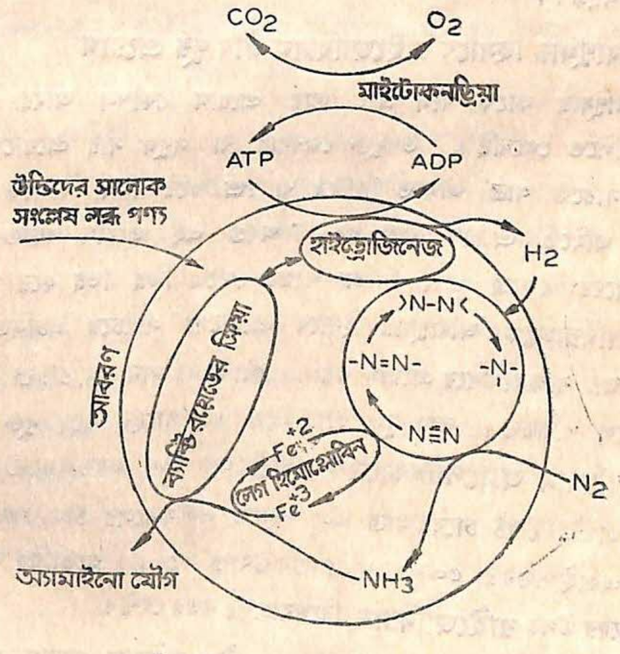
ভিরটানেন এবং লেনের (১৯৩৫) মতে লেগহিমোগ্লোবিন জারিত হয়ে আণবিক নাইট্রোজেনকে বিজারিত করে হাইড্রক্সিল অ্যামিনে পরিণত করে। এই হাইড্রক্সিল অ্যামিন সরাসরি অক্সালো এ্যাসিটিক এ্যাসিডের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অক্সিম

উৎপন্ন করে, যা হাইড্রক্সামিক এ্যাসিডে পরিণত হয়ে শেষে এসপারটিক এ্যাসিড উৎপন্ন করে।

কিন্তু ১৯৫১ সালে ডেমোলন, অ্যামোনিয়া প্রকল্পের কথা পুনরায় ঘোষণা করেন। তিনি বলেন ডিহাইড্রোজিনেজ উৎসেচক হাইড্রোজেনকে উদ্দীপিত করে যা মূলতঃ আণবিক নাইট্রোজেনকে বিজারিত করে অ্যামোনিয়া উৎপন্ন করে। উৎপন্ন অ্যামোনিয়া কিটো এ্যাসিডের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অ্যামাইনো এ্যাসিড উৎপন্ন করে। (মিস্তুস্টিন ও গিলনিকোভা, ১৯৭২)

১৯৭১ সালে বারগেরসন, আরো উন্নত চিন্তাধারার পরিচয় দেন। তাঁর মতে উদ্ভিদ এবং জীবাণু একযোগে ইলেকট্রন পরিবহণের কাজ করে এবং এই ক্রিয়ার মূল হোতা হল হিমোগ্লোবিন। তাঁর মতে অন্নুপোষকের কোষে নাইট্রোজেন বন্ধনের ঘটনা ঘটে। একদল ব্যাক্টিরয়েড এক একটা পর্দা দ্বারা আবদ্ধ থাকে এবং এই পর্দার উপরই নাইট্রোজেন বন্ধন হয়ে থাকে।

বারগেরসনের নাইট্রোজেন বন্ধন প্রকল্পের একটা কল্পচিত্র দেখানো হল।



চিত্র ১ : বারগেরসন, ১৯৭১

পূর্ব পৃষ্ঠার সরলীকৃত চিত্র থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে উদ্ভিদ, কার্বন বিপাক ক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় কার্বনজাত উৎপাদন সরবরাহের দায়িত্ব নেয় যার থেকে নাইট্রোজেন বন্ধনের প্রয়োজনীয় শক্তি সংগৃহীত হয়। উদ্দীপ্ত নাইট্রোজেন এই ইলেকট্রন পরিবহণ ক্রিয়ায় অন্তিম ইলেকট্রন গ্রাহকের কাজ করে। এই প্রক্রিয়া ব্যাক্টিরয়েড দ্বারা শুরু হয় এবং লেগহিমোগ্লোবিন দ্বারা শেষ হয়। কার্বনজাত পদার্থের অসম্পূর্ণ জারণে উৎপন্ন পণ্যের সঙ্গে অ্যামোনিয়া যুক্ত হয়ে ব্যাক্টিরয়েডে অ্যামাইনো এ্যাসিড উৎপন্ন করে যা পরে উদ্ভিদ আত্তীকরণ করে থাকে। অর্থাৎ বারগেরসনের মতে উদ্ভিদ কার্বনজাত উপাদান এবং নাইটোকনড্রিয়া থেকে এ টি পি সরবরাহ করে। গুটি উৎপাদনকারী ব্যাক্টিরিয়া ব্যাক্টিরয়েডের আকারে অবস্থান করে হিমোগ্লোবিন এবং এ টি পি নির্ভর হাইড্রোজিনসকে বিজারিত করে। ভিন্ন পথে নাইট্রোজেন বিজারিত হয়ে অ্যামোনিয়া উৎপন্ন করে এবং তা উপরোক্ত প্রক্রিয়ায় সামিল হয়।

নাইট্রোজেন বন্ধনে নাইট্রোজিনেজ উৎসেচকের ক্রিয়া মুক্তজীবী ব্যাক্টিরিয়ার ক্রিয়ার অনুরূপ।

জীবাণুসার হিসাবে রাইজোবিয়াম জীবাণুর প্রয়োগ

জীবাণুসার কাকে বলে এবং তার প্রয়োগ কৌশল আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে জেনেছি। উপযুক্ত জৈবসার বা সবুজ সার প্রয়োগের পর জীবাণু সারকে আর্দ্র জমিতে ছিটিয়ে বা স্প্রে করে কিম্বা বীজকে জীবাণু মাখিয়ে জমিতে প্রয়োগ করা হয়। অবশ্য এই প্রয়োগ পদ্ধতি বিভিন্ন জীবাণুসারের ক্ষেত্রে এবং বিভিন্ন শস্যের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। **রাইজোবিয়ামকে** জীবাণুসার হিসাবে প্রয়োগের সবচেয়ে প্রচলিত রীতি হল বীজের সঙ্গে মিশিয়ে প্রয়োগ করা। সয়াবীনের দানা অতিরিক্ত প্রোটিন সমৃদ্ধ বলে পরিচিত। তার মূল কারণ হল এই গাছের সঙ্গে যুক্ত জীবাণু **রাইজোবিয়াম জ্যাপোনিকামের** নাইট্রোজেন বন্ধন ক্ষমতা যথেষ্ট বেশী। কড়াই জাতীয় মোট চাষের মাত্র ৩০ শতাংশ এই ফসলের চাষ করা হলেও সয়াবীন একাই শতকরা ৫০ শতাংশ প্রোটিন উৎপন্ন করে। স্বাভাবিক কারণেই এই উদ্ভিদের উপর **রাইজোবিয়াম** বিশেষজ্ঞদের নজর বেশী।

সমগ্র পৃথিবীর কৃষিজমিতে কি পরিমাণ **রাইজোবিয়াম** প্রয়োগ করা হয়

তার সঠিক কোন পরিসংখ্যান আজও প্রকাশিত হয়নি। আমেরিকা জীবাণুসার প্রয়োগে তেমন বিশ্বাসী নয়। কিন্তু তারাও কিছু **রাইজোবিয়াম** জীবাণুসার প্রয়োগ করে থাকে, এবং তার মধ্যে আবার শতকরা ৮০ ভাগই হল সয়াবীন জীবাণুসার **রাইজোবিয়াম জ্যাপোনিকাম**। মোটামুটি পৃথিবীভিত্তিক হিসাবে মোট কড়াই জাতীয় চাষের শতকরা ৪০ ভাগ বীজে **রাইজোবিয়াম** জীবাণুসার প্রয়োগ করা হয়। ব্রাজিল, ভারতবর্ষ, অষ্ট্রেলিয়া এবং প্রায় সব ইউরোপীয় দেশগুলিই **রাইজোবিয়াম** জীবাণুকে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদন করে থাকে। ভারতবর্ষের কৃষি জীবাণু বিশারদগণ **রাইজোবিয়ামের** প্রয়োগ সম্বন্ধে আশাবাদী। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের মাটিতে **রাইজোবিয়ামের** প্রাচুর্য থাকায় সাধারণতঃ এইসব জমিতে জীবাণু প্রয়োগ করার প্রয়োজন হয় না এটাই প্রচলিত ধারণা। কিন্তু সয়াবীন এবং বারসীমের উপর জীবাণু প্রয়োগ করে প্রত্যক্ষ ফল পাওয়া যায়। কয়েকটি শস্যের উপর **রাইজোবিয়াম** প্রয়োগের একটা পরীক্ষার ফলাফল দেখা যাক।

তালিকা ৪ : রাইজোবিয়াম জীবাণুসার প্রয়োগের প্রভাব (মেহরোত্রা এবং লেহরি, ১৯৭০)

	দানা উৎপাদন (কিগ্রা. প্রতি হেক্টরে)	
শস্য	নিয়ন্ত্রিত	জীবাণু প্রযুক্ত
মুগ	৬৩৭	৭৫০
উর্দ	৯০০	১০৮১
লোবিয়া	৮১২	৯৮৭
সয়াবীন	৫৭৫	১০৫০
ধইঞ্চা	২৫৬২	৩৭৭৯
সানাই	৭৮৭	১০০০

এই পরীক্ষার ফলাফল থেকে জীবাণুসার প্রয়োগের গুরুত্ব উপলব্ধি করা

যায়। সাধারণতঃ কোন স্থান থেকে আহৃত উন্নতমানের **রাইজোবিয়াম** জীবাণু অন্যস্থানে সমান ফলাফল নাও প্রদর্শন করতে পারে। একই প্রজাতির **রাইজোবিয়াম** আবার ভিন্ন ভিন্ন মাটিতে ভিন্ন ভিন্ন স্ট্রেন হিসাবে থাকতে পারে। মেহরোত্রা এবং লেহরী বিভিন্ন স্থান থেকে আহৃত **রাইজোবিয়াম লেগুমিনোসেরাম** এবং **রাইজোবিয়াম ট্রাইফোলিআই** যথাক্রমে মটর এবং বারসীমের উপর প্রয়োগ করে ভিন্ন ফল পেয়েছেন। নীচের এবং পরবর্তী পৃষ্ঠার তালিকা থেকে তা আরো স্পষ্ট হবে।

তালিকা ৫ : উৎসের উপর রাইজোবিয়াম জীবাণুর নির্ভরশীলতা
(১) শস্য-বারসীম (মেহরোত্রা এবং লেহরি, ১৯৭০)

রাইজোবিয়ামের উৎস স্থান	বারসীমের ফলনমাত্রা (টন প্রতি হেক্টরে)
নিয়ন্ত্রিত	২৮·৬৪
বুন্দেলখণ্ড	৪৭ ৭০
মীরাট	৪১·৭০
গোরকপুর	২৪·৫৫
আলিগড়	৪৪·০০
মির্জাপুর	৪৫·২০
প্রতাপগড়	৩৪·৯৫
কানপুর	৪৭·৫০

বিভিন্ন স্ট্রেনের **রাইজোবিয়াম ট্রাইফোলিআই** প্রয়োগ করে দেখা যায় বারসীমের উপর ফলনের প্রভাব খুবই স্পষ্ট, কিন্তু স্থানভেদে ফলনের মাত্রা পৃথক হয়েছে।

এবার দেখা যাক বিভিন্ন স্থান থেকে সংগৃহীত **রাইজোবিয়াম লেগুমিনোসেরাম** মটরের উপর কেমন প্রভাব বিস্তার করেছে।

তালিকা ৬ঃ উৎসের উপর **রাইজোবিয়াম** জীবাণুর নির্ভরশীলতা
(২) শস্য-মটর (মেহরোত্রা এবং লেহরি, ১৯৭০)

রাইজোবিয়ামের উৎস স্থান	মটরের ফলনমাত্রা (টন প্রতি হেক্টরে)
নিয়ন্ত্রিত	২৬·৪৯
গাজিপুর	৩২·৪৭
প্রতাপগড়	৩২·৫০
বারাণসী	৩০·৯৪
রুদ্রপুর	৩১·৮৮
কানপুর	২৯·৪১
আলিগড়	৩০·১৭
মুজাফর নগর	২৮·১৯
মীরাট	৩০·৯৭
গোরকপুর	২৭·৫৭
ফৈজাবাদ	৩০·৩৮
মির্জাপুর	২৯·৮৩
বেরিলী	২৯·৭৯

এই পরীক্ষার দ্বারাও পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থনের সাক্ষর মেলে। ভারতের বিভিন্ন মাটিতে পরীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে **রাইজোবিয়াম** প্রয়োগের ফলে হেক্টর পিছু ৮৪-১৪৫ কিগ্রা. নাইট্রোজেন প্রয়োগের অনুরূপ ফল পাওয়া যায়। পর্যায়ক্রমিকভাবে কড়াই জাতীয় এবং অন্য শর্করা সমৃদ্ধ বা তৈলবীজের

প্রয়োগে যথেষ্ট বেশী ফলন পাওয়া সম্ভব। এ ছাড়া পরিমিত পরিমাণে মিশ্র চাষ পদ্ধতিও উচ্চ ফলনের সাক্ষ্য রাখে। রাইজোবিয়াম প্রয়োগে আরো সম্ভাবনাময় হয়ে উঠে দ্রবণীয় ফসফেট সার প্রয়োগের ফলে। এ ছাড়া প্রয়োজন ভিত্তিতে অম্লজমিতে চুনপ্রয়োগে সুফল পাওয়া যায়। এ ছাড়া স্বল্প প্রয়োজনীয় মৌলগুলির স্বাভাবিক চাহিদার প্রতিও নজর রাখতে হবে এবং প্রয়োজনে মলিবডেনাম, বোরন বা তামা ঘটিত লবণও পরিমিত মাত্রায় প্রয়োগ করতে হবে। গুটি তৈরী হতে কমপক্ষে দুই থেকে তিন সপ্তাহ সময় নেয় তা আমরা আগেই জেনেছি। তাই মাটিতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ অত্যন্ত কম থাকলে প্রাথমিক পর্যায়ে উদ্ভিদের চাহিদা মেটানোর জন্য অল্প পরিমাণে নাইট্রোজেন ঘটিত সার প্রয়োগ করলে উদ্ভিদ পুষ্ট ও সতেজ হয়ে গড়ে উঠবে। সাধারণতঃ কোন জমিতে প্রথম বৎসর রাইজোবিয়াম প্রয়োগ তেমন ফলপ্রসূ হয় না। কিন্তু উপর্যুপরি ৩-৪ বৎসর জীবাণুসার প্রয়োগের ফলে জমির উর্বরতা যথেষ্ট বৃদ্ধি পায় এবং তখন প্রথম বৎসরের প্রায় দ্বিগুণ ফলনের ঘটনাও অস্বাভাবিক নয়। সাধারণতঃ জীবাণুসার উৎপাদনের জন্য দ্বিতীয় বৎসরের পুষ্ট ও সতেজ গাছ থেকে লালাভ বর্ণের গুটি আহরণ করা হয়।

প্রকৃত রাইজোবিয়াম চিহ্নিতকরণ প্রণালী ঃ সাধারণ দানা শস্য বা শুঁটি জাতীয় পশুখাদ্য উদ্ভিদের ৬-৮ সপ্তাহ বয়সের পুষ্ট ও সতেজ গাছকে সযত্নে মাটি থেকে তোলা হয়। প্রধান মূল সংলগ্ন বড় আকারের চ্যাপ্টা বা উত্তল, লালাভ গুটিকে আহরণ করে মারকিউরিক ক্লোরাইডের ($HgCl_2$) লঘু দ্রবণে (০·১%) ভিজিয়ে তা থেকে উপরিতলের অবাঞ্ছিত জীবাণু মুক্ত করা হয়। তারপর এই গুটিগুলিকে ভালোভাবে জলে ধুয়ে, জলের মধ্যে থেঁতো করে দ্রবণ প্রস্তুত করা হয়। উক্ত দ্রবণের একফোঁটা (০·০৫ মিলি) ; কঙ্গোরেড যুক্ত ইষ্ট নির্যাস, ম্যানিটল, আগার আগার দ্রবণে মিশানো হয়। এইভাবে দ্রবণকে ৩-৪ বার লঘু করার পর (প্রায় ৪০ থেকে ৪৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায়) গলিত আগার আগার মিশ্রিত জীবাণুর দ্রবণকে পেট্রিপ্লেটে ঢেলে কয়েকদিন ৩০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় রাখা হয়। এই সময়ের মধ্যে জীবাণু কলোনি গঠন করে। কলোনি যদি কঙ্গোরেডের ঈষৎ লাল বর্ণ গ্রহণ করে তখন ঐ জীবাণুকে এগ্রোব্যাক্টিরিয়াম রেডিওব্যাক্টার মনে করা হয়। কিন্তু উৎপন্ন জীবাণুর কলোনি বর্ণহীন বা সাদা বর্ণের হলে তা রাইজোবিয়াম মনে করা হয়। নিশ্চিতভাবে

সিদ্ধান্ত করার জন্য উক্ত জীবাণুকে কঙ্গোরেড বিহীন উপরোক্ত মাধ্যমে সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড দ্রবণ যোগ করে অম্লত্বমাত্রা pH, ১১-১৩-তে উন্নীত করার পর (হপারের ক্ষারীয় মাধ্যম) বপন (inoculate) করা হয়। এই অতিরিক্ত ক্ষারত্বে রাইজোবিয়াম জীবাণু জন্মাতে পারে না, কিন্তু এগ্রোব্যাক্টিরিয়াম রেডিওব্যাক্টার সহজেই জন্মাতে পারে। তাই হপারের ক্ষারীয় মাধ্যমে জীবাণু উপনিবেশ গঠনে অক্ষম হলে তা প্রকৃত রাইজোবিয়াম বুঝতে হবে।

সর্বশেষ নিশ্চিতকরণের উপায় হিসাবে এবং তার সক্রিয়তা পরীক্ষার জন্য ঐ জীবাণুকে বিভিন্ন মাটির পাত্রে পরীক্ষার জন্য প্রয়োগ করা হয়। পাত্রগুলিতে সমান পরিমাণ নির্বীজ করা (sterile) বা সাধারণ মাটি কিংবা ধৌত বালি ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রথম পাত্রটি হবে নিয়ন্ত্রিত, অর্থাৎ তাতে কোন জীবাণু প্রয়োগ করা হবে না, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পাত্রে জীবাণু প্রয়োগ করা হবে এবং এরপর চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ইত্যাদি সংখ্যাদ্বারা চিহ্নিত পাত্রে বিভিন্ন মাত্রায় নাইট্রোজেন ঘটিত সার প্রয়োগ করা হবে। উদ্ভিদের চাহিদা অনুযায়ী ফসফরাস এবং পটাস অবশ্য প্রতি পাত্রেই সমান পরিমাণে দিতে হবে। এই পরীক্ষার শেষে গাছের মূলে উৎপন্ন গুটির সংখ্যা, ফলন এবং গাছের তুলনামূলক সতেজতার ভিত্তিতে জীবাণুটির দক্ষতা সম্বন্ধে ধারণা করা যেতে পারে। এই পরীক্ষার অনুরূপ পরীক্ষায় কৃষিজমিতে সাফল্যলাভ করার পরই জীবাণুটিকে, জীবাণুসার হিসাবে ব্যবহারের উপযোগী গণ্য করা যেতে পারে।

জীবাণুসার উৎপাদন পদ্ধতিঃ রাইজোবিয়াম ঘটিত জীবাণুসারের বাণিজ্যিক পরিচিতি, নাইট্রাজিন হিসাবে। এখন আমরা পর্যায়ক্রমে কয়েকটি উল্লিখিত জীবাণুসার উৎপাদন সম্বন্ধে আলোচনা করব।

প্রথম পদ্ধতিঃ এই পদ্ধতিতে প্রয়োগোপযোগী জীবাণুর চাষ করা হয় (culture) তরল পুষ্টি মাধ্যমে। এই দ্রবণে জীবাণু জন্মানোর জন্য থাকে প্রয়োজনীয় শর্করা, খনিজ লবণ এবং জীবাণুর শ্বসন চালানোর জন্য থাকে বায়ুপ্রবাহের ব্যবস্থা। যথেষ্ট সংখ্যায় জীবাণু জন্মানোর পর তাতে নির্বীজকৃত গুড়োমাটি বা পীট যোগ করা হয়। এইভাবেই এই জীবাণুকে সার হিসাবে ব্যবহারের জন্য প্যাক করে বাজারে ছাড়া হয়। ইউরোপে এই পদ্ধতি প্রচলিত।

দ্বিতীয় পদ্ধতি ঃ এই পদ্ধতিতে উপরোক্ত পন্থায় অধিক সংখ্যক জীবাণু জন্মানো হয় (১০^{৯} — ৫ × ১০^{৯} প্রতি মিলিলিটার দ্রবণে)। তারপর উল্লিখিত দ্রবণকে সাধারণ পীটের সঙ্গে মিশানো হয়। এতে ৩৫-৪০ শতাংশ জলীয় বাষ্প থাকে। এই অবস্থায় জীবাণুকে আরো কিছুকাল বংশ বিস্তারের সুযোগ দেওয়া হয়। ফলে জীবাণুর সংখ্যা আরো ৫-১০ গুণ বৃদ্ধি পায়। এভাবে উৎপন্ন পদার্থকে জীবাণুসার হিসাবে ব্যবহারের জন্য প্যাক করা হয়।

উপরোক্ত পদ্ধতিতে উৎপন্ন জীবাণুসারে বৎসরকাল পরেও প্রতি গ্রাম পীটে ১০^{৯} সংখ্যক জীবাণু সজীব অবস্থায় থাকতে পারে। সাধারণতঃ প্রতি গ্রাম পীটে ১০^{৭} সংখ্যক জীবাণুকেই সন্তোষজনক মনে করা হয়। এই সার বীজে মাখিয়ে প্রয়োগ করলে বীজপিছু ১০০০টি জীবাণু থাকবে যা প্রয়োগের পক্ষে সন্তোষজনক।

এ ছাড়া কড়াই জাতীয় গাছের মূল (গুটি সমেত) থেঁতো করে সরাসরি জমিতে প্রয়োগের কৌশল পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। কিন্তু তাৎক্ষণিক প্রয়োগ না করা হলে এই পদ্ধতিতে সুফল পাওয়া যায় না।

পীটভিত্তিক জীবাণুসারকে প্রয়োগের আগেই বীজে লেপন করতে হয়। এই প্রক্রিয়ার জন্য প্রায় ১৫০ গ্রাম পরিমাণ চিটাগুড় বা গঁদকে এক লিটার জলে গুলে ফুটিয়ে দ্রবণ প্রস্তুত করা হয়। এই দ্রবণ ঠাণ্ডা করে তাতে প্রায় ৪০০-৫০০ গ্রাম পরিমাণ পীট মিশ্রিত জীবাণুসার এবং এক একর জমিতে প্রয়োগের জন্য পরিমিত পরিমাণ বীজকে প্রায় ১৫ মিনিটকাল ভিজিয়ে রাখা হয় এবং তারপর পরিষ্কার কাপড়ে বিছিয়ে ছায়ায় শুকিয়ে নেওয়া হয়। কারণ রোদে শুকালে জীবাণু মরে যাবে। বীজে প্রয়োগ করার পর সেখানে জীবাণুর বংশবৃদ্ধি হয়ে তা ১০-১০০ গুণ বর্দ্ধিত হতে পারে। চিটাগুড় বা অন্য আঁঠালো পদার্থ প্রয়োগের ফলে জীবাণু দৃঢ়ভাবে বীজের গায়ে আটকে থাকে। নীতিগত-ভাবে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে জীবাণু উৎপাদনের বিভিন্ন পদ্ধতি হল (১) কঠিন মাধ্যমের উপরিতলে জীবাণুর চাষ (২) অগভীর তরল মাধ্যমে জীবাণুর উৎপাদন। কিম্বা—

তৃতীয় পদ্ধতি ঃ গভীর প্রকোষ্ঠ পদ্ধতি—গভীর তরল মাধ্যমে জীবা উৎপাদন।

প্রথমোক্ত কঠিন পুষ্টি মাধ্যমে উৎপন্ন জীবাণুর সংখ্যা প্রথমদিকে বেশ বেশী হয়।

তার কারণ অক্সিজেনের প্রাচুর্য্য। এ ছাড়া কঠিন মাধ্যমে জীবাণু বংশবৃদ্ধি করতে শুরু করলে তারা যে বর্জ্য পদার্থ ত্যাগ করে তার বিষক্রিয়া অন্য জীবাণুর উপর প্রতিফলিত হয় না, কারণ আগার আগার মাধ্যম উৎপন্ন বর্জ্য পদার্থ শোষণ করে। তবু বৃহদায়তন শিল্পে সন্ধান পদ্ধতিতে জীবাণু উৎপাদনই সুবিধাজনক। **সন্ধান পদ্ধতি হল এক বিশেষ ধরনের অবাত শ্বসন যেখানে জৈব পদার্থ ইলেকট্রন দাতা এবং গ্রহীতা উভয় ক্রিয়াই সম্পন্ন করে ফলে জৈব পদার্থের আংশিক জারণে তাপশক্তি নির্গত হয় এবং মধ্যবর্ত্তী কার্বনজাত পণ্য ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হয়।**

দ্বিতীয় পদ্ধতি বায়ু সরবরাহ অক্ষুন্ন রাখার পক্ষে তৃতীয় পদ্ধতির চেয়ে ভালো। কিন্তু এই পদ্ধতি চালানোর জন্য অপেক্ষাকৃত বেশী স্থানের প্রয়োজন হয় এবং এতে জীবাণু উৎপাদনের হারও তুলনামূলকভাবে অনেক কম হয়।

বর্তমানে তৃতীয় পদ্ধতিরই উৎকর্ষতা প্রমাণিত হয়েছে। অক্সিজেন সরবরাহের অসুবিধা এড়ানোর জন্য নীচ থেকে সরু নলের সাহায্যে নির্বীজ বায়ু অনবরত পাঠানোর ব্যবস্থা থাকে। ফলে অক্সিজেনের স্বল্পতা জীবাণুর বংশবিস্তারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে না। যে পাত্রে জীবাণুর বৃদ্ধি ঘটানো হয় তাকে আলোড়নের ব্যবস্থা রাখলে সমানভাবে বৃদ্ধি হতে পারে। এর ফলে জীবাণুর উৎপাদনও বহুলাংশে বেড়ে যাবে।

সাবেকি পদ্ধতিতে যেখানে জীবাণুর সংখ্যা প্রতি মিলিলিটার দ্রবণে $২ \times ১০^৭ — ৫ \times ১০^৭$ হয়ে থাকে, সেখানে গভীর প্রকোষ্ঠ পদ্ধতিতে প্রতি মিলিলিটার দ্রবণে $২ \times ১০^৯ — ৫ \times ১০^৯$ সংখ্যক অর্থাৎ প্রায় ১০০ গুণ বেশী জীবাণু উৎপন্ন হয়। অবশ্য রাইজোবিয়াম জীবাণু **ব্যাসিলাস মেগা-থেরিয়ামের** মত স্পোর বা রেণু উৎপাদনকারী নয়, তাই জীবাণু বৃদ্ধির জন্য অতিরিক্ত সময় না দিয়ে (স্পোর বা রেণু গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় সময়) অনবরত প্রক্রিয়া অবলম্বন করলে জীবাণু উৎপাদনের সমহার বজায় থাকবে।

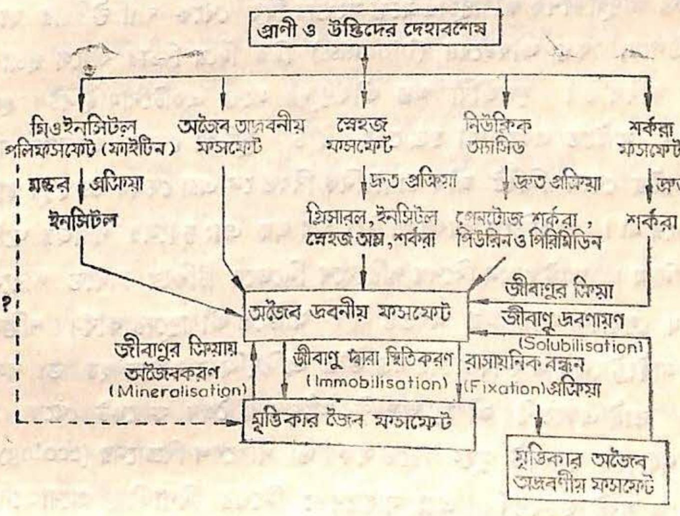
প্রাণীজ প্রোটিনের বিকল্প হিসাবে উদ্ভিদ প্রোটিন উৎপাদনের জন্য রাইজোবিয়াম প্রয়োগের ব্যাপ্তি বাড়াতেই হবে কারণ আমাদের দেশের জনসংখ্যার এক বড় অংশই হল নিরামিষাশী।

ফসফরাস ঘটিত জীবাণুসার ১১

সজীব পদার্থের সঙ্গে জড়িত সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মৌলগুলির মধ্যে ফসফরাস অন্যতম। জীবকোষ সম্বন্ধে বলতে গেলে সম্ভবতঃ নাইট্রোজেন ছাড়া, জৈবরাসায়নিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ফসফরাসের মত জটিল ভূমিকা আর কোন মৌলিক পদার্থের নেই। গাছ ফসফরাস পায় প্রধানতঃ মাটি থেকে। আমাদের দেশের মাটিতে ফসফরাস থাকে মূলতঃ অজৈব পর্যায়ে। যদিও মাটির প্রকারভেদে জৈব পর্যায়ের ফসফরাসও মাটিতে মুখ্য ফসফরাসের সঞ্চয় হতে পারে। বিশেষতঃ যেসব মাটিতে হিউমাসের পরিমাণ যথেষ্ট বেশী সেইসব মাটিতেই জৈব ফসফরাসের প্রাধান্য লক্ষিত হয়। আমাদের দেশের অধিকাংশ মাটিই অজৈব (mineral soil) এবং তাতে হিউমাসের পরিমাণও থাকে কম। তাই আমাদের দেশের বেশীর ভাগ মাটিতেই অজৈব ফসফরাসের প্রাধান্যই লক্ষিত হয়। মাটির ফসফরাসের প্রধান উৎস হল শিলার মধ্যে সঞ্চিত ফসফেট জাতীয় যৌগ। এ ছাড়া মাটিতে উদ্ভিদ এবং মৃত প্রাণীর দেহাবশেষের উপর জীবাণুর ক্রিয়া কিছু পরিমাণ ফসফরাস মুক্ত করে দেয়। এ ছাড়াও অন্য মুখ্য উৎস হল (বিশেষ করে কৃষি জমিতে) মাটিতে প্রযুক্ত অজৈব ফসফরাস ঘটিত সার এবং জৈবসার।

মাটিতে ফসফরাস জৈব এবং অজৈব উভয় অবস্থাতেই বিরাজ করে তা আমরা জেনেছি। জৈব উপাদানের মুখ্য অংশগুলি হল, নিউক্লিক অম্ল, শর্করা ফসফেট, স্নেহজ ফসফেট, নিউক্লিয়োপ্রোটিন, ফাইটিন এবং ফাইটিক এ্যাসিড বা তার সহজাত যৌগ। পক্ষান্তরে মুখ্য অজৈব উপাদানগুলি হল, ক্যালসিয়ামের এক দুই বা তিনযোজী যৌগসমূহ এবং লোহা, এলুমিনিয়ম বা ম্যাঙ্গানীজের অদ্রবণীয় ফসফেট। এ ছাড়া থাকে অল্প মাত্রায় সোডিয়াম, পটাসিয়াম বা ম্যাগনেসিয়াম ঘটিত ফসফেট লবণ। এই সকল বিভিন্ন যৌগের মধ্যে লোহা, এলুমিনিয়ম এবং ক্যালসিয়াম ঘটিত

ফসফেট লবণ হল মুখ্য অদ্রবণীয় পর্যায়ের যৌগ যা উদ্ভিদের কাছে গ্রহণীয় নয়। বিভিন্ন পরীক্ষায় দেখা গেছে সামান্য অম্ল থেকে ক্ষারধর্মী মাটিতে ট্রাইক্যালসিয়াম ফসফেট মুখ্য ভূমিকা নেয় আর অম্লধর্মী মাটিতে লোহা বা এলুমিনিয়ম ফসফেটের ভূমিকাই হচ্ছে মুখ্য। তাই দেখা যাচ্ছে ফসফেট জাতীয় যৌগের চাহিদা মাটিতে থেকেই যায়। বিশেষ করে অম্ল মাটিতে বা ক্ষারধর্মী মাটিতে ফসফরাসের জোগান দেওয়া সত্যি অপরিহার্য। কিন্তু মাটিতে দ্রবণীয় পর্যায়ের ফসফরাস যুক্ত হবার পর অল্পকালের মধ্যেই তা ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, লোহা বা এলুমিনিয়মের হাইড্রক্সাইড, কার্বনেট বা সিলিকেটের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অদ্রবণীয় অধঃক্ষেপ ফেলে। অবশিষ্টাংশও কর্দমের কলয়েড দ্বারা আবদ্ধ হয়ে পড়ে। ফলে মাটিতে প্রয়োগ করা দ্রবণীয় সুপার ফসফেটের খুব অল্প অংশই উদ্ভিদের ভাগ্যে জোটে এবং তার জন্যও আবার গাছকে প্রতিযোগিতায় নামতে হয় জীবাণুর সঙ্গে। **ফসফরাসের অভাবে শুধুমাত্র কোষগঠনই বিঘ্নিত হয় না। এই যৌগের অভাবে গাছ অন্য প্রয়োজনীয় যৌগগুলি গ্রহণ করার ক্ষমতাও হারায়।** প্রথমে দেখা যাক মাটিতে ফসফরাস কিভাবে বিবর্তন চক্রপথে আবর্তিত হচ্ছে।



চিত্র ১ : ফসফরাস চক্র

(Soil Biochemistry Vol-1 (19(6) হইতে গৃহীত।)

এবার আসা যাক ফসফরাস চক্রে জীবাণুর ভূমিকা প্রসঙ্গে। ফসফরাস চক্রে মুখ্যতঃ জীবাণুর দুটি ভূমিকা। প্রথমতঃ অদ্রবণীয় পর্যায়ের ফসফেটকে দ্রবণীয় পর্যায়ের অজৈব ফসফেটে পরিণত করা এবং দ্বিতীয়তঃ দ্রবণীয় অজৈব ফসফরাসকে অদ্রবণীয় পর্যায়ের জৈব বা অজৈব ফসফেটে পরিণত করা। প্রথম পর্যায়ভুক্ত হল ফসফেট সলিউবিলাইজেসন (solubilisation) যেখানে অদ্রবণীয় অজৈব ফসফেট দ্রবণীয় অজৈব ফসফেটে পরিণত হয় এবং ফসফেট মিনারালাইজেসন (mineralisation) বা অজৈবকরণ যেখানে অদ্রবণীয় জৈব ফসফেট থেকে দ্রবণীয় অজৈব ফসফেট মুক্ত হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত হল ফসফেট স্থিতিকরণ বা ইমমবিলাইজেসন (immobilisation) যেখানে দ্রবণীয় অজৈব পর্যায়ের ফসফেট জীবাণু কোষে জৈব ফসফেট হিসাবে আবদ্ধ হয়। এ ছাড়া মাটিতে দ্রবণীয় অজৈব ফসফরাস মাটির ক্যালসিয়াম, লোহা বা এলুমিনিয়ম, আয়ন দ্বারা যুক্ত হয়ে অদ্রবণীয় পর্যায়ে পরিণত হয়। একে বলে ফসফরাস ফিক্সেসন (fixation)। এ ছাড়া এই প্রক্রিয়া কাদা (clay) বা মাটির জৈব পদার্থের (humus) ক্রিয়ায়ও হতে পারে। বলা বাহুল্য এই প্রক্রিয়া মুখ্যতঃ রাসায়নিক। প্রসঙ্গতঃ আমাদের মূল লক্ষ্য প্রথমোক্ত প্রক্রিয়া এবং তার মান উন্নয়নের উপর।

মাটির আণুবীক্ষণিক জীবাণুদের মধ্যে সংখ্যার দিক থেকে ব্যাক্টিরিয়ার স্থান সবার উপরে, কিন্তু জীবভরের (biomass) দিক দিয়ে বিচার করলে ছত্রাক একছত্র অধিপতি। মৃতজীবী অন্য জীবাণুদের মধ্যে একটিনোমাইসিটস হল মধ্যবর্তী। মাটিতে এককোষী ছত্রাকের (ইস্ট) ভূমিকা তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয় বলে, মাটির কোন নির্দিষ্ট জীব রাসায়নিক বিবর্তনে এরা তেমন গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে না। প্রকৃতিতে প্রবল প্রতিযোগীর জয় এবং দুর্বলের পরাজয় ঘটে, এটাই নিয়ম। তাই কোন বিশেষ পরিবেশে নিজেকে টিকিয়ে রাখতে পারলে কালক্রমে সেখানে তার জয় অবশ্যম্ভাবী। মাটিতে জীবাণুদের কার্বন (শক্তির উৎস), নাইট্রোজেন ও ফসফরাসের জন্য তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়, তা বলা বাহুল্য। তাই একশ্রেণীর জীবাণু অদ্রবণীয় অজৈব বা জৈব ফসফেট থেকে যে দ্রবণীয় পর্যায়ের ফসফেট মুক্ত করতে সক্ষম তা পরিবেশ বিজ্ঞানের (ecology) দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এরা সাধারণতঃ নিজের বিপাকীয় প্রয়োজনের অতিরিক্ত পরিমাণ দ্রবণীয় ফসফেট মুক্ত করতে পারে যা গাছের কাজে লাগে। তাই এদের এই ক্ষমতা কৃষিক্ষেত্রে সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

স্টাটস্টর্ম ১৯০৩ সালে প্রথম জানতে পারেন যে টকে যাওয়া দুধ বা মাটির নির্যাস, ট্রাইক্যালসিয়াম ফসফেট থেকে দ্রবণীয় পর্যায়ের ফসফেট মুক্ত করতে পারে। এরপর ১৯০৮ সালে হ্যাকেট এবং তাঁর সহকারীরা স্টাটস্টর্মের সিদ্ধান্তের অনুকূলে যুক্তির সন্ধান পান (রোজ, ১৯৫৭)। তাঁরা দেখেন যে এইসব জীবাণুরা জৈব এ্যাসিড উৎপন্ন করে ট্রাইক্যালসিয়াম ফসফেটকে [$Ca_3(PO_4)_2$] দ্রবীভূত করছে এবং উৎপন্ন এ্যাসিডের পরিমাণ যত বেশী হচ্ছে দ্রবণীয় ফসফরাসের পরিমাণও তত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই সিদ্ধান্তের অনুকূলে বৈপ্লবিক আবিষ্কার করেন ১৯৪৮ সালে পিকভস্কাইয়া নামে এক রুশ মহিলা বিজ্ঞানী। তিনি ফসফরাইট এবং মাটি থেকে ফসফেট দ্রবণকারী বিশুদ্ধ একক জীবাণু আবিষ্কারে সমর্থ হন। তিনি এই জীবাণুর নাম দেন ব্যাক্টিরিয়াম পি। এরপর ১৯৫০ সালে মেনকিনা মাটি থেকে দুটি পৃথক বিশুদ্ধ ব্যাক্টিরিয়া আবিষ্কার করেন যারা সক্রিয়ভাবে অদ্রবণীয় $Ca_3(PO_4)_2$ এবং জৈব ফসফেট থেকে দ্রবণীয় অর্থোফসফেট মুক্ত করতে সক্ষম। এই জীবাণু দুটি হল যথাক্রমে **ব্যাসিলাস মেগাথেরিয়াম ভ্যারাইটি ফসফেটিকাম** এবং একটি সেরাশ্নিয়া (Serratia) প্রজাতি।

এর পরবর্তী বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে বিভিন্ন প্রজাতির ব্যাক্টিরিয়া, ছত্রাক এবং এক্টিনোমাইসিটস এই ক্ষমতার অধিকারী। এদের মধ্যে মুখ্য **ব্যাসিলাস, আর্থোব্যাক্টার সিউডোমোনাস, ফ্লাভোব্যাক্টিরিয়াম, মাইক্রোকোক্কাস, এক্রোমোব্যাক্টার**—এরা সকলেই ব্যাক্টিরিয়া, **স্ট্রেপটোমাইসিস, মাইক্রোমনোস্পোরা** হল এক্টিনোমাইসিটস এবং **এসপারজিলাস, পেনিসিলিয়ায়, রাইজোপাস**, এবং **কিটোমিয়াম** এরা সকলেই হল ছত্রাক শ্রেণীভুক্ত।

১৯৫৭ সালে গোলেবিয়স্কা, ফসফেট দ্রবণকারী জীবাণুকে ছয়টি ভাগে ভাগ করেন। এগুলি হল, (ক) যারা অদ্রবণীয় জৈব বা অজৈব ফসফেট গ্রহণ করতে পারে, (খ) যারা শুধুমাত্র অজৈব অদ্রবণীয় ফসফরাস গ্রহণ করতে পারে, (গ) যারা শুধুমাত্র অদ্রবণীয় জৈব ফসফেট গ্রহণ করতে পারে, (ঘ) যারা ট্রাইক্যালসিয়াম ফসফেট গ্রহণ করতে পারে, (ঙ) যারা প্রয়োজনের অতিরিক্ত অদ্রবণীয় জৈব ফসফরাসকে দ্রবীভূত করে এবং (চ) যারা প্রয়োজনের অতিরিক্ত ট্রাইক্যালসিয়াম ফসফেটকে দ্রবীভূত করতে পারে। এই শ্রেণীবিভাগ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় আমাদের দেশের সাধারণ মাটির জন্য শেষোক্ত শ্রেণীই

সর্বাধিক উপকারী বলে গণ্য হবে, যদিও শীতপ্রধান দেশে (ঙ) পর্যায়ের শ্রেণীই বেশী কার্যকর বলে গণ্য হয়ে থাকে।

ফসফেট দ্রবণকারী জীবাণুদের একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় না কারণ আমরা দেখেছি ব্যাক্টিরিয়া ছত্রাক এবং এক্টিনোমাইসিটসের বিভিন্ন গণের জীবাণু এই প্রক্রিয়ার অংশীদার। ফসফেট দ্রবণায়নের (Solubilization) কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে বিশেষ কয়েকটি অতি প্রয়োজনীয় বিপাকীয় জীব রাসায়নিক ক্রিয়ার অধিকারী জীবাণুগুলিই অদ্রবণীয় ফসফেটকে দ্রবীভূত করতে সক্ষম। এখন দেখা যাক ফসফেট দ্রবণায়নের পথগুলি কি কি হতে পারে।

মাটির প্রধান জৈব ফসফেট ফাইটেট জাতীয় পদার্থ থেকে দ্রবনীয় অর্থো-ফসফেট মুক্ত করার একমাত্র পথ হল এক বিশেষ ধরনের উৎসেচক (enzyme) উৎপাদন। ফাইটেজ নামক উৎসেচক ফাইটিন জাতীয় জৈব পদার্থ থেকে দ্রবণীয় পর্যায়ের অর্থোফসফেট মুক্ত করে থাকে। অদ্রবণীয় অজৈব পদার্থের মধ্যে ক্যালসিয়াম, এলুমিনিয়ম এবং লোহার ফসফেটই মুখ্য ভূমিকা নেয় তা আমরা জেনেছি। সাধারণতঃ ফসফেট দ্রবণকারী জীবাণুরা তাদের বিপাকীয় ক্রিয়ায় জৈব এ্যাসিড উৎপন্ন করে থাকে। এইসব জৈব এ্যাসিডগুলি হাইড্রোজেন আয়ন (প্রোটন) উৎপন্ন করে। মুক্ত প্রোটন উপরোক্ত অদ্রবণীয় অজৈব ফসফেটগুলির সঙ্গে ক্রিয়ায় দ্রবণীয় অর্থোফসফেট মুক্ত করে। বলা বাহুল্য বিভিন্ন প্রকৃতির জৈব এ্যাসিডের দ্রবণায়ন ক্ষমতা ভিন্ন হয়ে থাকে। সাধারণতঃ এ্যালিফেটিক শ্রেণীর হাইড্রক্সি এ্যাসিড, কিটো এ্যাসিড বা ডাই-কার্বক্সিলিক এ্যাসিডগুলিকে অতিরিক্ত দ্রবণায়ন ক্ষমতার অধিকারী হতে দেখা যায়। এ ছাড়া কয়েক শ্রেণীর রাসায়নিক স্বভোজী জীবাণু (Chemoantotroph) বিপাকীয় ক্রিয়ায় সালফিউরিক এ্যাসিড বা নাইট্রিক এ্যাসিড উৎপাদন করে থাকে। এরাও অদ্রবণীয় ফসফেট থেকে দ্রবণীয় ফসফেট মুক্ত করে থাকে, যদিও মাটিতে এটি একটি বিরল ঘটনা। এ ছাড়া অন্য পদ্ধতির মধ্যে, জীবাণুদের শ্বসনে উৎপন্ন কার্বন-ডাই-অক্সাইড একটা কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করে। কার্বন ডাই-অক্সাইড সিক্ত জমিতে কার্বলিক এ্যাসিড উৎপন্ন করে যা অদ্রবণীয় অজৈব ফসফেট থেকে দ্রবণীয় অর্থোফসফেট মুক্ত করতে সক্ষম। এ ছাড়া অক্সালিক এ্যাসিডের মত ডাই-কার্বক্সিলিক এ্যাসিড বা কিটো এ্যাসিডগুলি অদ্রবণীয় ক্যালসিয়াম

ফসফেটের, ক্যালসিয়ামের সঙ্গে বৃত্তাকার চিলেট উৎপন্ন করতে পারে (Chelate), এই বিক্রিয়ার ফলে ক্যালসিয়াম বন্দী হয়ে পড়ে এবং দ্রবণীয় অর্থোফসফেট মুক্ত হয়। এ ছাড়া জলমগ্ন ধান জমিতে কয়েক শ্রেণীর জীবাণু অবাত শ্বসন ক্রিয়ায় গন্ধক ঘটিত যৌগ থেকে সালফিউরেটেড হাইড্রোজেন (H_2S) মুক্ত করে। উৎপন্ন সালফিউরেটেড হাইড্রোজেন লোহার ফসফেটের সঙ্গে ক্রিয়ায় কালো ফেরাস সালফাইডের (FeS অধঃক্ষেপ ফেলে এবং ফসফোরিক এ্যাসিড মুক্ত করে দেয়। এইসব নির্দেশিত পথগুলির মধ্যে মাটিতে কিন্তু পরভোজী (heterotroph) জীবাণু-দ্বারা জৈব এ্যাসিড উৎপাদনই মুখ্য ভূমিকা নেয়। এই শ্রেণীর জীবাণুর বৃদ্ধির জন্য মুক্তজীবী নাইট্রোজেন বন্ধনকারী জীবাণুদের মতই মূল সমস্যা হল তাদের শক্তি উৎপাদনের জন্য কার্বনজাত পদার্থের জোগান দেওয়া। এর জন্য প্রয়োজন হয় জমিতে জৈবসার প্রয়োগের। **অর্থাৎ এইসব জীবাণুদ্বারা সুফল পেতে গেলে জৈবসার প্রয়োগের মাধ্যমে এদের প্রাথমিক চাহিদা পূরণ করতেই হবে।**

এবার আসা যাক সমস্যার কথায়। আমাদের দেশে প্রয়োজনীয় রাসায়নিক সারের খুব সামান্য অংশই উৎপন্ন করা সম্ভব হয়। এজন্য কষ্টার্জিত বিদেশী মুদ্রা ব্যয় করেও আমরা পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে বাধ্য হচ্ছি। এমতাবস্থায় সার-প্রাপ্তির অপ্রতুলতা ও সাধারণ কৃষকদের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে সারের মূল্যমাত্রা সমভাবে কৃষকদের চাষের জমিতে প্রয়োজনীয় সারের জোগান দেওয়া থেকে বঞ্চিত করছে। **বিকল্প হিসাবে, আমাদের দেশে যথেষ্ট পরিমাণে উত্তমমানের পাথুরে ফসফেটের (Rock phosphate) সন্ধান পাওয়া গেছে। এই পাথুরে ফসফেটের, ফসফেট অদ্রবণীয় পর্যায়ে থাকায় গাছের কাছে তাৎক্ষণিক গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠে না বটে, কিন্তু উপযুক্ত জীবাণুর ক্রিয়ায় এর থেকে বেরিয়ে আসা দ্রবণীয় অর্থোফসফেট গাছের প্রয়োজন মিটাতে পারে।** বলা বাহুল্য পরিমিত পরিমাণে জৈবসার প্রয়োগের ফলে এই প্রক্রিয়ার ক্ষমতা আরো বেড়ে যায়। এ ছাড়া যদি কোন উচ্চমানের জীবাণুকে জীবাণুসার হিসাবে প্রয়োগ করা যায় তবে সত্যি সস্তায় একটা সমস্যার সমাধান করা যাবে। পাথুরে ফসফেট ছাড়া আছে প্রাণীজ অস্থিচূর্ণ যাকে সুপার ফসফেট উৎপাদনে কাজে লাগানো হয়ে থাকে। প্রাণীজ অস্থিচূর্ণ পাথুরে ফসফেটের বিকল্প হিসাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

এ ছাড়া আছে ধাতু শিল্পের পরিত্যক্ত অংশ ধাতুমল। এর মধ্যেও যথেষ্ট পরিমাণে অদ্রবণীয় ফসফেট থাকে। ধাতুমল ক্ষারধর্মী হওয়ায় অম্ল মৃত্তিকায় এই উপসার খুবই ক্রিয়াশীল হয়ে থাকে।

ফসফেট দ্রবণে আনয়নকারী প্রচলিত জীবাণুসারের নাম হল ফসফোব্যাক্টিরিন। জীবাণুসার হিসাবে ফসফোব্যাক্টিরিনের ভূমিকা কিন্তু বিতর্কমূলক। **ব্যাসিলাস মেগাথেরিয়ামের** ফসফেট দ্রবণকারী স্ট্রেন (Strain) স্পোর বা রেণু উৎপাদনক্ষম হওয়ার জন্য জীবাণুসার হিসাবে রাশিয়ার বিজ্ঞানীরাই প্রথম কৃষি জমিতে এর প্রয়োগ শুরু করেন। তাঁদের পরীক্ষালব্ধ ফলাফল থেকে এই জীবাণুর উত্তম প্রতিক্রিয়া সূচিত হলেও তা আমেরিকার বিজ্ঞানীদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয় নি। তাই এই জীবাণু প্রয়োগের সম্ভাবনা সম্বন্ধে তারা সন্দিগ্ধ। অবশ্য ভারতবর্ষ বা অন্যান্য দেশগুলিতে ফসফেট ঘটিত জীবাণুসার প্রয়োগ করে যথেষ্ট সুফল পাওয়া গেছে। **ভবিষ্যৎ আরো আশাপ্রদ হবে, এই ধারণায় ভারতীয় কৃষিবিজ্ঞানীরা এই বিষয়ে নূতন নূতন দিগন্তে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন।**

কোন বিশেষ জমিতে কোন বিশেষ জীবাণুর সাফল্যলাভ প্রাথমিকভাবে কতকগুলি পূর্ব-নির্ধারিত পরিস্থিতির উপর নির্ভরশীল একথা আগেই বলা হয়েছে। যেমন ঐ জমিতে প্রযুক্ত জীবাণু আগে থেকেই যথেষ্ট সংখ্যায় উপস্থিত থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে কিছু সংখ্যক নূতন জীবাণু প্রয়োগের ফলে ফলাফলের কোন তারতম্য ধরা পড়বে না। এ ছাড়া ঐ জীবাণুকে নূতন দেশের নূতন মাটি এবং নূতন পরিবেশে অসম সংগ্রামে নামতে হয়। সেখানে সংগ্রামে তারা যে টিকবেই এটা হলফ করে বলা চলে না; আর পরীক্ষায় টিকে গেছে এটা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হবার পর যদি কোন সুফল না পাওয়া যায়, কেবলমাত্র তখনই ঐ জীবাণুর কার্যকারিতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করা চলে। সবচেয়ে বড় কথা, জমিতে দ্রবণীয় ফসফরাস যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান থাকলে জীবাণুরা ঐ ফসফরাস দিয়ে তাদের বিপাকীয় ক্রিয়া চালিয়ে নিতে পারে। এই পরিস্থিতিতে তারা অদ্রবণীয় ফসফেট থেকে দ্রবণীয় ফসফেট মুক্ত করতে উৎসাহী হয় না। এ ছাড়া কোন নির্দিষ্ট জমিতে প্রযুক্ত জীবাণুর উপর ক্রিয়াশীল প্রোটোজোয়া বা ভাইরাস থাকতে পারে যারা প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে প্রযুক্ত জীবাণুকে সবংশে নির্মূল করে দিতে পারে। অর্থাৎ দেখা

যাচ্ছে বাস্তবক্ষেত্রে জমিতে সাফল্যলাভের পথে সমস্যা অনেক। সকলে ভালোর দিকটাও ঠিক সহজে মেনে নিতে পারেন না। তাই আমেরিকান বা বৃটিশ বিজ্ঞানীরা যখন জীবাণুসারের সুফল পেয়েছেন তখন তাকে উদ্ভিদ হর্মোন উৎপাদনের ফল বলে অভিহিত করেছেন। কিছু কিছু জীবাণু উদ্ভিদ হর্মোন উৎপাদন করে সত্যি কিন্তু সব নাইট্রোজেন বন্ধনকারী বা ফসফেট দ্রবণকারী জীবাণু হর্মোন উৎপাদন করে না। জীবাণুর হর্মোন উৎপাদন ক্ষমতার কথা জানা থাকলেও তাঁরা এ ব্যাপারে আশাবাদী নন তার প্রমাণ হল বাস্তবে এইসব হর্মোন উৎপাদনক্ষম জীবাণু প্রয়োগের কোন প্রচেষ্টা তাঁরা করেন নি। কিন্তু আমাদের গবেষণালব্ধ ফলাফল বিশ্লেষণ করে আমরা নিশ্চিত বলতে পারি যে কোন জীবাণুসারের সুফল পেতে গেলে পূর্বারোপিত শর্তগুলি যেন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করে সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেই হবে। সেজন্য প্রয়োজন হবে আঞ্চলিক ভিত্তিতে ব্যাপক গবেষণার। **সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হল জীবাণুর দ্বারা ভালো ফল পেতে হলে তাদের কাজ করার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ রচনা করতেই হবে।** বিদেশের অতি উচ্চ মানের জীবাণুসার ও আমাদের দেশের মাটিতে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পিছু হঠতে বাধ্য। তাই আমাদের দেশে গবেষণালব্ধ আঞ্চলিক উচ্চমানের জীবাণু একই ধরনের মাটিতে প্রয়োগ করলে তাদের সাফল্য সম্বন্ধে অনেকটা নিশ্চিত হওয়া যাবে। এবার আমরা কয়েকটা পরীক্ষালব্ধ ফলাফলের তালিকা বিশ্লেষণ করে দেখব। প্রথমে দেখা যাক আমাদের ১৯৭৫ সালের একটা পরীক্ষায় ধান এবং গমের জমিতে বিভিন্ন জৈবসার প্রয়োগে মাটির ফসফেট দ্রবণকারী ব্যাক্টিরিয়ার সংখ্যা এবং তাদের দ্রবণ ক্ষমতা কতটা প্রভাবিত হয়েছে। (পরবর্তী পৃষ্ঠায় তালিকাটি দেখানো হল)

পরবর্তী পৃষ্ঠার পরীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখব যে খামার-জাত গোবরসার এবং পাথুরে ফসফেট যেখানে প্রযুক্ত হয়েছে সেখানেই এই জীবাণুর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। মাটির জীবাণু দ্বারা অদ্রবণীয় ফসফেটের দ্রবণ ক্ষমতা যে কার্বনজাত পদার্থের উপর নির্ভরশীল এই পরীক্ষার ফলাফল থেকে তা খুব স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। এ ছাড়া এ থেকে এটাও পরিষ্কার বোঝা যায় যে যেখানে পাথুরে ফসফেট প্রযুক্ত হয়েছে সেখানে দ্রবণীয় ফসফেটের পরিমাণ তুলনামূলক ভাবে বেড়েছে। আবার এই পরীক্ষা থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায়, জমিতে স্থানীয় জীবাণুর সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেই দ্রবণীয় ফসফেটের পরিমাণ বাড়ে না।

তালিকা ১ঃ জৈবসারের প্রভাবে ফসফেট দ্রবণকারী জীবাণুর প্রতিক্রিয়া (বণিক, ১৯৭৫)

জৈব উপসার	ধান		গম	
	ফসফেট ব্যাক্টিরিয়ার সংখ্যা × ১০⁸	ফসফেট দ্রবণ ক্ষমতা মিলিগ্রামে প্রতি ১৫ মিলিগ্রাম $Ca_3(PO_4)_2$ হইতে	ফসফেট ব্যাক্টিরিয়ার সংখ্যা × ১০⁸	ফসফেট দ্রবণ ক্ষমতা মিলিগ্রাম প্রতি ১৫ মিলিগ্রাম $Ca_3(PO_4)_2$ হইতে
পরীক্ষার পূর্বের মাটি	১০৯	০·১১৫	১০৯	০·১১৫
রাইজোস্ফিয়ারের মাটি				
নিয়ন্ত্রিত	২৭৯	০·৬৪	১৮১	০·৫৭
খামারজাত সার	৩৫৬	১·০৫	২৪১	০·৬৫
শহরের আবর্জনা-জাত সার	৪১৬	০·৩৯৫	১৪০	০·৭৩
এমোনিয়াম সালফেট	১৮০	০·৫৯৫	১৫৯	০·৩৫
ধানের খড় + পাথুরে ফসফেট	৩৮১	০·৭৩৫	১৩০	০·৮১৫
এমোনিয়াম সালফেট + পাথুরে ফসফেট	৩৬০	০·৮৭	১৬৮	০·৮৫৫
ধানের খড় + এমোনিয়াম সালফেট	৩৫২	১·০৩	১০৯	০·৬২

কারণ পরিবেশ অধিক সক্রিয় এবং অপেক্ষাকৃত কম কার্যকর সকল শ্রেণীর জীবাণুকেই সমানভাবে বংশবৃদ্ধির সুবিধা দেয়, যার ফলে নিম্নমানের জীবাণুর সংখ্যা বৃদ্ধি পায় যা তাদের কার্যক্ষমতার উপর প্রতিফলিত হয় না। এবার জমি থেকে বাছাই করা অধিক ক্ষমতাশালী জীবাণু কেমন ফল দেয় তার একটা তুলনামূলক ফলাফলের তালিকা দেখব।

তালিকা ২ : মাটির ফসফেট দ্রবনায়ণ ক্ষমতা (বণিক, ১৯৮০)

মাটি	গড় দ্রবণ ক্ষমতা মাইক্রোগ্রাম (μg. দ্রবণীয় ফসফরাস প্রতি ১৫ মিলিগ্রাম $Ca_3(PO_4)_2$ হইতে
এলুভিয়াল (বারুইপুর)	১১·৯
ল্যাটারাইট (কাপগাড়ি)	৫৭·৩

এরপর উপরোক্ত দুইটি মাটি থেকে নির্বাচিত দুটি করে ব্যাক্টিরিয়া, দুটি করে ছত্রাক এবং একটি করে এক্টিনোমাইসিটসের ফসফেট দ্রবনায়ণ ক্ষমতার মূল্যায়ন তালিকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখানো হল।

পরবর্তী পৃষ্ঠায় তালিকা ৩ থেকে পরীক্ষায় তুলনামূলক বিচারে দেখা যায় রাশিয়ার একটি উচ্চ শক্তিশালী ব্যাসিলাস মেগাথেরিয়ামের অদ্রবণীয় ফসফেট দ্রবনায়ণের ক্ষমতা একই পরিস্থিতিতে মাত্র ৬৭·৫ মাইক্রোগ্রাম। অর্থাৎ স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে বিদেশী উচ্চমানের জীবাণুর চেয়ে আমাদের

তালিকা ৩ঃ কতিপয় নির্বাচিত জীবাণুর ফসফেট দ্রবনায়ণ ক্ষমতা
(বণিক এবং দে, ১৯৮১)

বারুইপুরের এলুভিয়াল মাটির জীবাণু	গড় দ্রবণ ক্ষমতা μg দ্রবণীয় ফস-ফরাস প্রতি ১৫ মিলিগ্রাম $Ca_3(PO_4)_2$ হইতে	কাপগাড়ির ল্যাটারাইট মাটির জীবাণু	গড় দ্রবণ ক্ষমতা μg দ্রবণীয় ফস-ফরাস প্রতি ১৫ মিলিগ্রাম $Ca_3(PO_4)_2$ হইতে
ব্যাসিলাস ফারমাস	৪৩·২	ব্যাসিলাস ফারমাস	৭৩·২
ব্যাসিলাস কোএগুল্যান্স	৮৯·০	ব্যাসিলাস প্রজাতি	১৪৪·৯
স্ট্রেপটো-মাইসিস প্রজাতি	২৪·৫	স্ট্রেপটো-মাইসিস প্রজাতি	৬০ ৪
এসপারজিলাস ফিউমিগ্যাটাস	২৫০·২	এসপারজিলাস প্রজাতি	১৬৭·০
এসপারজিলাস ক্যাণ্ডিডাস	২৩৬·৫	পেনিসিলিয়াম প্রজাতি	১৬৫·০

দেশের মাটি থেকে আহৃত, নির্বাচিত জীবাণুই আমাদের দেশের মাটিতে বেশী ভালো ফল দেবে।

এবার সৌরের ১৯৭২ সালে গম (কল্যাণ সোনা) শস্যের উপর বিভিন্ন ফসফেট দ্রবণকারী ব্যাসিলাস গণের ব্যাক্টিরিয়া প্রয়োগ সমন্বিত পরীক্ষার তালিকা পর্য্যালোচনা করে দেখা যাক।

তালিকা ৪ঃ ফসফেট দ্রবণক্ষম জীবাণু প্রয়োগে শস্যের উপর প্রতিক্রিয়া

(গৌড়, ১৯৭২)

উপাদান	দানা শস্য উৎপাদন গ্রাম প্রতি পটে	খড় উৎপাদন গ্রাম প্রতি পটে	শস্যের ফসফেট গ্রহণ মিলিগ্রাম
নিয়ন্ত্রিত মাটি	১৬·৫	১৫·৬	৯৭·৬
মাটি + পাথুরে ফসফেট* (হেক্টর প্রতি ৫০০ কেজি P_2O_5 হিসাবে)	১৩·৬	১৩·৫	৮৪·১
মাটি + পাথুরে ফসফেট* + ফসফোব্যাক্টিরিন	১৩·৩	১৫·১	৬৫·০
মাটি + পাথুরে ফসফেট* + ব্যাসিলাস পালভিফেসিয়েন্স	১৯.৫	১৯·১	১০৫
মাটি + পাথুরে ফসফেট* + ব্যাসিলাস পলিমিক্সা	২২·৭	২৩.৮	১৩০·৫
মাটি + ফসফোব্যাক্টিরিন	১২·৭	১৩·২	৬৫·৫
মাটি + ব্যাসিলাস পালভিফেসিয়েন্স	১১·৪	১৩·৯	৬৮·৪
মাটি + ব্যাসিলাস পলিমিক্সা	১২·০	১৩·০	৭২·০
মাটি + সুপার ফসফেট (হেক্টর প্রতি ১৫০ কেজি P_2O_5)	২৩·৬	২৬·১	১৩৬

এই পরীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় জমির নিজস্ব জীবাণুর ক্রিয়ার উপর নির্ভর করে পাথুরে ফসফেট প্রয়োগ করলে কোনই লাভ হয় না। পক্ষান্তরে বিদেশী ফসফোব্যাক্টিরিন অপেক্ষা দেশী জীবাণুই ভালো ফল দিয়েছে।

বিশেষ করে **ব্যাসিলাস পলিমিক্সার** ক্রিয়া প্রায় হেক্টর প্রতি জমিতে ১৫০ কেজি P_2O_5 (সুপার ফসফেট হিসাবে) প্রয়োগের তুল্য। এই পরীক্ষার ফলাফলের উপর সন্দেহের উদ্রেক না হওয়ার জন্য প্রথমেই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে মাটিতে প্রাথমিক পর্যায়ে এক শতাংশ (ওজন হিসাবে) খামারজাত সার এবং হেক্টর প্রতি ২০০ কেজি নাইট্রোজেন ও হেক্টর প্রতি ১০০ কেজি K_2O প্রয়োগ করা হয়েছিল।

অনুরূপ সিদ্ধান্তের জন্য আমরা সেন এবং পালের (১৯৫৮) ক্যাসিয়া অসিডেন্টালিসের গ্রন্থি থেকে (*Cassia occidentalis*) প্রাপ্ত ফসফেট দ্রবণকারী ব্যাক্টিরিয়ার সঙ্গে চেকোশ্লোভাকিয়ার এক উন্নত মানের জীবাণুর তুলনামূলক ক্রিয়াকলাপের তালিকা পর্যালোচনা করে পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখান হল।

এই পরীক্ষালব্ধ ফলাফলের পর সম্ভবতঃ স্থানীয় উচ্চমানের জীবাণুর ক্রিয়া-ক্ষমতা সম্বন্ধে সন্দেহ থাকতে পারে না।

জীবাণু নির্বাচন এবং শিল্পভিত্তিতে উৎপাদন প্রসঙ্গে প্রথম স্থান দখলকারী হল ব্যাক্টিরিয়া। কারণ অনেক ছত্রাক পরীক্ষাগারে অতি উত্তম ফল দেখালেও মাটিতে তাদের ক্রিয়া ক্ষমতা সন্দেহের অবকাশ রাখে। অপরপক্ষে স্পোর গঠন-কারী ব্যাক্টিরিয়া অনেক বেশী প্রতিকূল পরিবেশেও কার্যক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে। তাই জীবাণুসার প্রয়োগের ক্ষেত্রে **ব্যাসিলাস** গণের ব্যাক্টিরিয়াকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়। দ্রুত বৃদ্ধিহারের জন্য বৃহদায়তনে এদের উৎপাদন করাও অপেক্ষাকৃত সহজ। পরিশেষে আমরা জীবাণুসার উৎপাদন ও প্রয়োগ প্রসঙ্গে আলোচনা করব।

অন্যান্য জীবাণুদের মতই ফসফোব্যাক্টিরিনকে অবিরাম পদ্ধতিতে (Continuous culture) শিল্পভিত্তিতে উৎপাদন করা সম্ভব। সাধারণতঃ ফসফো-ব্যাক্টিরিন প্রয়োগের নির্ধারিত পরিমাণ হল হেক্টর প্রতি জমিতে ৫-১৫ গ্রাম শুকানো জীবাণুর পাউডার। **ব্যাসিলাস** সবাত শ্বসজীবী হওয়ায় তাদের উৎপাদনের জন্য সবাত পরিবেশ সৃষ্টি করতে হয়। সাধারণতঃ ১০০০-৩০০০ লিটার ক্ষমতাযুক্ত আধারে সন্ধান প্রক্রিয়া চালানো হয়। উপযুক্ত পুষ্টি দ্রবণে জীবাণু প্রয়োগ করে তাতে অতিক্ষুদ্র বুদ্বুদাকারে প্রতি মিনিটে লিটার প্রতি দ্রবণে ১-৩ লিটার নির্বীজ বায়ু চালনা করা হয়। এই বায়ু চালনার ফলে জীবাণুগুলি সমানভাবে মিশতে পারে এবং এতে তারা প্রয়োজনীয় অক্সিজেনের সরবরাহও

তালিকা ৫ঃ বিভিন্ন অদ্রবণীয় ফসফেটের প্রভাবে ফসফেট দ্রবণক্ষম জীবাণুর তুলনামূলক দ্রবণক্ষমতা

(সেন এবং পাল, ১৯৫৮)

ফসফেটের উৎস	নাইট্রোজেনের উৎস	পুষ্টি দ্রবণে P_2O_5-এর পরিমাণ (মিলিগ্রাম প্রতি ১০০ সিসি দ্রবণে)		
		নিয়ন্ত্রিত	ক্যাসিয়া অসিডেন্টালিস থেকে প্রাপ্ত জীবাণু দ্বারা অতিরিক্ত দ্রবণায়ন	চেকোশ্লোভাকিয়ার ফসফোব্যাক্টিরিয়াম ফসফো-২৪ দ্বারা অতিরিক্ত দ্রবণায়ন
ক্যালসিয়াম ফসফেট $Ca_3(PO_4)_2$	অ্যামোনিয়াম সালফেট	২৩·২০	৩০·২৩	১৮·৯৬
	পেপটোন	২০·০৪	২৯·০৩	১৯·২৭
	সোডিয়াম নাইট্রেট	৩১·৬০	২৪·৫১	৭·০৭
	ইউরিয়া	৩৩·১৯	১৩ ২০	১৩ ৯৮
ক্যালসিয়াম গ্লিসারোফসফেট	অ্যামোনিয়াম সালফেট	৩৯·৬৮	১১·০৩	১২·০৭
	পেপটোন	৩৪·৮৫	৩২·০৪	— ৩৪ ৩০
	সোডিয়াম নাইট্রেট	৪০·৯২	৩·৫	— ০·২৩
	ইউরিয়া	১৮·০৩	৪১·৯১	৩৮·৮১
অস্থিচূর্ণ	অ্যামোনিয়াম সালফেট	২·৪৬	৩৫·১৪	৩৪·৬৯
	পেপটোন	২ ২৯	১৮·৯৬	১·৪১
	সোডিয়াম নাইট্রেট	০·৭০	২·১৬	২·৫৭
	ইউরিয়া	০·৭৯	০·৭২	০·১৪

পায়। সাধারণ হিসাবে ১০০ লিটার পাত্রে ৫০ শতাংশ জলীয় অংশযুক্ত এক কিগ্রা ফসফোব্যাক্টিরিন উৎপন্ন হয়ে থাকে। উৎপন্ন কোষগুলিকে নিম্নচাপে — ২০ থেকে — ২৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় শুষ্ক বরফের মধ্যে সংরক্ষণ করা হয়।

সাধারণতঃ জমিতে প্রয়োগের জন্য গভীর প্রকোষ্ঠ পদ্ধতিতে যে জীবাণু উৎপাদন করা হয় তার সংখ্যা প্রতি মিলিলিটার পুষ্টি দ্রবণে $১ \times ১০^{৯} - ২ \times ১০^{৯}$ সংখ্যক পর্যন্ত হয়ে থাকে। উৎপাদন সমস্যার মধ্যে প্রধান হল বহিরাগত অন্য জীবাণুর প্রবেশ প্রতিরোধ করা এবং ফাজের আক্রমণ হতে জীবাণুকে রক্ষা করা। এই জীবাণু স্পোর গঠনকারী বলে এর বাহ্যিক সহ্য ক্ষমতা সাধারণ জীবাণুর চেয়ে অনেক বেশী। তাই উৎপাদনের সময় বেশীর ভাগ কোষগুলি যাতে স্পোরে পরিণত হয় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা হয়।

ফসফেট দ্রবণকারী জীবাণুর ক্রিয়া বিতর্কমূলক হলেও আমাদের দেশে এই জীবাণু সার প্রয়োগে শতকরা ৫-২০ ভাগ ফলন বৃদ্ধি পেতে দেখা গেছে। এই জীবাণুর সার্থক ক্রিয়ার জন্য অম্ল জমিতে পরিমিত পরিমাণে চুন দিতে হবে। অন্যথায় জীবাণুর ক্রিয়া ব্যাহত হবে। জমিতে হিউমাসের পরিমাণ, জীবাণু প্রয়োগের আগে নির্ণয় করে প্রয়োজন হলে পরিমাণ মত জৈবসার প্রয়োগ করতে হবে। এই জীবাণুসারের প্রয়োগ বীজের সঙ্গে বা চারাগাছ জন্মানোর পরেও প্রয়োগ করা চলতে পারে। গাছকে বাড়তি দ্রবণীয় ফসফরাসের যোগান দেওয়ার জন্য জমিতে পাথুরে ফসফেট, অস্থি-চূর্ণ বা শিল্পজাত ধাতুমল ইত্যাদি প্রয়োগ করা অবশ্য কর্তব্য। বহু ফসফেট দ্রবণকারী জীবাণু ইনডোল অ্যাসিটিক এ্যাসিড, অক্সিন বা জিব্বারলিনের মত বা অন্য অনেক অজানা উদ্ভিদ উদ্দীপক রাসায়নিক পদার্থ উৎপাদনে সক্ষম বলে অনেক বিজ্ঞানীর ধারণা। পক্ষান্তরে এই জীবাণু অলটারনেরিয়া সোলানি (*Alternaria solani*), রাইজকটোনিয়া সোলানি (*Rhizoctonia solani*), ফিউসারিয়াম উডাম (*Fusarium udum*), হেলমিন্থো-স্পোরিয়াম অরাইজি (*Helminthosporium oryzae*) ইত্যাদি রোগ উৎপাদনকারী ছত্রাকের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রিত করে। অদ্রবণীয় ফসফেট দ্রবণীয় করে এই জীবাণু গাছের মূলের পরিমণ্ডলে উপকারী জীবাণুর বংশবৃদ্ধির অনুকূল পরিবেশ রচনা করে। সার্বিক বিশ্লেষণে এই জীবাণুসার প্রয়োগের কোন

প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া আজ পর্যন্ত লক্ষিত হয় নি। এর সম্ভাবনাময় প্রতিশ্রুতি আমাদের আরো ভালোভাবে কাজে লাগানো উচিত।

পরীক্ষাগারে কৃত্রিম পরিবেশে উন্নতমানের ব্যাক্টিরিয়া বা ছত্রাকের ক্রিয়া অবলম্বনে আধা শিল্প পদ্ধতিতে পাথুরে ফসফেটকে অর্দ্ধমথিত (half decomposed) করে জমিতে প্রয়োগের সম্ভাবনা নিয়ে আজকাল বহু বিজ্ঞানী গবেষণা চালাচ্ছেন। এই পদ্ধতি সাফল্যলাভ করলেও তাতে কৃষিজীবীদের ফসফেট ঘটিত সারের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে অনেকটা সুরাহা হবে।

কীটনাশক হিসাবে জীবাণু ১২

কৃষিক্ষেত্রের বিভিন্ন পদক্ষেপে জীবাণুর প্রয়োগ এবং ভূমিকা সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে এবার আর একটি নূতন দিকের প্রতি আমরা আলোকসম্পাত করব। সম্ভবতঃ এরিষ্টটল প্রথম মৌমাছির (অতি পরিচিত কীট) রোগের ঘোষণা করেন যা হল পতঙ্গের জীবাণুঘটিত রোগ সম্বন্ধে মানুষের প্রথম জ্ঞানলাভ। এরপর গ্রীক এবং রোমান কবি, সাহিত্যিক এবং প্রকৃতি বিজ্ঞানীরা একাধিক কীটান্তর রোগের কথা উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে মৌমাছি এবং রেশম মথের কথা তাঁরা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে বাস্‌সি (১৮৩৫) এবং এরপর পাস্তর (১৮৭০) প্রথম দেখান যে, একটি জীবাণু-ছত্রাক **বিউভেরিয়া ব্যাসিয়ানা** (*Beauveria bassiana*) রেশম মথের এক সংক্রামক ব্যাধি-সৃষ্টি করে। বাস্‌সি, এই আবিষ্কারের পর নিয়ন্ত্রিত উপায়ে জীবাণু প্রয়োগ করে কীটনাশকের বিকল্প হিসাবে জীবাণুর প্রয়োগ সম্ভাবনার কথা ঘোষণা করেন। পাস্তরের গবেষণা অপকারী কীট নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে ছিল না বরং তাঁর গবেষণার লক্ষ্যবস্তু ছিল রেশম মথের এবং মৌমাছির মত উপকারী পতঙ্গের রোগ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে। এইসব গবেষণাই বর্তমান কীটনাশক জীবাণু সম্পর্কীয় গবেষণার মূল প্রেরণা বলা যেতে পারে।

সম্ভবতঃ ডি' হেরেল ১৯১৪ সালে প্রথম ব্যাক্টিরিয়াকে পতঙ্গ বিনাশকারী হিসাবে ব্যবহারের চেষ্টা করেন। এরপর ১৯৪০ সালে হোয়াইট এবং ডাটকি একটি রেণু (স্পোর) উৎপাদনকারী ব্যাক্টিরিয়া **ব্যাসিলাস পপিলিই** (*Bacillus popilliae*) প্রয়োগ করে জাপানী গুবরে পোকার প্রথম সার্থক নিয়ন্ত্রণে সমর্থ হন। এই গবেষণা পরবর্তী বিজ্ঞানীদের অনুপ্রাণিত করে এবং এর ফলে আরো কার্যকর ব্যাক্টিরিয়ার সন্ধান পাওয়া যায়।

বাল্চ এবং বার্ড ১৯৪৪ সালে প্রথম ভাইরাসকে পতঙ্গবিনাশকারী হিসাবে চিহ্নিত করায় গবেষণায় সাফল্যলাভ করেন। বর্তমানে আমেরিকায় পরিবেশ সংরক্ষণ সংস্থা নামে (Environmental protection Agency, EPA) একটা সংস্থা গড়ে উঠেছে। কোন জীবাণুকে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদন বা প্রয়োগের পূর্বে এই সংস্থার অনুমোদন প্রয়োজন হয়।

প্রায় দশলক্ষ প্রজাতির পরিচিত পতঙ্গের মধ্যে, ১৫ হাজার প্রজাতিকে বিভিন্ন রোগ উৎপাদনকারী হিসাবে চিহ্নিত করা চলে। এদের মধ্যে তিনশটি প্রজাতি সংক্রামক ব্যাধির সৃষ্টি করতে পারে। তাই তাদের নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন হয়। সৌভাগ্যবশতঃ প্রায় সবগুলি প্রজাতির ক্ষতিকারক পতঙ্গেরই বিনাশকারী জীবাণুর সন্ধান পাওয়া গেছে। **প্রায় ১৫০০ পতঙ্গ বিনাশক ছত্রাক, ভাইরাস, প্রোটোজোয়া বা ব্যাক্টিরিয়ার সঙ্গে আজ আমরা পরিচিত।** এদের মধ্যে ব্যাক্টিরিয়া এবং ভাইরাস, প্রয়োগের সুবিধা এবং উদ্ভিদ প্রাণী বা মানুষের উপর কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া না সৃষ্টি করার সুবাদে, অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হচ্ছে। ছত্রাককে পতঙ্গ বিনাশকারী হিসাবে ব্যবহার আজও সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠে নি এবং প্রোটোজোয়ার কার্যকারিতা এখনও পরীক্ষামূলক পর্যায়ে আবদ্ধ রয়েছে। যে কোন পতঙ্গ বিনাশকারী জীবাণুর (ছত্রাক, ব্যাক্টিরিয়া, ভাইরাস বা প্রোটোজোয়া যাই হোক না কেন) সার্থক প্রয়োগের জন্য এদের বেশ কয়েকটা গুণ বা পূর্বশর্ত মেনে চলতে হবে। এই গুণগুলি হল (১) এদের সহজলভ্য হতে হবে এবং সহজে বৃহৎ শিল্প পদ্ধতিতে উৎপাদন যোগ্য হতে হবে, (২) এরা নির্দেশিত কীটপতঙ্গ ছাড়া, গাছ বা অন্য উপকারী পতঙ্গের উপর ক্ষতিকারক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে না এবং (৩) এরা নির্দেশিত পতঙ্গকে সার্থকভাবে নির্মূল করতে সমর্থ হবে। কিন্তু সর্বোপরি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে এদের উৎপাদন এবং প্রয়োগ আর্থিক দিক থেকেও লাভজনক হতে হবে। এইসব বন্ধনের গণ্ডি ছাড়িয়ে উন্নত দেশগুলিতে এই গবেষণা যথেষ্ট প্রসারলাভ করেছে এবং কীটনাশক জীবাণু পণ্য হিসাবে বাজারের দ্বারস্থ হয়েছে। এককভাবে এইসব জীবাণুর সম্বন্ধে আলোচনার আগে আমরা এদের নাম এবং এরা যেসব পতঙ্গকে ধ্বংস করে থাকে তাদের নামের তালিকা দেখব।

তালিকা ১ : কয়েকটি সার্থক পতঙ্গনাশক জীবাণুর পরিচিতি
(এণ্ডারসন এবং ইগনোফা, ১৯৬৭)

পতঙ্গবিনাশকারী জীবাণু	নির্দেশিত পতঙ্গ
ব্যাক্টিরিয়া	
ব্যাসিলাস পপিলিই (*Bacillus popilliae*)	জাপানী গুবরে পোকা
ব্যাসিলাস থুরিনজেনসিস (*Bacillus thuringiensis*)	বিভিন্ন শ্রেণীর শুঁয়াপোকা
কোক্কোব্যাসিলাস এক্রিডিয়োরাম (*Coccobacillus acridiorum*)	ফড়িং
সেরাসিয়া মারসেস্যান্স (*Serratia marcescens*)	উইপোকা
ভাইরাস	
নিউক্লীয় পলিহেড্রোসিস (*Nuclear polyhedrosis*)	ইউরোপীয় পাইনকাঠ ছিদ্রকারী পোকা, আলফা আলফা আক্রমণকারী শুঁয়া-পোকা, ঘুনপোকা ইত্যাদি।
সাইটোপ্লাজমীয় পলিহেড্রোসিস (*Cytoplasmic polyhedrosis*)	পাইনগাছ আক্রমণকারী পোকা
গ্রানুলোসিস (*Granulosis*)	লাল পাতা পাকানো পোকা, বাঁধাকপি ছিদ্রকারী পোকা
ছত্রাক	
এন্টোমোপথোরা প্রজাতি (*Entomopthora* spp.)	বাদামী লেজযুক্ত মথ
বিউভেরিয়া প্রজাতি (*Beauveria* spp.)	ধূসর বর্ণের ছারপোকা আলুর গুবরে পোকা
মেটারাইজিয়াম এনিসোপ্লিই (*Metarrhizium anisopliae*)	শস্য ছিদ্রকারী পোকা
প্রোটোজোয়া	
থেলোহানিয়া হাইফানট্রি (*Thelohania hyphantriae*)	ঝর্ণার জলচর পাখির পায়ের চামড়ার মধ্যের পোকা
মালামিবা লোকাস্টি (*Malameba locustiae*)	ফড়িং

তালিকা ২ : বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদিত কয়েকটি পতঙ্গনাশক জীবাণু

(ইগনোফো এবং এণ্ডারসন, ১৯৭৯)

রোগ উৎপাদনকারী জীবাণু	বাণিজ্যিক পরিচয়	উৎপাদক সংস্থা
বিউভেরিয়া ব্যাসিয়ানা (*Beauveria bassiana*)	বিউভেরিয়া ব্যাসিয়ানা বিউভেরিয়া স্পোর বোভেরিন	আন্তর্জাতিক খনিজ এবং রাসায়নিক সংস্থা—আমেরিকা, নিউ ট্রিলাইট প্রোডাক্ট—আমেরিকা গ্লাভমিক্রোবায়োপ্রোম—রাশিয়া
মেটারাইজিয়াম এনিসোপ্লিই (*Metarrhizium anisopliae*)	মেটারাইজিয়াম এনিসোপ্লিই	আন্তর্জাতিক খনিজ এবং রাসায়নিক সংস্থা—আমেরিকা
ব্যাসিলাস স্ফেরিকুলাস (*Bacillus sphericulas*)	ব্যাসিলাস স্ফেরিকুলাস	আন্তর্জাতিক খনিজ এবং রাসায়নিক সংস্থা—আমেরিকা
ব্যাসিলাস পপিলিই (*B. popilliae*)	ডুম	ফেয়ারফাক্স বায়োলজিক্যাল ল্যাবরেটরি—আমেরিকা
ব্যাসিলাস ল্যাণ্টিমরবাস (*B. lantimorbus*)	জাপিডেমিক	ডাইটাম কর্পোরেশন—আমেরিকা
ব্যাসিলাস থুরিনজেনসিস (*B. thuringiensis*)	এগ্রিটল ব্যাক্টোস্পিন	মার্ক এণ্ড কোম্পানি—আমেরিকা পিচিনি প্রোজিল ল্যাবরেটরি—ফ্রান্স

রোগ উৎপাদনকারী জীবাণু	বাণিজ্যিক পরিচয়	উৎপাদক সংস্থা
	ব্যাথুরিন	কেমাপোল—চেকোশ্লো-ভাকিয়া
	বায়োস্পোর ২৮০২	ফারবেয়ার্ক হোয়েট—জার্মানি
	এন্টোব্যাক্টেরিন ৩	অল ইউনিয়ন ইনস্টিটিউট প্লান্ট প্রোটেকশন-রাশিয়া
	থুরিসাইড	আন্তর্জাতিক খনিজ এবং রাসায়নিক সংস্থা ——আমেরিকা
পলিহেড্রোসিস ভাইরাস		
হেলিওথিস (Heliothis)	বায়োট্রল VHZ	নিউ ট্রলাইট প্রোডাক্টস আমেরিকা
	ভাইরেক্স	হেজ-স্যামন্স—আমেরিকা
নিওডিপ্রিয়ন (Neodiprion)	পলিভাইরোসাইড	ইণ্ডিয়ান ফার্মব্যুরো কোম্পানি—আমেরিকা
প্রোডেনিয়া (Prodenia)	বায়োট্রল VPO	নিউ ট্রলাইট প্রোডাক্টস —আমেরিকা
স্পোডোপটেরা (Spodoptera)	বায়োট্রল VSE	নিউ ট্রলাইট প্রোডাক্টস —আমেরিকা
ট্রাইকোপ্লুসিয়া (Trichoplusia)	বায়োট্রল VTN	নিউ ট্রলাইট প্রোডাক্টস —আমেরিকা
ডেনড্রোলিমাস (Dendrolimus)	মাতসুকেমিন	কুমিআই কেমিক্যাল ইণ্ডাস্ট্রিজ কোম্পানি লিমিটেড—জাপান

পতঙ্গবিনাশ জীবাণুর ব্যবহারে নিরাপত্তার প্রশ্ন :

যেহেতু জীবাণু কীটনাশক সজীব পদার্থ, বংশবিস্তারে সক্ষম এবং রোগ উৎপাদনকারী হিসাবেই পরিচিত তাই তাদের ব্যবহারের আগে নিরাপত্তার প্রশ্নটাই মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু যেহেতু এই শ্রেণীভুক্ত জীবাণু খুবই সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে কার্যকর তাই এদের দ্বারা অন্য অনির্দেশিত প্রাণী বা উদ্ভিদের বিপদের সম্ভাবনাও কম। এইসব জীবাণু আমাদের চতুর্দিকের পরিবেশে ছড়িয়ে আছে, তবু আজ পর্যন্ত এদের দ্বারা পরীক্ষাগারে, কৃষিজমিতে বা এইসব জীবাণু প্রয়োগ লব্ধ পণ্য আমাদের খাদ্য হিসাবে ব্যবহারের ফলে কোনরকম ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া দেখা যায় নি। এইসব অপ্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ থেকেই সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় উল্লিখিত জীবাণু পতঙ্গনাশক, রাসায়নিক পতঙ্গনাশক অপেক্ষা নিম্নমানের ত নয়ই, ক্ষতিকারকও নয়। তা সত্ত্বেও এইসব সিদ্ধান্তকে দ্বিধাহীনভাবে মেনে নেওয়া চলে না। বিশেষ করে কোন নূতন অপরীক্ষিত জীবাণু প্রয়োগ করার পর ফলাফল যথেষ্ট নিষ্ঠা এবং গুরুত্বের সঙ্গেই বিশ্লেষণ করা হয়ে থাকে। এইসব জীবাণু সরাসরি উদ্ভিদ, প্রাণী বা মানুষের ক্ষতি না করলেও এরা স্বাভাবিকভাবেই কিছু বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ (toxin) মোচন করতে পারে যা অপ্রত্যক্ষভাবে যথেষ্ট ক্ষতির কারণ হতে পারে। তাই এইসব জীবাণু ব্যবহারের আগে বিভিন্ন নিরাপত্তামূলক পরীক্ষায় সন্দেহাতীতভাবে উত্তীর্ণ হতে হবে। এ ধরনের জীবাণু প্রয়োগে যেমন খরচ সাশ্রয় হয় তেমনই রাসায়নিক বিষক্রিয়ার হাত থেকেও গৃহপালিত পশু এবং মানুষকে রক্ষা করে থাকে। যে কোন জমিতে (পতঙ্গ বিনাশকারী জীবাণুই হোক বা কৃত্রিম রাসায়নিক পদার্থই হোক) কীট-নাশক প্রয়োগ করলে সমাজের স্বার্থেই সেই জমিকে চিহ্নিত করতে হবে যেন তার থেকে কোন বৃহত্তর বিপদের ঝুঁকি না আসে। সাধারণতঃ খাদ্য হিসাবে ব্যবহারের আগে খাদ্যপণ্যকে ভালোভাবে জলে ধুয়ে নিলে এইসব বিষক্রিয়া অনেকাংশে কমতে পারে। রাসায়নিক পতঙ্গনাশক সম্বন্ধে বলা যায়, এগুলি উদ্ভিদে প্রয়োগ করা হলে এরা শীঘ্রই জীবাণুর ক্রিয়ায় নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। জীবাণু পতঙ্গনাশকদের এরকম কোন আশঙ্কা নেই যদিও প্রাথমিক পর্যায়ে তাদের নূতন পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর জন্য লড়াই করতে হয়।

এ ছাড়া অন্য দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলা চলে, রাসায়নিক পতঙ্গ নাশক পদার্থ অবিকৃত থেকে গেলে ঐ কীটনাশক পদার্থের রাসায়নিক বিষক্রিয়া থেকে গবাদি পশু, জলের মাছ এমন কি মানুষ কেউ মুক্তি পায় না।

কেবলমাত্র পতঙ্গ বিনাশকারী হিসাবেই আজ জীবাণুকে ব্যবহার করা হচ্ছে বা নূতন পতঙ্গনাশক জীবাণুর সন্ধানে গবেষণা চালানো হচ্ছে। আশা করা যায় নিকট ভবিষ্যতে এইসব গবেষণা আরো প্রসারলাভ করবে এবং জীবাণু দ্বারাই তখন রোগ উৎপাদনকারী ক্ষতিকর জীবাণুর নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হবে আরো সার্থকভাবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এইসব নূতন দিগন্তের পথনির্দেশে গবেষণা ভারতের মত দরিদ্র দেশেই খুব দ্রুত গ্রহণ করা উচিত, কিন্তু আজও এইসব গবেষণার ফলাফল প্রয়োগের ক্ষেত্র রাশিয়া, আমেরিকা, ফ্রান্স বা জাপানের মত কয়েকটা উন্নত দেশেই সীমাবদ্ধ। **তাই জাতীয় উন্নয়নের স্বার্থে এদিকে দৃষ্টি দিতে হবে।**

পতঙ্গনাশক হিসাবে ব্যাক্টিরিয়া : শতাধিক পতঙ্গনাশক জীবাণুর মধ্যে কেবলমাত্র তিনটি ব্যাক্টিরিয়াই সার্থকভাবে পতঙ্গনাশক হিসাবে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদনের জন্য গৃহীত হয়েছে। রেণু গঠনকারী এই তিনটি ব্যাক্টিরিয়া হল ব্যাসিলাস পপিলিই, ব্যাসিলাস থুরিনজেনসিস এবং ব্যাসিলাস মরিটাই (*Bacillus moritai*)। এদের কোষের অভ্যন্তরে (in vivo) বা কোষের বাইরে (in vitro) উৎপাদন করা চলে। এদের মধ্যে **ব্যাসিলাস পপিলিই**-কে (পরজীবী) কেবলমাত্র জাপানী গুবরে পোকার মধ্যে চাষ করতে হয়। কিন্তু **ব্যাসিলাস থুরিনজেনসিস** বা **ব্যাসিলাস মরিটাই**কে চিরাচরিত সন্ধান পদ্ধতিতে (fermentation) উৎপাদন করা যায়। লক্ষ্য করার বিষয় হল পতঙ্গ রোগ উৎপাদনকারী প্রায় সব ব্যাক্টিরিয়াই রেণু উৎপাদনকারী। এদের বিশেষ সুবিধা হল এরা প্রতিকূল পরিবেশেও বেশ কিছু সময় টিঁকে থাকতে পারে। উপরোক্ত তিনটি ছাড়াও বেশ কিছু রেণু গঠনকারী ব্যাক্টিরিয়ার সন্ধান পাওয়া গেলেও তারা সহজে উৎপাদন, গৃহপালিত পশু, মাছ বা মানুষের উপর প্রতিক্রিয়ার প্রশ্নে সন্দেহাতীত প্রমাণিত হয় নি। আশা করা যায় আগামী দশকে এ বিষয়ে আরো অগ্রগতি হবে।

পতঙ্গনাশক হিসাবে ভাইরাস : অনেক পতঙ্গ বিশারদের মতে জীবাণু

কীটনাশকদের মধ্যে ভাইরাস সর্বাধিক কার্যকর। আজ পর্যন্ত বিভিন্ন গবেষণার ফলশ্রুতি হিসাবে অর্থকরী ফসল ধ্বংসকারী পতঙ্গনাশক অনেক ভাইরাসকেই চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে। আজ পর্যন্ত প্রায় ৬৫০টি পতঙ্গনাশক ভাইরাসের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটেছে এবং এই পরিচিত মহলের পরিধি ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। সক্রিয় ব্যাক্টিরিয়ারা রেণু গঠন করে নিজেদের রক্ষা করে কিন্তু সক্রিয় ভাইরাসরা একটা প্রোটিনের আচ্ছাদন (Protective body) দিয়ে নিজেদের রক্ষা করে। বিশেষ অবস্থায় আক্রান্ত অনুপোষক কোষের মধ্যে অসম্পূর্ণ ভাইরাস এবং সক্রিয় ভাইরাস কণা আচ্ছাদনের মধ্যে একত্রে অবস্থান করে যা অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দৃশ্যমান। একে বলে ইনক্লুসন বডি (Inclusion body)। এ ছাড়া আচ্ছাদনবিহীন ভাইরাসকে বলে নন-ইনক্লুসন ভাইরাস। ইনক্লুসন বডি নানান আকৃতির হয়ে থাকে, অসম এবং সুষম বহুতল বিশিষ্ট পিরামিড বা পলিহেড্রোসিস (Polyhedrosis) প্রকৃতিসম্পন্ন এবং ডিম্বাকৃতি বা গ্রানুলোসিস (Granulosis) প্রকৃতি সম্পন্ন। কিন্তু সচরাচর পতঙ্গ ভাইরাসকে চিহ্নিত করা হয় এরা কোষের অভ্যন্তরে যেখানে বংশ বিস্তার করে তার উপর ভিত্তি করে। তাই সাধারণ দুই শ্রেণী হল নিউক্লীয় পলিহেড্রোসিস (NPV) এবং সাইটোপ্লাজমীয় পলিহেড্রোসিস (CPV) ভাইরাস। আধুনিক শ্রেণীবিন্যাস অবশ্য পতঙ্গ ভাইরাসের আকৃতি, প্রকৃতি জীবরাসায়নিক এবং শারীর বৃত্তীয় পরীক্ষার ভিত্তিতে নির্ণয় করা হয়। গণের (Genus) নামকরণের জন্য দ্বিপদ পদ্ধতি (Binomial system) অবলম্বন করা হয় এবং নামের শেষে ভাইরাস কথাটা যুক্ত থাকে। যেমন বাকুলোভাইরাস, এন্টোমোপক্স ভাইরাস, ইরিডো-ভাইরাস ইত্যাদি। নন-ইনক্লুসন ভাইরাসগুলি সহজে উৎপাদন করা সম্ভব হয় না এবং নিরাপত্তার প্রশ্নেও এরা সন্দেহাতীত প্রমাণিত না হওয়ায় এদের প্রচলন সীমাবদ্ধ। পতঙ্গ ভাইরাস উৎপাদনের সবচেয়ে বড় সমস্যা হল এরা সম্পূর্ণভাবে পরাশ্রয়ী পরজীবী। তাই এদের উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন হয়। যথাযোগ্য অনুপোষকের। এইসব অসুবিধা সত্ত্বেও এক ডজনের বেশী পতঙ্গনাশক ভাইরাস শিল্পপণ্য হিসাবে বাজারে এসেছে এবং এদের প্রয়োগ করে যথেষ্ট সুফল ও মিলেছে। ছত্রাক বা ব্যাক্টিরিয়া পতঙ্গনাশকের চেয়ে ভাইরাস পতঙ্গনাশক ব্যবহারে সুবিধা বেশী। কারণ এরা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে এদের কার্যকারিতা নির্দিষ্ট রাখে বলে অনির্দেশিত উদ্ভিদ বা প্রাণীর কোন ক্ষতির আশঙ্কা এদের দ্বারা সৃষ্টি হয় না।

পতঙ্গনাশক হিসাবে ছত্রাক : ছত্রাককে পতঙ্গনাশক হিসাবে ব্যবহার করার রীতি এখনও আমেরিকায় প্রচলিত না হলেও রাশিয়ায় একাধিক পতঙ্গনাশক ছত্রাকের ব্যবহার প্রচলিত হয়েছে। প্রায় ৫০০ পতঙ্গনাশক ছত্রাকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রায় সকলেই ফাইকোমাইসিট (*Phycomycetes*) এবং ডিটারোমাইসিট (*Deuteromycetes*) শ্রেণীভুক্ত। ছত্রাক পতঙ্গনাশক কিন্তু যখন মাটিতে রেণু অঙ্কুরিত হবার বা বৃদ্ধির অনুকূল পরিবেশ সৃষ্ট হয় কেবলমাত্র তখনই সক্রিয় হয়ে থাকে। আবার ছত্রাক বহুবিধ উদ্ভিদরোগের সঙ্গে জড়িত বলে অনেক ছত্রাক বিশেষজ্ঞের মতে ছত্রাকের ব্যবহারের সাফল্য সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। কিন্তু অন্যশ্রেণীর বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন রাসায়নিক কীটনাশকের সঙ্গে ছত্রাক কীটনাশকের ব্যবহারে সন্তোষজনক ফল পাওয়া যায়।

ছত্রাকের অণুসূত্র (mycellium), রেণু এবং টক্সিন (toxin) বৃহদাকারে উৎপন্ন করা খুব সহজ। সাধারণতঃ কৃষ্টি মাধ্যমের উপরিতলে সন্ধান প্রক্রিয়া দ্বারা জীবাণুর বংশ বৃদ্ধি ঘটানো সহজসাধ্য। এদের ব্যবহারে একটা মুখ্য সুবিধা হল এরা ভাইরাসের মত কেবলমাত্র বিশেষভাবে নির্দেশিত পতঙ্গ ছাড়া অন্য পতঙ্গের উপরও সক্রিয় হতে পারে। সাধারণতঃ বিভিন্ন শ্রেণীর ফড়িং, গুবরে পোকা এবং শস্যছিদ্রকারী পোকার উপর ছত্রাকের ক্রিয়া বিশেষভাবে সন্তোষজনক। তাই আশা করা যায় ছত্রাক পতঙ্গনাশক সম্বন্ধে গবেষণার পরিধি ক্রমেই বৃদ্ধি পাবে এবং তখন এর প্রয়োগের জনহিতকর দিক উন্মোচিত হবে।

পতঙ্গনাশক হিসাবে প্রোটোজোয়া : পরীক্ষাগারে প্রোটোজোয়া পতঙ্গনাশক ক্রিয়া দেখাতে সক্ষম হলেও, তাদের নিম্নমানের কার্যকারিতা এবং উৎপাদনের জটিলতার জন্য বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদন আজও সম্ভব হয় নি। প্রোটোজোয়াকে কেবলমাত্র জীবকোষের মধ্যেই উৎপন্ন করা সম্ভব। এইসব অসুবিধা সত্ত্বেও প্রায় ১৫টি বিভিন্ন ধরনের উন্নতমানের প্রোটোজোয়াকে পরীক্ষামূলক ভিত্তিতে ব্যবহার করা হচ্ছে। প্রোটোজোয়া জীবাণুনাশক হিসাবে ব্যবহৃত হবার সবচেয়ে বড় সম্ভাবনাময় কারণ হল যে কীটপতঙ্গ, ব্যাক্টিরিয়া বা ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হয় না তাদের প্রোটোজোয়া দ্বারা আক্রান্ত হতে দেখা যায়। মাত্র পাঁচটি সার্থক প্রোটোজোয়াকে এখনও পর্যন্ত যথেষ্ট সম্ভাবনাপূর্ণ বলে পরীক্ষা চালানো হচ্ছে। এর মধ্যে **নোসেমা লোকাস্টি** (*Nosema locustae*) তার

সকল সম্ভাবনা এবং নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি নিয়ে এগিয়ে এসেছে। এই প্রোটোজোয়াটি ফড়িং জাতীয় পতঙ্গের উপর খুবই সক্রিয়। এ ছাড়া **ম্যাটেসিয়া ট্রোগোডারমি** (*Mattesia trogodermae*) মজুত খাদ্যবিনষ্টকারী পতঙ্গ এবং **নোসেমা এলজিরি** (*Nosema algerae*) মশা নির্মূল করতে খুবই কার্যকর। আশা করা যায় আগামী দশকে প্রোটোজোয়াকে কীটনাশক পণ্য হিসাবে বাজারে আসতে দেখা যাবে।

সিদ্ধান্ত : কীটনাশক হিসাবে সজীব জীবাণুর ব্যবহার খুব প্রাচীন বলা চলে না। রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহারের কুফল এবং এর দুর্লভতাই জীবাণু কীটনাশক ব্যবহারের গবেষণায় বিজ্ঞানীদের উদ্বুদ্ধ করেছে। জীবাণুসারের মত, জীবাণু কীটনাশকের সাফল্যও পরিবর্তিত পরিবেশে জীবাণুর টিকে থাকার ক্ষমতার উপর প্রাথমিকভাবে নির্ভরশীল। উন্নতমানের পতঙ্গনাশক জীবাণুর দ্বারা রাসায়নিক কীটনাশকের চেয়েও ভালো ফল পাওয়া সম্ভব বিভিন্ন পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে কীটনাশক জীবাণু গৃহপালিত পশু, উপকারী পতঙ্গ এবং উদ্ভিদের কোন ক্ষতি করে না। উপরন্তু জীবাণু কীটনাশক রাসায়নিক কীটনাশকের রাসায়নিক বিষক্রিয়ার দোষ মুক্ত। জীবাণু প্রয়োগ যে কোন রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগ অপেক্ষা দামে সস্তা, তাই সার্বিক বিশ্লেষণে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় জীবাণু কীটনাশকের সম্ভাবনা অসীম, তাই এর কার্যকারিতাও হবে অনন্য।

জীবাণুসার প্রয়োগে নূতন পথ নির্দেশ— হর্মোন উৎপাদনকারী জীবাণুর ভূমিকা ১৩

জৈবসার এবং সবুজসার প্রয়োগের ভূমিকা আজ কৃষক এবং কৃষিবিশারদ সবার কাছেই স্বীকৃত। **রাইজোবিয়াম** জীবাণুসার সম্বন্ধেও কেউ দ্বিমত পোষণ করেন না। কিন্তু মুক্তজীবী নাইট্রোজেন বন্ধনকারী জীবাণুসার (সার মুখ্য হোতা হল **এজোটোব্যাক্টার**) সম্বন্ধে বা ফসফেট ঘটিত জীবাণুসার সম্বন্ধে (যার পথ প্রদর্শকের ভূমিকা হল রাশিয়ার—**ব্যাসিলাস মেগাথেরিয়াম** দ্বারা) এখনও সকলে নিঃসন্দেহ নন। অন্যদিকে জলমগ্ন ধান জমিতে নীলসবুজ শেওলার ভূমিকাও আজ স্বীকৃত। কিন্তু মুক্তজীবী নাইট্রোজেন বন্ধনকারী জীবাণু বা ফসফেট দ্রবণকারী জীবাণুর ক্রিয়ায় যখন সুফল দেখা যায় তখন অনেকেই তাদের উদ্ভিদ উদ্দীপক রাসায়নিক পদার্থ বা হর্মোনের অবদান বলে চিহ্নিত করেন। এর কারণ হল মাটির স্বাভাবিক জীবাণু এবং যেসব জীবাণু গাছের মূলের পরিমণ্ডলে উদ্দীপিত হয় তাদের মধ্যে একাংশ, উদ্ভিদ বৃদ্ধি উদ্দীপক বা হর্মোন জাতীয় পদার্থ উৎপাদনের ক্ষমতা প্রদর্শন করে। কিছু **এজোটোব্যাক্টারও** এই তালিকায় স্থান পায় এবং সেটাই হল **এজোটোব্যাক্টার** জীবাণুর উপর এই সন্দেহ উদ্রেকের কারণ। পক্ষান্তরে রাশিয়ার **ব্যাসিলাস মেগাথেরিয়াম** জীবাণুর ব্যর্থতার কারণ হল এরা প্রধানতঃ অদ্রবণীয় জৈব ফসফরাসের উপর ক্রিয়াশীল। তাই অজৈব ফসফরাস সমৃদ্ধ গ্রীষ্ম-প্রধান দেশের মাটিতে এই জীবাণুর ক্রিয়া সীমিত হতে বাধ্য। **ব্যাসিলাস মেগাথেরিয়াম** অবশ্য হর্মোন উৎপাদনে সক্ষম এমন কোন সাক্ষ্য নেই।

সাধারণতঃ জীবাণুরা যে সমস্ত উদ্ভিদ হর্মোন (অক্সিন) উৎপাদন করতে সক্ষম তাদের মধ্যে প্রধান হল ইনডোল ৩-এ্যাসিটিক এ্যাসিড (আই এ এ), জিব্বারালিন এবং জিব্বারালিক এ্যাসিড। বলা বাহুল্য, সব **এজোটোব্যাক্টারই** হর্মোন উৎপাদন করে না এবং সব **এজোটোব্যাক্টারই** বিভিন্ন উদ্ভিদের

রোগ উৎপাদনকারী ছত্রাকের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে এই ধারণাও অনেকটা কল্পনা-প্রসূত। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায় কোন উচ্চমানের নাইট্রোজেন বন্ধনকারী বা ফসফেট দ্রবণকারী জীবাণু যদি হর্মোন উৎপাদনক্ষম হয় তা অধিকতর সম্ভাবনাময় জীবাণুসার হিসাবে কাজ করার প্রতিশ্রুতি বহন করবে।

১৯০৪ সালে হিলটনারের তাৎপর্য পূর্ণ গবেষণায় পরিবেশ বিজ্ঞানে এক নূতন নাম সংযোজিত হল যা তাঁর ভাষায় উদ্ভিদের মূল পরিমণ্ডল বা "রাইজোস্ফিয়ার" নামে পরিচিতি লাভ করল। তিনি লক্ষ্য করলেন রাইজোস্ফিয়ারে বিভিন্ন উপকারী জীবাণুর সংখ্যা এবং জীবরাসায়নিক ক্রিয়া, মূল থেকে দূরে সাধারণ মাটির তুলনায় বেশ কয়েকগুণ বেশী। তিনি ঘোষণা করলেন রাইজোস্ফিয়ার হল উদ্ভিদ মূল, জীবাণু এবং মাটির সম্মিলিত ক্রিয়ার ত্রিবেণী।

স্নুডসন ১৯২০ সালে প্রথম সঠিকভাবে প্রমাণ করেন গাছের মূল শর্করা জাতীয় পদার্থ নির্গত করে। ১৯৬৫ সালে বিজ্ঞানী রোভিরা মূলের পরিমণ্ডলে সমস্ত গবেষণার একটা সংকলন প্রকাশ করেন। এর থেকে জানা যায় গাছের মূল শর্করা, জৈব এ্যাসিড, অ্যামাইনো এ্যাসিড এবং কিছু কিছু অজ্ঞাত উদ্ভিদ উদ্দীপক পদার্থ নির্গত করে। গাছের মূল থেকে যে শর্করা, জৈব এ্যাসিড, এবং অ্যামাইনো এ্যাসিড নির্গত হয় তা তিনি আরো স্পষ্টভাবে প্রমাণ করতে সমর্থ হন। এ ছাড়া তিনি পরীক্ষায় প্রমাণ করেন মূল নির্যাসে দ্রবণীয় বি শ্রেণীর ভিটামিনের সন্ধান পাওয়া যায়। এইসব পুষ্টিকর খাদ্যই সম্ভবতঃ মূলের পরিমণ্ডলে অধিক সংখ্যায় জীবাণুর আকর্ষণের প্রধান কারণ।

উদ্ভিদ হর্মোন উৎপাদনক্ষম জীবাণুর সার্থক গবেষণা শুরু হয় ১৯৫৫ সালে। বরো এবং তাঁর সহকর্মীগণ জিবেরেলা ফুজিকুরোই (*Gibberella fujikuroi*) নামে এক ছত্রাকের সন্ধান পান যারা জিব্বারালিন উৎপাদনে সক্ষম। এই ছত্রাকটি আসলে ফিউসারিয়াম মিলিফর্মি-এর কনিডিয় (এক-ধরনের রেণু গঠনকারী) রূপ। এই ছত্রাকটি তাঁর পেটেন্টে শিল্পভিত্তিতে জিব্বারালিন উৎপাদনে আজও ব্যবহৃত হচ্ছে। ১৯৫৭ সালে কার্টিস নামে এক বিজ্ঞানী জীবাণুর এই ক্ষমতার সন্ধানে প্রায় ১০০০ ছত্রাক এবং ৫০০ একটিনো-মাইসিটস নিয়ে গবেষণায় নিষ্ফল হন। ১৯৬১ সালে ভাঁকুরা এজোটোব্যাক্টার ক্রকক্কাম প্রজাতির মধ্যে জিব্বারালিন উৎপাদনের দৃষ্টান্ত প্রমাণ করেন

এবং ১৯৬২ সালে কাটজনেলসন ও তাঁর সহকর্মীবৃন্দ প্রাথমিকভাবে পরীক্ষা চালিয়ে **আর্থ্রোব্যাক্টার গ্লোবিফর্মিস**-এর জিব্বারালিন জাতীয় পদার্থ উৎপাদনের সন্ধান পান (পেপলার ও পার্লম্যান, ১৯৭৯)। ক্রাশিলনিকভ ও তাঁর সহকর্মীরা ১৯৬৩ সালে কিছু অজানা একটিনোমাইসিটস, ইস্ট প্রজাতি—**টোরুলা পালচেরিমা** এবং বেশ কিছু **ফিউসারিয়াম** প্রজাতির ছত্রাকের মধ্যে জিব্বারালিক এ্যাসিড উৎপাদনের সন্ধান পান। নিতা ১৯৬৪ সালে কিছু রেণু উৎপাদনকারী ব্যাক্টিরিয়া এবং **সিউডোমোনাস ফ্লুরেসেন্সের** মধ্যে জিব্বারালিন্ জাতীয় পদার্থ উৎপাদন ক্ষমতার পরিচয় পান এবং ১৯৬৫ সালে কার্টজনেলসন এবং কোলে **ব্যাসিলাস পলিমিক্সা, এগ্রোব্যাক্টিরিয়াম রেডিওব্যাক্টার** এবং দুটি প্রজাতির একটিনোমাইসিটসের মধ্যে প্রতি লিটার কৃষ্টিমাধ্যমে ১-১৪ মাইক্রোগ্রাম জিব্বারালিন উৎপাদন ক্ষমতা লক্ষ্য করেন (পেপলার ও পার্লম্যান, ১৯৭৯)। ১৯৬৭ সালে বসন্তরাজন এবং ভাট ভারতের মাটিতে জীবাণুর ক্রিয়ায় জিব্বারালিন এবং ইনডোল এ্যাসিটিক এ্যাসিড উৎপাদনের সংবাদ পরিবেশন করেন। আজ মাটির জীবাণুর এইসব উদ্ভিদ হর্মোন উৎপাদনের রহস্য সর্বজন স্বীকৃত। কিন্তু কথা হল এইসব জীবাণুর এই ক্ষমতাকে কিভাবে কৃষি উন্নয়নের কাজে লাগানো যায়।

বসন্তরাজন এবং ভাট ১৯৬৭ সালে মালবেরীর (**মোরাস ইণ্ডিকা**) মূল পরিমণ্ডল থেকে এবং নিয়ন্ত্রিত মাটি থেকে জীবাণু সংগ্রহ করে প্রমাণ করেন, মূল পরিমণ্ডল থেকে সংগৃহীত জীবাণুর ১২·৮ শতাংশ এবং নিয়ন্ত্রিত মাটি থেকে সংগৃহীত জীবাণুর ৯ ৭ শতাংশ উদ্ভিদ হর্মোন জাতীয় পদার্থ উৎপাদন করে। এ থেকে তাঁরা সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে মূলের পরিমণ্ডলে জীবাণুরা সাধারণ মাটির জীবাণুর থেকে অনেক বেশী সক্রিয়। এঁদের পরীক্ষালব্ধ ফলাফলের তালিকা দেখলে তাঁদের বক্তব্যের তাৎপর্য আরো স্পষ্টভাবে বোঝা যাবে।

পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে জীবাণুর উৎপন্ন জিব্বারালিন বা জিব্বারলিক এ্যাসিড মাটিতে প্রয়োগ করলে তা উদ্ভিদ অতিদ্রুত শোষণ করে নেয়।

আমাদের এক পরীক্ষায় শতাধিক বিভিন্ন মৃত্তিকা জীবাণু (ব্যাক্টিরিয়া, ছত্রাক এবং একটিনোমাইসিটস) থেকে নির্বাচিত উন্নতমানের ছয়টি অজৈব ফসফেট দ্রবণকারী ব্যাক্টিরিয়ার উপর পরীক্ষা চালানো হয়। অজৈব ফসফেটকে দ্রবীভূত করার কারণ হিসাবে এইসব জীবাণুর জৈব এ্যাসিড উৎপাদন ক্ষমতাকে

তালিকা ১ : মালবেরী গাছের মূল পরিমণ্ডলের মাটিতে মোট জীবাণুর এবং হর্মোন উৎপাদনকারী জীবাণুর সংখ্যা

(বসন্তরাজন এবং ভাট, ১৯৬৭)

উপাদান	গাছের বয়স												মোট জীবাণুর সংখ্যা	হর্মোন উৎপাদন-কারীর সংখ্যা	শতকরা হিসাবে
	চারা লাগানোর সময়				৬ মাস বয়সে				১২ মাস বয়সে						
	A*	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D			
রাইজোস্পিয়ার বা মূলের পরিমণ্ডলের মাটি	১৩৬·৫	৭৩	১২	১৬·৪৩	২০৮·৭	৬৮	৯	১৩·২৩	২৭০·৫৭	৭৭	৭	৯·১	২১৮	২৮	১২·৮
নিয়ন্ত্রিত মাটি	১০·১৫	৭৬	৮	১০·৫২	১৪·৬	৬৭	৮	১১·৯৪	২০	৭৫	৭২	৫	৬·৯	২১৫	২১	৯·৭৬

* প্রতি গ্রাম মাটিতে জীবাণুর সংখ্যা হল প্রদত্ত সংখ্যা × ১০^{৬}

A → মোট ব্যাক্টিরিয়া ; B → পরীক্ষিত জীবাণুর সংখ্যা ; C → হর্মোন উৎপাদনকারী জীবাণুর সংখ্যা এবং D → হর্মোন উৎপাদনকারীর সংখ্যা শতাংশ হিসাবে।

এবার দেখা যাক উপরোক্ত হর্মোন উৎপাদনকারী ব্যাক্টিরিয়াদের প্রকৃতি এবং তারা কোন গোত্রভুক্ত :

তালিকা ২ : হর্মোন উৎপাদনক্ষম জীবাণুর পরিচিতি ও প্রকৃতি
(বসন্তরাজন এবং ভাট, ১৯৬৭)

জীবাণুর আকৃতি	শ্রেণীবিভাগ	কৃষ্টিদ্রবণে উদ্ভিদ হর্মোন উৎপাদন ক্ষমতা		
		০	$১০^{-১}$	$১০^{-২}$
গ্রাম ঋনাত্মক, রড	সিউডোমোনাস	+	+	+
	এলকালিজেনস	+	+	—
	ফ্লাভোব্যাক্টিরিয়াম	+	+	—
	এক্রোমোব্যাক্টার	+	—	—
গ্রাম ধনাত্মক, কোকাস	মাইক্রোকোকাস	+	+	—
রেণু গঠনকারী গ্রাম-ধনাত্মক, রড	ব্যাসিলাস	+	+	+
একাধিক শারীরিক গঠনযুক্ত (Pleomorphic) এবং দ্বিধাবিভক্ত কোষ	আর্থ্রোব্যাক্টার	+	+	—

$১০^{-১}$ এবং $১০^{-২}$ দ্রবণের লঘুত্ব (dilution) + সক্ষম এবং — অক্ষম।

চিহ্নিত করা হয়। হর্মোন উৎপাদনের ক্ষমতা নির্ণয়ের পরীক্ষা চালিয়ে দেখা যায় এদের মধ্যে একটি ল্যাটারাইট মাটি থেকে আহৃত এবং একটি এ্যালুভিয়াল মাটি থেকে আহৃত **ব্যাসিলাস ফারমাস** প্রজাতি ইনডোল ৩-এ্যাসিটিক এ্যাসিড উৎপাদন করছে। তুলনামূলক পরীক্ষায় দেখা যায় রাশিয়ার উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন প্রজাতি **ব্যাসিলাস মেগাথেরিয়াম,** অপেক্ষাকৃত কম অজৈব ফসফেট দ্রবীভূত করেছে এবং তা হর্মোন উৎপাদনেও অক্ষম। এবার দেখা যাক পরীক্ষালব্ধ ফলাফলের তালিকা।

তালিকা ৩ঃ কতকগুলি পরীক্ষিত জীবাণুর মূল্যায়ন তালিকা (বণিক এবং দে, ১৯৭৮)

জীবাণুর পরিচয় এবং উৎস	০·১৫ গ্রাম সুক্রোজ এবং ১৫ মিলিগ্রাম অদ্রবণীয় ফসফেট থেকে মুক্ত দ্রবণীয় ফসফরাসের পরিমাণ (মাইক্রোগ্রামে)				উক্ত কৃষ্টি দ্রবণে উৎপন্ন জৈব এ্যাসিড	দ্রবণের অম্লত্বমাত্রা (pH)	উৎপন্ন ফাইটোহর্মোন		
	$Ca_3(PO_4)_2$	$AlPO_4$	$FePO_4$	Rock Phosphate			IAA	IBA	GA
ব্যাসিলাস মেগাথেরিয়াম ভার ফসফেটিকাম—৮৪৭ (মস্কো-রাশিয়া)	৬২·০	০·০	১·০	৩·৫	অজ্ঞাত	৫·৫	—	—	—
ব্যাসিলাস ফারমাস (ল্যাটারাইট মাটি)	১৫০·০	০·০	১১·০	৩·০	২-কিটো গ্লুকোনিক + সাকসিনিক	৪·৯	+	—	—
ব্যাসিলাস সার্কুলেন্স + ব্যাসিলাস সাবটিলিস (ল্যাটারাইট মাটি)	১৪৩·০	০·০	২০·০	০·০	২-কিটো গ্লুকোনিক + সাকসিনিক	৪·৯	—	—	—
ব্যাসিলাস সাবটিলিস (ল্যাটারাইট মাটি)	৩৯·০	০·০	৫·০	০·০	অক্সালিক	৫·৫	—	—	—
ব্যাসিলাস ফার্মাস (এলুভিয়াল মাটি)	৫৫·০	১·০	০·০	০·৫	২-কিটো গ্লুকোনিক + সাকসিনিক	৫·৭	+	—	—
ব্যাসিলাস ফার্মাস (এলুভিয়াল মাটি)	৪৪·০	০·০	০·০	১·৫	অক্সালিক + সাকসিনিক	৬·১	—	—	—
ব্যাসিলাস সাবটিলিস (এলুভিয়াল মাটি)	২৪·০	০·০	১০·০	০·০	অক্সালিক	৫·৫	—	—	—

IAA—ইণ্ডোল এ্যাসিটিক এ্যাসিড ; IBA—ইণ্ডোল বিউটিরিক এ্যাসিড ; GA—জিব্বারালিন এবং জিব্বারালিক অম্ল।

পরীক্ষালব্ধ ফলাফলের তালিকা খতিয়ে দেখলে জীবাণু দুটির ক্ষমতা সম্বন্ধে ধারণা করা যাবে। বর্তমানে ঐ জীবাণু দুটি পুনায় জাতীয় শিল্পজ জীবাণু সংগ্রহশালায় রক্ষিত হয়েছে। জীবাণু দুটি যথাক্রমে NCIM-2636 এবং NCIM-2637 সংখ্যায় তালিকাভুক্ত।

এইসব আবিষ্কার থেকে এটাই স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে কিছু কিছু নাইট্রোজেন বন্ধনকারী বা ফসফেট দ্রবণকারী জীবাণুর মধ্যে ঐসব হর্মোন উৎপাদন ক্ষমতা থাকা কিছু অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। এইসব দ্বৈত গুণসম্পন্ন জীবাণুর সম্ভাবনা কৃষিজমিতে জীবাণুসার হিসাবে খুবই উজ্জ্বল এই ধারণার বশবর্তী হয়ে আমরা **ব্যাসিলাস ফারমাস** জীবাণুকে নাগাল্যাণ্ডের উঁচু অম্লজমিতে পরপর দুই বৎসর ধানের জমিতে প্রয়োগ করে গড়ে ৩০ শতাংশেরও বেশী ফলন পেয়েছি। এবার আমরা একে একে এ সম্বন্ধে দুটি তালিকায় প্রকাশিত পরীক্ষালব্ধ ফলাফল দেখব।

তালিকা ৪ : জমিতে হর্মোন উৎপাদনক্ষম জীবাণুসার প্রয়োগে জয়া ধানের ফলনের উপর প্রভাব (দত্ত এবং সহকর্মীবৃন্দ, ১৯৮২)

ফসফরাসের প্রয়োগ মাত্রা কিগ্রা. প্রতি হেক্টরে	সিঙ্গল সুপার ফসফেট		পাথুরে ফসফেট	
	জীবাণু বিহীন দানাশস্য	জীবাণু প্রযুক্ত দানাশস্য	জীবাণু বিহীন দানাশস্য	জীবাণু প্রযুক্ত দানাশস্য
নিয়ন্ত্রিত মাটি	২১·৯৯*	৩৭ ৪৭	২১·৯৯	৩৭ ৪৭
৮·৭৫	২৬ ৫৩	৪১·৬৩	৩৪·৭৯	৪১·২৬
১৭ ৫০	২৭·১১	৪২·৭৮	৩৭ ০৯	৪৮·০৬
৩৫ ০০	৩৩·১৫	৪৬·৭২	৩৫ ৯২	৪৩ ২৭
৪৩ ৭৫	৩০ ৯৮	৪৭·৮১	৩৫·৮৯	৪৫·০৯
৫২·৫০	৩২·০০	৪৩ ০৩	৩৩·৮৩	৪৫·৫৮
৭০·০০	৩৩ ৮৯	৪২·৩০	৩৭·১৬	৪?·৪৭
গড়ে	৩০·৬১	৪৪·২১	৩৫·৭৮	৪৪·৭৯

দ্বিতীয় বৎসর একই জমিতে এই পরীক্ষার পুনরাবৃত্তি করা হয় জয়ার পরিবর্তে আই-আর-৮ ধান শস্যের উপর।

পরীক্ষার ফলাফল তালিকা ৫-এ প্রকাশিত হল।

তালিকা ৫ঃ জমিতে হর্মোন উৎপাদনক্ষম জীবাণুসার প্রয়োগে আই-আর-৮ ধানের ফলনের উপর প্রভাব (দত্ত এবং সহকর্মীবৃন্দ, ১৯৮২)

ফসফরাসের প্রয়োগ মাত্রা কিগ্রা. প্রতি হেক্টরে	সিঙ্গল সুপার ফসফেট		পাথুরে ফসফেট	
	জীবাণু বিহীন দানাশস্য	জীবাণু প্রযুক্ত দানাশস্য	জীবাণু বিহীন দানাশস্য	জীবাণু প্রযুক্ত দানাশস্য
নিয়ন্ত্রিত	২৭·৮৮*	৩৯ ২৩	২৭ ৮৮	৩৯·২৩
৮ ৭৫	—	—	৩৩ ৭০	৪০·৬৩
১৭·৫০	৩৩ ৫৮	৩৯·৪০	৩৬ ৮৫	৪০·৬৫
৩৫·০০	৩৫ ২৮	৪১·১৫	৩২·৯৩	৩৬ ৬৫
৫২·৫০	৩২ ৬৩	৩৮ ৬৩	—	—

\+ চাপান সারের পরিমাণ ৮০ কিগ্রা· নাইট্রোজেন প্রতি হেক্টরে এবং ৪০ কিগ্রা· পটাসিয়াম প্রতি হেক্টরে।

* চারটি প্লটের গড়পরতা হিসাবে।

এইসব পরীক্ষালব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতে ধারণা করা যায় যে, এ ধরনের দ্বিবিধ ক্ষমতার অধিকারী জীবাণুকে জমিতে জীবাণুসার হিসাবে প্রয়োগ করলে জমি আরো শস্যশ্যামলা হয়ে উঠবে। সার্থক জীবাণুসার হিসাবে কাজ করার পূর্বশর্তের মধ্যে একটি হল রেণুগঠন ক্ষমতা। এই পরীক্ষাতেও জীবাণুটি উত্তীর্ণ। তাই আশা করা যায় উপযুক্ত পরিবেশে যথার্থ প্রয়োগ করা হলে এই জীবাণু এক নূতন দিগন্ত উন্মোচন করবে।

যে সকল রাসায়নিক পদার্থকে উদ্ভিদ হর্মোন হিসাবে কাজ করতে দেখা গেছে তা হল, ইণ্ডোল এ্যাসিটিক এ্যাসিড, ইণ্ডোল বিউটিরিক এ্যাসিড, জিব্বারালিন,

সাইটোকাইনিন, জিব্বারলিক এ্যাসিড ইত্যাদি। এ ছাড়া কিছু সরল অ্যারো-মেটিক পদার্থকেও উদ্ভিদ বৃদ্ধি (হর্মোন) উদ্দীপক পদার্থ হিসাবে পাওয়া যায়। কিন্তু আজ পর্যন্ত কেবলমাত্র ইনডোল এ্যাসিটিক এ্যাসিড, জিব্বারালিন এবং জিব্বারালিক অম্লকেই জীবাণু উৎস থেকে পাওয়া সম্ভব হয়েছে। সরাসরি জীবাণু প্রয়োগ না করা হলেও ফুল ও ফলের চারা তৈরীর জন্য (বিশুদ্ধ) রাসায়নিক পদার্থ হিসাবে এইসব উদ্ভিদ উদ্দীপক প্রয়োগের রীতি স্বীকৃত। বলা বাহুল্য এইসব উদ্ভিদ হর্মোন প্রয়োগে দ্রুত শিকড় বাড়ে। সাধারণতঃ এদের খুব অল্পমাত্রায় প্রয়োগ করা হয়ে থাকে, যেমন ০·০৫ মাইক্রোগ্রাম জিব্বারালিক এ্যাসিড বা ১৭৫ মাইক্রোগ্রাম ইনডোল এ্যাসিটিক এ্যাসিড প্রতি লিটার দ্রবণে থাকলে তা প্রচুর পরিমাণে শিকড় এবং গাছের সবুজ অঙ্গজ অংশ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। কিন্তু এটা মনে রাখতে হবে যে প্রয়োগমাত্রা বেশী হলে তা হবে খুবই ক্ষতিকর (phyto-toxic)।

জিব্বারালিন বা জিব্বারালিক অম্লের একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্রিয়া হল দ্রুত গাছের কাণ্ড বৃদ্ধি, এ ছাড়া বৃদ্ধি পায় প্রতিটি গাঁটের মধ্যে দূরত্ব। এইরূপ প্রকৃতি লক্ষ্য করে এই সিদ্ধান্ত করা চলে যে ঐ সকল হর্মোনের ক্রিয়ায় কোষ বিভাজনের চেয়ে কোষের আকার বৃদ্ধিই মুখ্যতঃ ঘটে থাকে। এ ছাড়া জিব্বারালিক এ্যাসিড প্রয়োগে বীজহীন ফল উৎপাদন, পরাগ মিলন ব্যতিরেকে ফল উৎপাদন, গাছে দ্রুত ফুল আনা ইত্যাদি সম্ভব হয়েছে। এ ছাড়া দ্রুত বীজ অঙ্কুরোদ্গমন এবং বীজ থেকে দ্রুত চারা উৎপাদনের ক্ষেত্রেও এদের ভূমিকা অনবদ্য। শিশু চারাগাছের মূল নির্যাসে ট্রিপট্রোফানের প্রাধান্য থাকায় সেখানে প্রচুর ইণ্ডোল এ্যাসিটিক এ্যাসিড উৎপাদনক্ষম ব্যাক্টিরিয়া থাকার সম্ভাবনা থাকে। ইনডোল এ্যাসিটিক এ্যাসিড প্রয়োগের ফলে উদ্ভিদের দেহে অক্সিনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। অক্সিন আংশিকভাবে শিকড় জন্মানো নিয়ন্ত্রণ করে। সামগ্রিক ভাবে উদ্ভিদ হর্মোন প্রয়োগের ফলে যেসব প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায় তা হল দ্রুত কাণ্ডের বৃদ্ধি, পাতার সংখ্যা ও ক্ষেত্রফল বৃদ্ধি এবং অস্বাভাবিক-ভাবে মূল উৎপাদন বৃদ্ধি, এ ছাড়া দ্রুত ফুল এবং ফল আসা ইত্যাদি। অর্থাৎ কোন ক্ষেত্রে জীবাণু প্রয়োগে যদি তা উদ্ভিদ-হর্মোন উৎপাদনের প্রতিক্রিয়া হয় তবে সেটা উপরোক্ত লক্ষণের উপস্থিতি দেখে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করা যাবে। প্রকৃতপক্ষে হর্মোন উৎপাদনক্ষম জীবাণুর প্রয়োগে উদ্ভিদের উপর প্রভাব

অনেকাংশে পরিবেশের উপর নির্ভর করে। এর মধ্যে মুখ্য ভূমিকা নেয় উদ্ভিদের প্রজাতি, মাটির উর্বরতা, মাটির অম্লত্বমাত্রা, মাটির জলধারণ ক্ষমতা, দিনের দৈর্ঘ্য, আলোর তীব্রতা, ঋতুর প্রভাব এবং উষ্ণতা। তাই কোন পরীক্ষাতে প্রাপ্ত ফলাফল আশানুরূপ না হলে তা জীবাণুর অক্ষমতা ছাড়াও অন্য প্রকৃত কারণগুলোর অনুসন্ধান ও তার প্রতিকারের পথ খুঁজে বার করতে হবে।

এইসব গবেষণালব্ধ ফলাফল এবং তাত্ত্বিক আলোচনা থেকে এটা খুবই স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে বর্তমানের শক্তি সংকটমোচনে হর্মোন উৎপাদনক্ষম জীবাণুর ভূমিকা কৃষিক্ষেত্রে হবে অনন্য।

উপসংহার ১৪

মানুষ যেদিন থেকে আগুন জ্বালাতে শিখল সেই দিন থেকেই শুরু হল মানুষের জয়যাত্রার ধারা। তারপর ক্রমে ক্রমে সে শিখল ধাতুর ব্যবহার এবং তারপর এল কৃষিকার্য। প্রাককৃষি যুগে মানুষও ইতর প্রাণীদের মত বনজ ফলমূল বা পশু-শিকার করেই ক্ষুধা মিটাত। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই সে খাদ্যের অপ্রতুলতা অনুভব করতে থাকল। সেই প্রয়োজনেই এল কৃষিকার্য। বিগত কয়েক দশক আগেও মানুষ সনাতন পদ্ধতিতে কৃষিকাজ করে প্রয়োজন মেটাতে পারত। কিন্তু বর্তমানে জনসংখ্যার ক্রমবর্দ্ধমান হার ক্রমশঃ যে মারাত্মক সংকটময় পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে তার থেকে ত্রাণ পাবার জন্য মানুষ নিত্য নূতন পদ্ধতিতে অধিক খাদ্য উৎপাদন করার আপ্রাণ প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। আর এই অবস্থায় জরুরি ভিত্তিতে হাজির হয়েছে উন্নতমানের কৃষির তাগিদ। এসেছে উচ্চ ফলনশীল জাতের বীজ যা অধিক ফলনের প্রতিশ্রুতি। এ ছাড়াও ব্যবহৃত হচ্ছে পুরনো আমলের কৃষি সরঞ্জামের পরিবর্তে নূতন কৃষি যন্ত্রপাতি। উচ্চফলনশীল শস্যের প্রতিশ্রুতিকে বাস্তবায়িত করার জন্য প্রয়োজন হয়েছে অতিরিক্ত জলসেচের। বিদ্যুৎ চালিত গভীর এবং অগভীর নলকূপ এই সমস্যার আংশিক সমাধানে এগিয়ে এসেছে। কিন্তু বড় সমস্যা হল তাদের জন্য প্রয়োজনীয় অজৈব সারের যোগান দেওয়া। জৈবসার বা সবুজসার কিছুটা ভারলাঘব করলেও সারের অভাব থেকেই গেছে। অন্যদিকে রাসায়নিক শিল্পে উৎপন্ন সার ব্যবহার করতে গিয়ে চাষের খরচও অনেক বেড়ে গেছে। কিন্তু সমস্যা এখানেই সীমাবদ্ধ থাকে নি। রাসায়নিক সার যোগান দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় বিপুল শিল্প সম্ভারের অভাব শুধু আমাদের দেশে কেন সমগ্র বিশ্বেই এক জটিল সমস্যার সৃষ্টি করেছে। শুধু কাঁচামালের অপ্রতুলতাই সার উৎপাদনে প্রধান বাধা তা নয়। এ ছাড়াও রয়েছে অভাবনীয় শক্তি সংকট। সারা বিশ্বে যখন শক্তি সংকট চরমে পেঁৗছেছে তখন যদি কৃষিকাজের জন্য সার

উৎপাদনে ব্যবহৃত শক্তি যোগানের ভার কিছুটা লাঘব করা যায় তবে তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় কাজ বলে গণ্য হবে। এরই প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে বিভিন্ন শ্রেণীর উপকারী জীবাণুর মধ্যে। মুক্তজীবী নাইট্রোজেন বন্ধনকারী **এজোটোব্যাক্টার** বা **এজোস্পিরিলাম** কিম্বা জলমগ্ন ধান জমিতে নাইট্রোজেন বন্ধনকারী নীলসবুজ শেওলা কতটা নাইট্রোজেন বন্ধন ক্ষমতার অধিকারী তা আমরা জেনেছি। নাইট্রোজেন বন্ধনের ক্ষেত্রে **এজোটো-ব্যাক্টার** শক্তিশালী হলেও তার কার্যকারিতার মূল প্রতিবন্ধকতা হল উচ্চ শ্বসনহার। যার জন্য প্রয়োজন হয় প্রচুর পরিমাণে জৈবসার। অবশ্য নাইট্রোজেন বন্ধন ক্রিয়া ছাড়াও **এজোটোব্যাক্টার** উদ্ভিদ উদ্দীপক হর্মোন উৎপাদন করে গাছের বৃদ্ধির সহায়তা করে। পক্ষান্তরে **এজোটোব্যাক্টার** গাছের মূলে বিশেষ ধরনের জৈব পদার্থ উৎপন্ন করে অপকারী ছত্রাকের বংশবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে। সজীব পদার্থ হওয়ার জন্য সহজেই প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার শিকার হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই **এজোটোব্যাক্টারের** প্রয়োগে ১০-৩০ শতাংশ ফলন বৃদ্ধির সাক্ষ্য পাওয়া যায়। তাই জীবাণুসার হিসাবে **এজোটো-ব্যাক্টার** নিঃসন্দেহে এক সম্ভাবনাময় প্রতিশ্রুতি বহন করে। বিশেষ যে কারণেই হোক, এজোটোব্যাক্টার প্রয়োগে শব্জি জাতীয় গাছ বা গাছের অঙ্গজ অংশের বৃদ্ধি অধিক ত্বরান্বিত হয়। এ ছাড়া গ্রীষ্মপ্রধান দেশের অম্লমাটিতে **ডারক্সিয়া গামোসার** অস্তিত্ব দেখা যায়। এই জীবাণুর নাইট্রোজেন বন্ধন ক্ষমতা খুব উঁচুমানের হলেও এদের বিপাকীয় নিষ্ক্রিয়তা এবং সুখী প্রকৃতির জন্য মাটিতে প্রবল প্রতিযোগিতায় এরা পিছু হটতে বাধ্য হয়। "রাইজোস্ফিয়ার" বা মূলের পরিমণ্ডলে নাইট্রোজেন বন্ধন বা অন্যান্য জীবাণুঘটিত ক্রিয়া বর্দ্ধিতমাত্রায় ঘটলেও অনুরূপ এক প্রাকৃতিক পরিবেশ "ফাইলোস্ফিয়ার" অর্থাৎ গাছের পাতার পরিমণ্ডলে জীবাণুর বর্দ্ধিত ক্রিয়ার সাক্ষ্য মেলে। পাতা সংশ্লিষ্ট জীবাণুদের বিভিন্ন ক্রিয়ার মধ্যে নাইট্রোজেন বন্ধন উল্লেখযোগ্য। এই পরিবেশে **এজোটোব্যাক্টারের** সঙ্গে পাল্লা দেয় **ক্লেবসিয়েলা, ব্যাসিলাস, এজোমোনাস এক্রোমোব্যাক্টার** ইত্যাদি নাইট্রোজেন বন্ধনকারী জীবাণু। তাই ফাইলোস্ফিয়ারে জীবাণুর সক্রিয়তা বৃদ্ধির জন্য গাছে উপযুক্ত জীবাণু ছিটানোর এক কৌশল নিয়ে পরীক্ষা চলেছে।

নীলসবুজ শেওলার নাইট্রোজেন বন্ধনের ক্ষেত্রে, জৈব পদার্থের জোগান প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না। কারণ এরা হল স্বভোজী। জলমগ্ন ধান জমিতে নাইট্রোজেন বন্ধন করে এরা একাধারে জমির উর্বরতা বজায় রাখে এবং বিভিন্ন উদ্ভিদ হর্মোন বা রোগজীবাণু প্রতিরোধক রাসায়নিক পদার্থ উৎপন্ন করে গাছের প্রভূত উপকার করে। বলা বাহুল্য মাটিতে জলের পরিমাণ কমে এলে এদের ক্রিয়া ব্যাহত হয়। এদের আর এক প্রধান উপকারী ভূমিকা হল অক্সিজেন উৎপাদন। যার ফলে জলে ডোবা ধান জমিতে অন্ততঃ কিছুটা সবাত পরিবেশ বজায় থাকে, যা ধানগাছের মূলের শ্বসনের জন্য প্রয়োজনীয় অক্সিজেনের চাহিদা মেটায়। এই অক্সিজেনের আনুকূল্যে **এজোটোব্যাক্টারের** মত দৃঢ় সবাত শ্বসজীবী জীবাণুও তাদের ক্রিয়া অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়। নীলসবুজ শেওলা যে পরিমাণ নাইট্রোজেন বন্ধন করে তার একটা ক্ষুদ্রতম অংশই সে তৎক্ষণাৎ নির্গত করে থাকে। তাই বড় লাভ হয় এই জীবাণু মারা গেলে। মৃত জীবাণুর উপর অ্যামোনিফাইয়িং এবং নাইট্রিফাইয়িং জীবাণু পর্যায়ক্রমে ক্রিয়া করে মাটিতে জৈব নাইট্রোজেনকে অ্যামোনিয়াম বা নাইট্রেট পর্যায়ের অজৈব নাইট্রোজেনে পরিণত করে। তখন সেই নাইট্রোজেন গাছ গ্রহণ করে থাকে।

সবুজসার এবং নাইট্রোজেন বন্ধনের যৌথ ক্রিয়ার অধিকারী এজোলায় প্রয়োগেও সুফল পাওয়া গেছে। খুব উচ্চমানের সার না হলেও গরীব দেশগুলি এ সারের সাহায্যে অনেকাংশে নাইট্রোজেনের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হবে। অবশ্য, শিম্ব জাতীয় উদ্ভিদের সহযোগিতায় **রাইজোবিয়াম** জীবাণুর নাইট্রোজেন বন্ধনের ঘটনাকে স্বীকৃতি দিতে কেউ কার্পণ্য করেন না। তবে এই জীবাণুকে সার হিসাবে প্রয়োগের প্রশ্ন তখনই আসে যখন জমিতে প্রকৃত দক্ষ নাইট্রোজেন বন্ধনকারী **রাইজোবিয়াম** প্রজাতির সাক্ষাৎ মেলে না। বাস্তবক্ষেত্রে কড়াই জাতীয় গাছের মূলে গুটি উৎপাদন, বীজের সঙ্গে **রাইজোবিয়াম** প্রয়োগের ফলে ত্বরান্বিত এবং নিশ্চিত হয়। এ ছাড়া **রাইজোবিয়াম** জীবাণু প্রয়োগে জমির উর্বরাশক্তিও অনেকাংশে বৃদ্ধি পায়।

এইসব নাইট্রোজেন বন্ধনকারী জীবাণুর সক্রিয়তা বজায় রাখার জন্য এবং সার্থকভাবে জীবাণুকে কাজে লাগানোর জন্য জমিতে দ্রবণীয় পর্যায়ের ফসফরাস যোগ করতে হয়। স্বল্প পরিমাণে প্রয়োজন হলেও নাইট্রোজেন বন্ধনের ক্ষেত্রে মলিবডেনামের গুরুত্ব অপরিসীম।

মাটির অম্লত্ব যেখানে প্রধান প্রতিবন্ধকতা, সেখানে প্রয়োগ করতে হবে পরিমিত পরিমাণে চুন। এর ফলে মাটির অম্লত্ব দূর হবার সঙ্গে সঙ্গে উপকারী জীবাণুরাও পুনরায় চাঙ্গা হয়ে উঠবে। যে ক্ষেত্রে ক্ষারত্ব মাটির প্রধান প্রতিবন্ধকতা সেখানে প্রয়োগ করতে হবে পরিমিত পরিমাণে গন্ধক বা জিপসাম। এ ছাড়া মাটিতে ক্যালসিয়ামের অভাব ঘটলে মাটির নাইট্রোজেন মিনারালাইজেসন প্রক্রিয়া স্তব্ধ হয়ে যেতে পারে। সাধারণতঃ প্রোটিন নাইট্রোজেনকে অ্যামোনিয়াম যৌগে পরিণত করার ক্ষমতা মাটির অধিকাংশ জীবাণুর মধ্যেই বর্তমান। তাই এই প্রক্রিয়াকে বিবর্ধিত করার জন্য বাইরে থেকে কোন বিশেষ জীবাণু প্রয়োগের রীতি নেই। এ ছাড়া মাটিতে, আমোনিয়াম লবণ জমতে থাকলে শুরু হবে নাইট্রিফাইয়িং জীবাণুর ক্রিয়া। নাইট্রোজেন চক্রে আমরা তা দেখেছি। এ ছাড়া মাটিতে সঞ্চিত নাইট্রোজেন, জীবাণুর ক্রিয়ায় নষ্ট হতে পারে। ডিনাইট্রিফাইয়িং জীবাণুরা নাইট্রেট লবণ থেকে আনবিক নাইট্রোজেন উৎপন্ন করে তা বায়ুমণ্ডলে ফিরিয়ে দেয়। এই প্রক্রিয়া মাটির উর্বরতার দিক থেকে দেখলে একটা ক্ষতিকর প্রক্রিয়া বলে মনে হয়। কিন্তু মাটিতে এরও প্রয়োজন আছে। ডিনাইট্রিফিকেসন না হলে মাটিতে নূতন করে নাইট্রোজেন বন্ধন বন্ধ হয়ে যেত।

এ ছাড়া আর এক মুখ্য সমস্যা হল ফসফরাস। মাটিতে ফসফরাস জৈব বা অজৈব যে পর্যায়েই থাকুক না কেন তা থাকে মূলতঃ অদ্রবণীয় পর্যায়ে। ফসফরাস চক্রে আমরা দেখেছি বায়ুমণ্ডল থেকে মাটিতে ফসফরাস আসার কোন সম্ভাবনা নেই। তা হলেও ফসফরাসের অভাব ঘটার মূল কারণই হল এর অদ্রবণীয়তা, সব সময় অপর্য্যাপ্ততা নয়। জমির ফসফরাসকে দ্রবণীয় করে তাকে গাছের প্রয়োজনে ব্যবহার করা এক কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তাই সুপার ফসফেটের মত দ্রবণীয় সহজলভ্য সার প্রয়োগের রীতি বিধিসম্মত। মাটির ব্যাক্টিরিয়া, ছত্রাক এবং এক্টিনোমাইসিটিস উপযুক্ত পরিবেশে মাটির আদি অদ্রবণীয় ফসফরাস বা প্রযুক্ত অদ্রবণীয় ফসফরাস থেকে দ্রবণীয় পর্যায়ের ফসফরাস যুক্ত করতে পারে। একে ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে জমিতে ফসফরাস ঘটিত জীবাণু সারের প্রয়োগ পদ্ধতি। এ ব্যাপারে রাশিয়ার অগ্রণী ভূমিকা সকলের কাছে স্বীকৃতি পায় নি। তবু বিশ্বজুড়ে রাশিয়ার নির্বাচিত জীবাণুর ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধানের জন্য অবশ্য অনেক গবেষণা হয়েছে। গবেষণায় জানা গেছে, কোন মাটির নিজস্ব বা

নিকটধর্মী মাটি থেকে আহৃত উচ্চমানের জীবাণু প্রয়োগ করলে আশানুরূপ ফল পাওয়া যেতে পারে। মুক্তজীবী নাইট্রোজেন বন্ধনকারী জীবাণুর মতই ফসফেট দ্রবণকারী জীবাণুরা মৃতজীবী পরভোজী বলে জমিতে জৈবসার প্রয়োগ করলে তখনই তাদের প্রতিবর্ত ক্রিয়া দেখা যায়। রাশিয়ার **ব্যাসিলাস মেগাথেরিয়ামের** পরিবর্তে ভারতীয় **ব্যাসিলাস সাবটিলিস, ব্যাসিলাস পলিমিক্সা** বা **ব্যাসিলাস ফারমাস** দেশের জমিতে উন্নত ক্রিয়ামানের সাক্ষ্য রেখেছে।

পরীক্ষাগারে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে দেখা যায় ছত্রাক ব্যাক্টিরিয়ার চেয়ে অনেক বেশী সক্রিয়। পাথুরে ফসফেট, বা অস্থিচূর্ণের উপর **ব্যাসিলাস** জাতীয় ব্যাক্টিরিয়া বা **এসপারজিলাস** এবং **পেনিসিলিয়াম** জাতীয় ছত্রাকের ক্রিয়া ঘটিয়ে পাথুরে ফসফেটের ক্যালসিয়াম ফসফেটকে অর্দ্ধজীর্ণ (half decomposed) অবস্থায় জমিতে প্রয়োগ করলে তা প্রাথমিক পর্য্যায়ে গাছের তাৎক্ষণিক প্রয়োজন মেটাবে এবং এই অবস্থায় জীবাণুরাও মাটির নূতন পরিস্থিতিতে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেবার সুযোগ পাবে।

খামারজাত উপসার বা শহরের আবর্জনাগারের এক বড় অংশ হল সেলুলোজ। এই জটিল কার্বনজাত পদার্থই হল জীবাণুদের খাদ্যের দূর্গ। সরল কার্বনজাত যৌগের জোগান ফুরিয়ে গেলে সেলুলোজের উপর জীবাণুরা নির্ভর করতে বাধ্য হয়। সেই পরিস্থিতিতে সেলুলোজ জীর্ণকারী জীবাণুরা অন্য জীবাণুর কার্বনের চাহিদা মেটায়। তাই মাটির উর্বরতা মান রক্ষা করতে এই শ্রেণীর জীবাণুর এক পরোক্ষ ভূমিকা রয়েছে।

এই জীবাণু অন্যভাবেও ব্যবহার করা হয়, তন্তুজ পণ্যাদি পচানোর জন্য। পাট, শন ইত্যাদি যখন প্রথামত জলে পচানো হয়, তখন তাদের উপর স্তরের আস্তরণ বা কোষ প্রাচীরের দূর্গ ভেঙে অবিকৃত তন্তু বের করে আনার দায়িত্ব নেয় একশ্রেণীর জীবাণু। হেমিসেলুলোজ, সেলুলোজ ও লিগনিন জীর্ণকারী জীবাণুদের মধ্যে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণকারীগণের জীবাণুরা হল ক্লস্ট্রিডিয়াম, এসপারজিলাস, কিটোমিয়াম, পেনিসিলিয়াম, অলটারনেরিয়া, ক্লাডোস্পোরিয়াম, কার্ভুলেরিয়া ইত্যাদি।

এ ছাড়াও জীবাণুরা আরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উন্নতমানের উচ্চ ফলনশীল শস্যের সঙ্গে সঙ্গে এসেছে নানাবিধ পোকামাকড়। এরা যে কোন সময়ে শস্যকে আক্রমণ করে সমূলে বিনাশ করে ফেলতে পারে।

জীবাণুকে আমরা এতদিন কেবল অনিষ্টকারী, হিসাবেই জেনে এসেছি। কিন্তু পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলির আলোচনা থেকে আমরা জেনেছি বিভিন্ন শ্রেণীর ভাইরাস, ছত্রাক, ব্যাক্টিরিয়া এমন কি প্রোটোজোয়া পর্যন্ত বিভিন্ন কীটনাশকের সার্থক ভূমিকা পালন করতে পারে। কিন্তু জীবাণু কীটনাশকের প্রয়োজন কি? এর স্বপক্ষে যুক্তি হল, রাসায়নিক কীটনাশকের আকাশছোঁয়া দাম। এ ছাড়াও রয়েছে এদের মারাত্মক বিষক্রিয়া। তা ছাড়া বারংবার একই কীটনাশক প্রয়োগের সময়, সেইসব রাসায়নিক পদার্থ প্রতিরোধী মিউটেন্ট-নূতন প্রজাতি রাসায়নিক কীটনাশকের বিষক্রিয়াকে ব্যর্থ করে দেয়। তাই কীটনাশক রাসায়নিক পদার্থের বিষক্রিয়ার পরিমাণ বাড়িয়েও এই পতঙ্গের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু এদের উপর বিষক্রিয়া বর্ষিত না হলেও তার কুফল প্রতিভাত হচ্ছে কৃষিজীবী ও সাধারণ মানুষের উপর, বর্ষিত হচ্ছে গৃহপালিত পশু, এমন কি জলের মাছের উপরও। পক্ষান্তরে জীবাণু কীটনাশক অন্য উপকারী পতঙ্গ, উদ্ভিদ, মানুষ ও গৃহপালিত গবাদি পশুর উপর ক্রিয়াহীন হওয়ায় এদের থেকে বিপদের সম্ভাবনাও অনেক কম। বর্তমানে ভাইরাস, ছত্রাক ও ব্যাক্টিরিয়াকে কীটনাশক হিসাবে ব্যবহার করা হলেও প্রোটোজোয়া সংক্রান্ত গবেষণা পরীক্ষাধীন পর্যায়ে রয়েছে।

আমাদের দেশে এখনও এর প্রচলন হয় নি, তাই যত শীঘ্র হয়, কৃষিজীবীর পক্ষে ততই মঙ্গল। সবশেষে আলোচনা করা যাক কৃষিক্ষেত্রে এক নূতন সম্ভাবনাময় প্রতিশ্রুতি, হর্মোন উৎপাদনক্ষম উচ্চমানের নাইট্রোজেন বন্ধনকারী বা ফসফেট দ্রবণকারী জীবাণুর ভূমিকা নিয়ে। সাধারণ নাইট্রোজেন বন্ধনকারী বা ফসফরাস দ্রবণকারী জীবাণুর সীমিত ক্ষমতার মধ্যে এই বাড়তি গুণের অধিকারী জীবাণুর ক্ষমতা হবে অনন্য। এই হর্মোন উৎপাদনক্ষম জীবাণুরা অতিরিক্ত ফলনের কারণ হিসাবে চিহ্নিত হলেও, তার সার্থক প্রয়োগের সম্ভাবনা নিয়ে কোন বিজ্ঞান মহলই চিন্তা করেন নি। **ব্যাসিলাস ফারমাস** জীবাণুসার, বিশেষ করে শিম্ব জাতীয় শস্যের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি করবে বলেই আশা করা যায়। তার কারণ কড়াই জাতীয় গাছে গুটি উৎপাদনে প্রাথমিক পর্যায়ে ইনডোল এ্যাসিটিক এ্যাসিডের ভূমিকা স্বীকৃত। এ ছাড়া পাথুরে ফসফেটকে দ্রবীভূত করে অতিরিক্ত ফসফরাসের যোগান দেওয়ায় নাইট্রোজেন বন্ধনকারী **রাইজোবিয়াম** জীবাণুর ক্রিয়াক্ষমতাও বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে। ধানের জমিতে এই জীবাণু

প্রয়োগ করে সুফল পাওয়া গেছে, তাই সঙ্গত কারণেই আশা করা যায় এই জীবাণুসার যেসব শস্যের অঙ্গজ বৃদ্ধিই প্রধান সেইসব শস্যের ক্ষেতকে আরো শ্যামলা করে তুলবে। তাই এই জীবাণুসার হয়ত হবে এক নূতন দিগন্ত উন্মোচনের পথিকৃৎ।

Selected Literature cited

পুস্তক পঞ্জী

Alexander, M. 1961. In: *Introduction to Soil Microbiology*. John Wiley and Sons, N. York.

Alexander, M. 1977. In: *Introduction to Soil Microbiology*. 2nd Edn. John Wiley & Sons, N. York.

Anderson, R. F. and Ignoffo, C. M. 1967. In: *Microbial Technology*. (Peppler, H. J. ed) Reinhold Publishing Corporation, N. York. p. 172.

Balch, R. E. and Bird, F. T. 1944. *Science Agricultural Ottawa*. **25**, 65.

Banik, S. 1975. *M. Sc. (Ag) thesis*. Calcutta University.

Banik, S. 1980. *Ph. D. thesis*. Calcutta University.

Banik, S. and Dey, B. K. 1978. *Indian Agric*. **22**, 93.

Banik, S. and Dey, B. K. 1981. *Zbl. Bakt. II. Abt*. **136**, 478.

Bassi, A. 1835. *Orcesi Lodi*. 1.

Bergersen, F. J. 1971. *Ann. Rev. Pl. Physiol*. **22**, 121

Borrow, A., Brian, P. W., Chester, V. E., Curtis, P. J., Hemming, H. G., Henchan, C., Jefferys, E. G., Lloyd, P. B., Nixon. I. S., Norris, G. L. and Radley, M. 1955. *J. Sci. Food Agr*. **6**, 340.

Burton, J. C. 1979. In: *Microbial Technology*. (Peppler, H. J. and Perlman, D. eds.) Acad. Press. London. p. 29.

Curtis, R. W. 1957. Science. **125**, 646.

Datta, M., Banik, S. and Gupta, R. K. 1982. *Pl. Soil.* **69**, 365.

De, P. K. 1939. *Proc, Royl. Soc.* B. **127**, 121.

Debnath, N. C. and Hazra, J. N. 1972. *J. Indian Soc. Soil Sci.* **20**, 95.

Dey, B. K. and Ghosh, A. 1930. *Indian Agric.* **24**, 239.

Dey, B. K., Roy Chowdhury, S. P. and Ghosh, B. S. 1975. *Indian Agric.* **19**, 23.

d'Herelle, F. 1914. *Ann. Inst. Pasteur.* **28**, 280.

Gaur, A. C. 1972. *Proc. Symp. Soil Productivity* Varanasi and Calcutta. *Natu.* Acad. Sci. India. p. 259.

Golebiowska, J. 1957. *Soils and Fert.* 1957. **20**, 94.

Govinda Rajan, S. V. and Gopala Rao, H. G. 1978. In : *Studies on Soils of India.* Vikas Publishing House Pvt. Ltd., N. Delhi.

Hallsworth, E. G. 1958. In : *Nutrition of the Legumes.* Butterworth's Scientific Publication, London

Handbook of Agriculture. 1969. I. C. A. R. Publication, N. Delhi.

Handbook of Manures and Fertilizers. 1971. I. C. A. R. Publication, N. Delhi.

Hiltner, L. 1904. *Arb, Dent. Landwirsch* Ges. **98**, 59.

Ignoffo, C. M. and Anderson, R. F. 1979. In : *Microbial Technology.* (Peppler, H. J. and Perlman, D. eds.) Acad. Press, London. p. 1.

Knudson, L. 1920. *Am. J. Bot* 7, 371.

Krasil'nikov. N, A., Shirokov, O. G. and Kuchaeva, A. G. 1963. *Akad. Nauk. SSSR, Inst. Fiziol.* Rast. 39.

Lipman, J. G. 1910. *J. Agr. Sci.* **3**. 297.

Mcharen, A. D. and Peterson, G. H (eds). 1967. *Soil Biochemistry* vol. 1. Marcel Dekker, Inc. N. York.

Mehrotra, C. L. and Lehri, L. K. 1970. *J. Indian Soc, Soil Sci.* **18**, 203.

Mehrotra, C. L. and Lehri, L. K. 1971. *J. Indian Soc. Soil. Sci.* **19**, 243.

Menkina, R. A. 1950. *Mikrobiologiya* **19**, 308.

Mishustin, E. N. 1970. *Pl. Soil* **32**, 545.

Mishustin, E. N. and Shil'nikova, V. K. 1972. *Biological Fixation of Atmospheric Nitrogen.* Penna State University Press, University Park, Pa.

Mortenson, L. E., Velentine, R. C. and Carnahan, J. E. 1962. *Biochem. Bioplys. Res. Comm.* **7**, 448.

Pasteur, L. 1870. "Etude sur la maladie des vers a soie" *Tone I, Tome II Paris, Fautheir Villars.*

Pelczar, M. J. (Jr.) and Reid, R. D. 1974 *Microbiology.* Tata McGraw Hill Publishing Co. Ltd., N. Delhi.

Peppler H. J. and Perlman, D. (eds). 1979. In : *Microbial Technology.* Acad Press, London.

Pikovskaia, R. I. 1948. *Mikrobiologiya* **17**, 362.

Rose, R. E. 1957. *N. Z. J. Sci. Technol.* **38**, 773.

Rovira, A. D. 1965. In : *Ecology of Soil-borne* Plant Pathogens. (Baker, K.F. and Snyder, W. C. eds). University Calif. Press, Berkeley. p. 170.

Sarkar, A. K. 1973. *Indian Agric.* **17**, 1.

Sarkar, A. K. 1976. *Indian Agric.* **20**, 169.

Sen, A. and Paul, N. B. 1958. *Indian J. Agric. Sci.* **27**, 21.

Singh, R. N. 1942. *Indian J. Agric. Sci.* **12**, 743.

Singh, P. K. 1977. *Curr. Sci.* **46**, 642.

Singh, P. K. and Subudhi, B. P. R. 1978. *Indian Farming*. **27**, 37.

Statstorm, V. A. 1903. *Zbl. Bakt. Abt. II.* **11**, 724.

Stewart, W. D. P. 1973. *Ann. Rev. Microbiol.* **27**, 283.

Vasantharajan, V. N. and Bhat, J. V 1967. *Pl. Soil.* **27**, 261.

Venkataraman, G. S. 1960. *Proc. Symp. Algology*. I.C.A.R., New Delhi. p. 119.

Venkataraman, G. S. 1961. J. *Gen. appl. Microbiol.* **7**, 96.

Venkataraman, G. S, 1969. In : *The Cultivation of Algae*. I.C.A.R. New Delhi.

Venkataraman, G. S., Goyal, S. K., Kaushik, B. D. and Roy Chowdhury, P. 1974. In : *Algae Form* and Function. Today and Tomorrow's Printers and Publishers, N. Delhi.

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ প্রকাশিত ও প্রকাশিতব্য অন্যান্য বিজ্ঞান পুস্তিকা

বারো টাকা